নারী অতীত, বর্তমান
ও
ভবিষ্যতে

আউগুস্ট বেবেল

অনুবাদ ঃ কনক মুখোপাধ্যায়

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি

WOMEN IN THE PAST,
PRESENT AND FUTURE
August Bebel

প্রথম সংস্করণ মার্চ ১৯৭১

প্রকাশক
সুনীল বসু
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ
১২, বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রাকর ঃ
দুলাল দাশগুপ্ত
ভারতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৫ মহেন্দ্র সরকার স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০১২

পূর্বাভাষ

নারীদের সমস্যাগুলির সঙ্গে সামাজিক সমস্যার প্রশ্নগুলি কিভাবে জড়িয়ে আছে সেই আলোচনার ক্ষেত্রে আউগুস্ট বেবেল-এর লেখা 'উওম্যান ইন দি পাস্ট প্রেজেন্ট এ্যান্ড ফিউচার' (Woman in the Past, Present and Future) একখানি মূল্যবান গ্রন্থ। বেবেল ছিলেন একজন একনিষ্ঠ মার্কসবাদী। স্বয়ং মার্কস্ এঙ্গেলস-এর প্রেরণা ও নির্দেশনায় গঠিত বিশ্বের প্রথম শ্রমিক-শ্রেণীর বৈপ্লবিক পার্টির জার্মানীর সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির—প্রতিষ্ঠার সময় তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, জার্মানীর শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে যাঁরা বুর্জোয়াদের সিংহ-গুহার মধ্যে—জার্মান পার্লামেন্টে প্রবেশ করেছিলেন, এবং বুর্জোয়াদের মুখোস খুলবার কাজ করেছিলেন, বেবেল ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম সংগ্রামী প্রতিনিধি। জার্মান পার্লামেন্টে অন্যান্য কমরেডদের মতো তিনিও জার্মান বুর্জোয়াদের সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সাহসের সঙ্গে লড়াই করে ফরাসীদের বিরুদ্ধে তাদের আগ্রাসী যুদ্ধের জন্য অর্থ বরাদ্দের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন এবং গৌরবোজ্জ্বল প্যারি কমিউনে বীর যোদ্ধাদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করেছিলেন।

যদিও ভারতের মার্কসবাদীদের মধ্যে বেবেলের নাম খুব বেশি পরিচিত নয়, এই গ্রন্থ থেকেই নিঃসন্দেহে বোঝা যাবে যে বেবেল ছিলেন একজন খুব বড় তাত্ত্বিক। ফ্রেডারিক এঙ্গেলস-এর 'অরিজিন অব দি ফ্যামিলি প্রাইভেট প্রোপার্টি এ্যান্ড স্টেট' (Origin of the family private property and state) গ্রন্থের সঙ্গে এই গ্রন্থখানি একসঙ্গে পড়লেই ভাল করে বুঝতে পারা যাবে যে সমাজতন্ত্রের জন্য মানবজাতির সংগ্রামের ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকাই বা কি, এবং অপরপক্ষে নারীদের মুক্তির জন্য সাধারণ গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ভূমিকাই বা কি।

বেবেল নিজেই একথা পরিষ্কার বলেছেন যে এই গ্রন্থে যে মতামত প্রকাশ করা হয়েছে তা তাঁর ব্যক্তিগত মতামত। ঘটনাবলীর মূল্যায়ণের এবং বাস্তব-ক্ষেত্রে নারীমুক্তির প্রশ্নে সমাজতন্ত্রের সাধারণ তত্ত্বের প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁর যে ত্রুটি বিচ্যুতি থাকতে পারে সে বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণই সচেতন ছিলেন।

এই গ্রন্থের 'উওম্যান ইন দি পাস্ট (অতীত যুগে নারী) অধ্যায়টির সঙ্গে অবশ্য আমাদের আজকের ভারতবর্ষের অবস্থার প্রত্যক্ষ মিল নেই, কারণ এই

অধ্যায়টিতে ইউরোপের ইতিহাসে নারীদের অবস্থার কথা আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়, 'উওম্যান ইন দি প্রেজেন্ট' (বর্তমান যুগে নারী) অধ্যায়টির সঙ্গে আমাদের তেমন মিল নেই, কারণ এখানে 'বর্তমান' বলতেও প্রায় এক শতাব্দী পূর্বেকার অবস্থার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং ভারতের মার্কসবাদীদের ভারতের ক্ষেত্রে অতীতে এবং বর্তমানে নারীর অবস্থার কথা বুঝতে হলে বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে নারীদের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁদের নিজেদেরই অধ্যয়ন ও মূল্যায়ণ করতে হবে।

কিন্তু 'উওম্যান ইন দি ফিউচার' ও 'কনক্লুশন' (নারী-ভবিষ্যতে, এবং পরিশিষ্ট) এই দু'টি সংক্ষিপ্ত অধ্যায়ে বেবেল যে বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্তগুলি উল্লেখ করেছেন তা আমাদের ভারতের পক্ষেও অত্যন্ত মূল্যবান। সেখানে বলা হয়েছে ঃ

"নারীর পূর্ণ মুক্তি এবং নারী-পুরুষের সমান অধিকার আমাদের শেষ লক্ষ্য, পৃথিবীতে কোনো শক্তিই তাকে ঠেকাতে পারে না...আর সেই লক্ষ্য পূরণ হওয়া সম্ভব তখনই যখন কিনা মানুষের উপর মানুষের শাসনের অবসান হবে ...সুতরাং শ্রমিকদের উপর পুঁজিবাদীদের প্রভুত্বের অবসান হবে। কেবলমাত্র তখনই মানবজাতির চরম উন্নতি সাধিত হবে। তখনই মানুষ পৌঁছবে তার যুগ যুগান্তের স্বপ্ন সাধনার-'স্বর্ণ যুগে'। চিরদিনের মতো অবসান হবে এক শ্রেণীর দ্বারা অন্য শ্রেণীর উপর প্রভুত্ব এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অবসান হবে নারীর উপর পুরুষের প্রভুত্ব।"

এটা খুবই ভাল কথা যে এ বছর আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ উদ্‌যাপনের সময় ভারতবর্ষে এই প্রথম এই গ্রন্থখানি ছাপা হল। আশা করি নর-নারী নির্বিশেষে সমস্ত প্রগতিশীল মানুষের কাছেই সাধারণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই গ্রন্থখানি বিশেষ সহায়ক হবে।

ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ

ত্রিবান্দ্রম

৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৭৫

ভূমিকা

গত কয়েক দশক ধরেই আমাদের সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে সমগ্র শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই একটা মানসিক উত্তেজনা ও বিচলিত ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অনেক প্রশ্ন উঠেছে, অনেক প্রশ্নের পক্ষে ও বিপক্ষে নানা তর্ক-বিতর্ক উঠেছে। তার মধ্যে তথাকথিত নারীদের প্রশ্নটিও নিঃসন্দেহে বিশেষভাবে আলোচিত হচ্ছে।

প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে নারীরা সমাজে তাদের যোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে, কিভাবে তারা সমাজের অন্য সকলের সঙ্গে সমান অধিকার ভোগ করতে পারে, সর্বক্ষেত্রে তাদের যোগ্যতা ও গুণাবলীর বিকাশ হতে পারে। আর সে প্রশ্নটা জড়িয়ে আছে গোটা মানব সমাজের রূপ ও সংগঠন ঠিক কি রকম হলে মানুষের মধ্যে শোষণ পীড়ন, শত রকমের দুঃখ কষ্টের অবসান করে প্রকৃত সুন্দর সুখী সমাজ গড়ে উঠতে পারে সেই প্রশ্নের সঙ্গে। তথাকথিত নারী-সমস্যা বলতে আমরা যা বুঝি তা আসলে সমগ্র সামাজিক সমস্যারই একটি দিক, বর্তমানে যা নিয়ে আমাদের মধ্যে নানা ভাবনা চিন্তা আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। এই দুটি প্রশ্নকে একসঙ্গেই দেখতে হবে এবং একসঙ্গেই উভয় প্রশ্নের চূড়ান্ত সমাধান হবে।

নারীদের সমস্যা নিয়েই প্রধানত যারা ভাবছে—নারীরা নিজেরা—ইউরোপে তারাই তো সমাজের বেশি অর্ধেক শুধু এই কারণেই তো বলা যায় যে এ সমস্যাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সাধারণভাবে যেমন সামাজিক সমস্যাগুলির ক্ষেত্রে তেমনি নারীদের সমস্যার ক্ষেত্রেও স্বভাবতই বিভিন্ন দলের বিভিন্ন মতামত আছে, তাঁরা সকলেই তাঁদের নিজ নিজ সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টিকে দেখে থাকেন, এবং সেই অনুসারেই তাঁরা নারীদের প্রশ্নে নিজ নিজ বক্তব্য রাখেন ও সমাধানের পথ নির্দেশ করে থাকেন।

কেউ কেউ মনে করে থাকে যে সামাজিক সমস্যার মধ্যে শ্রমিক শ্রেণীগুলিই যখন মুখ্য ভূমিকায় আছে, তখন নারীদের সমস্যা বলে পৃথক কোনো সমস্যা নাই। নারীরা তাদের প্রকৃতির নিয়মেই বর্তমানে বা ভবিষ্যতে ঘর সংসারের পরিধির মধ্যে মা হিসেবে, স্ত্রী হিসেবে তাদের ভূমিকা পালন করে যাবে।

তাদের চার দেওয়ালের বাইরে কি হচ্ছে না হচ্ছে, বা যা তাদের ঘর সংসারের কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত নয় তা নিয়ে তাদের মাথা ঘামাবার কিছু নেই।

দেখা গেছে যে যারা এই ধরনের মত পোষণ করে তাদের হাতে বেশ চটপট সমাধানও তৈরি থাকে এবং তারা মনে করে যে সমস্যা অমনি মিটে গেল। অথচ এইসব জ্ঞানী ব্যক্তিরা একটু কষ্ট করে ভেবে দেখতে চায় না যে লক্ষ লক্ষ নারী তাদের ঘর সংসারের এবং সন্তান ধারনের 'স্বাভাবিক কর্তব্য'ও পালন করতে পারে না (যার কারণগুলি পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে), এবং লক্ষ লক্ষ নারী সেই সব কর্তব্য কর্ম থেকে বঞ্চিত হয়, যেহেতু তাদের কাছে বিবাহ বন্ধন জিনিসটিই হল পরাধীনতা ও দাসত্বের নামান্তর মাত্র অথবা যেহেতু তাদের দিন কাটাতে হয় দুঃখ কষ্ট অভাব অনটনের মধ্যে। ঐ সব জ্ঞানী ব্যক্তিরা এসব অবাঞ্ছিত বিষয়গুলির প্রতি বেশ শক্ত করেই চোখ কান বুজে থাকে, আর নিজেদের ও অপরকে এই বলে বেশ নিশ্চিন্তে বুঝ দেয় যে—চিরকালই তো এই রকম হয়ে এসেছে, আর এই রকমই চলবে। তারা একথা মোটেই মানতে চায় না যে সভ্য সমাজের যে সব উন্নতি হয়েছে নারীরাও তা ভোগ করবার অংশীদার, নারীদের অবস্থার উন্নতির জন্য সে সব জিনিসকে কাজে লাগাতে হবে, আর পুরুষদের মতো নারীদেরও শারীরিক মানসিক শক্তিগুলিকে বিকশিত করতে হবে, কাজে লাগাতে হবে। আর যদি বলা যায় যে নারীদের শারীরিক মানসিক স্বাধীনতা, এবং পুরুষের 'শুভেচ্ছা' ও 'অনুগ্রহ' থেকে তাদের মুক্তি আসতে পারে একমাত্র নারীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থেকেই—তাহলে তো ঐ সব জ্ঞানী ব্যক্তিরা একেবারে রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে যাবেন, আর 'কালের হুজুগ' 'মেয়েরা সব উচ্ছন্নে গেল'—এই সব বলে বিষোদ্গার করতে থাকবেন।

এই রকম "অবিশ্বাসী" ব্যক্তি নারী পুরুষ উভয়ের মধ্যেই আছে যারা সংস্কারের ক্ষুদ্র গণ্ডি থেকে বেরতে পারে না। তারা অন্ধকারের পেঁচার মতো থাকে, প্রগতির আলো সহ্য করতে পারে না।

আর এক ধরনের লোক আছে যাঁরা বাস্তব অবস্থাকে ততটা অস্বীকার করতে পারে না। তারা স্বীকার করে থাকে যে বর্তমানে সভ্যতার অগ্রগতির তুলনায় নারীদের অবস্থাটা যতটা পেছিয়ে আছে, ইতিপূর্বে ইতিহাসের আর কোন পর্যায়েই সে রকম ছিল না, এবং সে জন্যই ভেবে দেখতে হবে নারীদের জন্য কি করা দরকার, আর তাদের নিজেদেরই বা কি করতে হবে। আবার ধরে নেওয়া হয় যে বিয়ে হয়ে গেলেই যেন মেয়েরা তাদের লক্ষ্যে পেঁছে গেল আর তাদের সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

তাই তারা দাবি করে থাকে যে যোগ্যতা ও গুণাবলী অনুযায়ী সমস্ত রকম কাজের ক্ষেত্রে নারীদের পুরুষের সঙ্গে সমান সুযোগ সুবিধা দেওয়া হোক।

পুরুষের সঙ্গে স্বাধীনভাবে প্রতিযোগিতার পথে যেন তাদের কোনো বাধা না থাকে। তাদের মধ্যে যারা বেশি প্রগতিশীল তারা শুধু নীচের স্তরের কর্ম-ক্ষেত্রেই এই প্রতিযোগিতার সুযোগ সুবিধাকে সীমাবদ্ধ রাখার বিরোধিতা করে এবং দাবি করে যে উচ্চস্তরের সমস্ত কর্মক্ষেত্রে—কলা বিজ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে নারীদের জন্য এই সমান সুযোগ সুবিধা দেওয়া হোক। তারা দাবি করে যে স্কুল কলেজের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য সমস্ত সুযোগ সুবিধা খুলে দেওয়া হোক। তারা বিশেষতঃ শিক্ষার বিভিন্ন শাখার দিকে জোর দিয়ে থাকে—ডাক্তারী, সরকারী চাকরি (পোস্ট অফিস, টেলিগ্রাফ, রেলওয়ে) যে কাজগুলিকে তারা নারীদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী বলে মনে করে—যেহেতু এদেশে (ইউ-নাইটেড স্টেটস-এ) নারীদের এই সব কাজে দেওয়ায় বাস্তবিক পক্ষে বেশ সুফল পাওয়া গেছে। তাদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যকই নারীদের রাজনৈতিক অধিকার দাবি করে থাকে। তারা বলে থাকে যে নারীরাও ঠিক পুরুষদের মতনই মানুষ এবং রাষ্ট্রের নাগরিক ; কিন্তু এতদিন পর্যন্ত সমস্ত আইনকানুনই পুরুষদের স্বার্থে কাজে লাগানো হয়েছে এবং নারীদের পরাধীন করে রেখেছে।

এ পর্যন্ত নারীদের বিষয়ে যত রকম মতামত সম্বন্ধে বলা হল তার একটা বৈশিষ্ট্য হল এই যে তার কোনটাই সমাজের বর্তমান কাঠামোর বাইরে যায় না। কেউই এ প্রশ্নে যাচ্ছে না যে কি হলে নারীদের অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন হবে। কেউই দেখছে না যে কলকারখানার বিভিন্ন শাখায় কাজ করবার অধিকার নারীরা এক রকম পেয়েই গেছে, যদিও বর্তমান সামাজিক অবস্থায় তাদের সে অধিকার কাজে লাগাতে হলে শ্রমিকদের মধ্যে দারুণভাবে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়, আর তার ফলে আবার শ্রমিকদের মধ্যে নারী পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই মজুরি কমে যেতে থাকে।

এতদিন পর্যন্ত প্রধানতঃ উচ্চশ্রেণীর নারীদের মধ্যেই নারীদের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা বা কাজকর্ম সীমাবদ্ধ থাকার ফলেই নারীদের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্য সম্বন্ধে এমন ভাসা ভাসা অস্পষ্ট ধারণা চলে এসেছে। ঐসব উচ্চ মহলের নারীদের চিন্তাধারা বা কার্যকলাপ তাদের নিজেদের গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছে। কিন্তু দুঃস্থ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারীদের মধ্যে মাত্র কয়েকশত বা কয়েক সহস্র নারী যদি কিছু কিছু স্কুল মাস্টারী, ডাক্তারী, বা অন্য কোনো ভাল চাকরিও পায় তবুও সাধারণভাবে সমগ্র নারী সমাজের অবস্থার কোনোই মৌলিক পরিবর্তন হয় না। পুরুষের কাছে নারীর পরাধীনতার অবস্থার, ব্যাপক নারী সমাজের অর্থনৈতিক পরাধীনতা এবং তারই ফলে আধুনিক বিবাহ ব্যবস্থায় দাম্পত্য জীবনে নারীর দাসত্ব, নারীর পতিতাবৃত্তি এসবই যেমন ছিল তেমনিই রয়ে গেছে। নারী সমাজের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশের সমস্যার কোনো সমাধানের

ভিতর দিয়ে, যা ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্য নিয়ে ব্যাপক নারীসমাজের মধ্যে বা জনগণের মধ্যে কোনো উৎসাহ এবং আলোড়ন জাগানো যায় না। আর যে সব প্রভাবশালী শ্রেণীর লোকেরা নারীদের সম্মানযোগ্য ভাল ভাল চাকরি-বাকরীর ক্ষেত্রে প্রবেশ করাটাকেও পর্যন্ত পুরুষদের সঙ্গে একটা অবাঞ্ছিত প্রতিযোগিতায় নামা মনে করে তাদের মধ্যে উৎসাহ জাগাবার কথা তো ওঠেই না। তারা নারীদের এইসব চাকরি-বাকরীর ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করাটাকে যথা-সাধ্য বাধা দিয়ে—অনেক সময় তারা এর জন্য এমন মরিয়া হয়ে ওঠে যে সভ্যতা ভদ্রতার সীমা পর্যন্ত ছাড়িয়ে যায়। এইসব প্রভাবশালী ব্যক্তি কিন্তু নারীদের অধঃস্তন পর্যায়ের কাজের বেলায় কোন আপত্তি করে না, বরং সেক্ষেত্রে তারা এই বলে উৎসাহ দেখায় যে নারীদের কম মজুরি দিলেই চলে বা শ্রমের মূল্য হ্রাস পায়। কিন্তু নারীরা যদি পুরুষদের উচ্চমর্যাদার কাজ করতে যায় তাহলেই তারা বেঁকে বসে।

আর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যা দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয় না আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থাও নারীদের বড় বড় সরকারী চাকরিতে নিয়োগ করতে চাইবে—তা সে নারীরা সে সব কাজের জন্য যতই যোগ্য হোক না কেন।

রাষ্ট্র এবং উচ্চ শ্রেণীগুলি শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে কর্মক্ষেত্রে সমস্ত বাধানিষেধ ভেঙে দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু উচ্চ পর্যায়ের কর্মক্ষেত্রে তারা আবার নতুন বাধার সৃষ্টি করছে। কেউ যদি নিরপেক্ষভাবে লক্ষ্য করে দেখে তবেই দেখতে পাবে যে বিদ্বান ব্যক্তিরা, বড় বড় চাকুরেরা, ডাক্তার ও আইনজীবীরা যখন দেখে যে বাইরে থেকে কেউ এসে তাদের গতানুগতিক ধারাকে ডিঙিয়ে যাচ্ছে তখন তারা কি ভীষণভাবে "নিজেদের অধিকার রক্ষা" করতে উঠে পড়ে লেগে যায়। আর এসব ক্ষেত্রে নারী তো একেবারেই 'রবাহূত'। এই সব বড় বড় পেশার ব্যক্তিরা মনে করে তারা হলো ঈশ্বরদত্ত বিশেষ বিশেষ প্রতিভার অধিকারী—সাধারণ মানুষের এ সব কাজের যোগ্যতা নাই, আর নারীদের কথা তো ওঠেই না।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে সমাজে নারী পুরুষের সম্পূর্ণ সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনের কথাটা যদি প্রমাণ করতে না পারা যায় তবে এই গ্রন্থখানি লেখাই বৃথা হবে। তা না হলে নারীদের সমস্যার উপর উপর সমাধানের কথা বলা হবে, পরিপূর্ণ সমাধানের কথা বলা হবে না। সমস্যার পরিপূর্ণ সমাধান বলতে আমি শুধু আইনের চোখে নারী পুরুষের সমান অধিকারের কথা বুঝি না, তাদের সমান অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, বাস্তবক্ষেত্রে সমান স্বাধীনতা, এবং যথাসম্ভব মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রেও সমান সমতা বুঝি। কিন্তু বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নারীদের সমস্যার এই পূর্ণ সমাধান—যেমন শ্রমিকদের সমস্যাও পূর্ণ সমাধান—হতেই পারে না।

আমার 'সমাজতান্ত্রিক' বন্ধুরা হয়তো এই শেষ সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হতে পারেন, কিন্তু নারীদের সমস্যার পূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে পৌঁছবার পথ সম্বন্ধে এরা যে আমার সঙ্গে একমত হবেন সে কথা আমি জোর করে বলতে পারি না। সুতরাং আমি আমার পাঠকদের; বিশেষ করে আমার বিরুদ্ধ মতাবলম্বী পাঠকদের অনুরোধ করব যে এই গ্রন্থের বক্তব্যকে তাঁরা আমার ব্যক্তিগত মত বলেই ধরে নেবেন, আর কোনো আক্রমণ করতে হলে ব্যক্তিগতভাবে আমারই বিরুদ্ধে করবেন। আমি বিশ্বাস করি যে এঁরা আক্রমণ করতে হলে সততার সঙ্গেই করবেন, এবং কোনো উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে আমার বক্তব্যের অপব্যাখ্যা করবেন না। অধিকাংশ পাঠক মনে করবেন এটা একটা কথার কথা, কিন্তু বহু বৎসরের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমি আমার কিছু কিছু বিরুদ্ধবাদীদের সততা সম্বন্ধে একটা ধারণা অর্জন করেছি। বাস্তবিক পক্ষে আমার একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে আলোচনার ক্ষেত্রে সততা রক্ষা করার আমার বিশেষ অনুরোধটি কেউ কেউ মানবেই না। অবশ্য তাঁরা যা ভাল বোঝেন করবেন। এই গ্রন্থের মধ্যে আমি অবশ্যই সত্য ঘটনার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে যে সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসবে সেই সিদ্ধান্ত বিনা দ্বিধায় তুলে ধরব।

আউগুস্ট বেবেল

অতীত যুগে নারীর অবস্থা

ইতিহাসের গোড়া থেকেই নারী এবং শ্রমজীবী মানুষ বরাবরই শোষিত হয়ে আসছে। সমাজের কাঠামোর সর্ব রকমেব পরিবর্তন সত্ত্বেও এই শোষণ ঠিকই চলে এসেছে। ইতিহাসের সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে কখনো সখনো নারীরা বা শ্রমিকরা তাদের দাসত্বের অবস্থা সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠেছে—শ্রমিকদের চেয়ে নারীরা আরো কম সচেতন হয়েছে, কারণ তাদের অবস্থা আরো শোচনীয়, এবং এমন কি শ্রমিকরাও পর্যন্ত নারীদের তাদের চেয়ে হীন মনে করে এসেছে, এবং আজও করছে। শত শত বংশ পরম্পরায় ধরে দাসত্ব করতে করতে দাসত্ব করা মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। উভয়কেই এই দাসত্বের অবস্থাটাকে স্বাভাবিক বলে ধরে নিতে শেখায়। ফলে নারীরা তাদের এই পদানত অবস্থা-টাকে এতই স্বাভাবিক বলে ধরে নেয় যে তাদের অবস্থা সম্বন্ধে তাদের বোঝাতে এবং তাদের মধ্যে সমাজে সর্বক্ষেত্রে পুরুষের সমান অধিকার ভোগ করার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলতেও কম বেগ পেতে হয় না।

ইতিহাসের গোড়া থেকেই যে নারী ও শ্রমজীবী মানুষের উপর শোষণ চলে আসছে বলে বলা হয়েছে সে কথাটা নারীদের বেলায় বিশেষ ভাবে সত্য। মানব-জাতির মধ্যে নারীই সর্বপ্রথম দাসত্বের শৃংখল পরেছে। নারীর দাসত্ব শুরু হয়েছে ইতিহাসে দাস প্রথারও পূর্বে।

সমস্ত রকম শোষণের মূলেই হল যারা শোষণ করছে তাদের উপর অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা। নারীদের অবস্থা অতীতেও যা ছিল, এবং এখনো তাই আছে।

আমরা দেখতে পাই যে অতীত যুগের শুরুতে যাযাবরই ছিল প্রথম মানব-গোষ্ঠী। যাযাবর গোষ্ঠীদের মধ্যে পশুদের মতো নরনারীদের মধ্যে অবাধ যৌন সংসর্গ চলত। এই স্তরে নারীদের* থেকে পুরুষরা শারীরিক অথবা মানসিক দিক থেকে উন্নত ছিল একথা মনে করবার কোনই কারণ নাই। শুধু তাই নয়, বর্বর জাতিদের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে দেখলে অনেক সময় উলটোটাই দেখা

* যেমন ট্যাসিটাস (TACITUS) স্পটই বলেছেন যে তাঁর সময়ে, এখন যাদের কথা আলোচনা করা হচ্ছে তাদের চেয়ে তখনকার জার্মানদের মধ্যে যারা সভ্যতার উচ্চস্তরে উঠেছিল, তাদের মধ্যে নারীরা আকারে বা শক্তিতে কোনো অংশেই পুরুষদের চেয়ে কম ছিল না।

যায়। সেই সব জাতিদের মধ্যে সভ্যজাতিদের তুলনায় নারী পুরুষের বুদ্ধি বা মগজের মাপ ও ওজনের পার্থক্য অনেক কম দেখা গেছে, আর শারীরিক শক্তির দিক থেকেও নারীরা এমন কিছু কম ছিল না। বাস্তবিকপক্ষে আফ্রিকার অভ্যন্তরে কোনো কোনো উপজাতির মধ্যে পুরুষদের বদলে নারীদেরই কর্তৃত্ব দেখা যায়, কারণ সেখানে নারীরাই বেশি শক্তিশালী*। কোনো এক আফগান উপজাতির মধ্যে নারীরা যুদ্ধ করে, শিকার করে আর পুরুষরা ঘরকন্নার কাজ করে থাকে। পশ্চিম আফ্রিকার আশান্তির (Ashantee) রাজার এবং মধ্য আফ্রিকার ডাহমির (Dahomey) রাজার দেহরক্ষীর কাজ করে থাকে নারীরা, এবং কোন কোন সৈন্য বাহিনীর কাজও পরিচালনার জন্য শুধুমাত্র নারীদেরই গ্রহণ করা হয়, কারণ তারা পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশী সাহসী ও হিংস্র হয়ে থাকে।

প্রাচীনকালে কৃষ্ণসাগরের উপকূলে এবং দক্ষিণ এশিয়ায় অবস্থিত তথাকথিত যে এ্যামাজন রাষ্ট্রগুলি ছিল বলে বলা হয়ে থাকে, সেগুলি সম্পূর্ণভাবেই নারীদের দ্বারা গঠিত ছিল কেন তার কারণ একমাত্র এই হতে পারে যে নারীদের শারীরিক শক্তি বেশি ছিল। এমন কি আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট (Alexander the great)-এর রাজত্বকালে পর্যন্ত এই সব রাষ্ট্রের চিহ্ন দেখা যায়, যেমন ডায়ডোরাস (Diodorus)-এর কাহিনীতে পাওয়া যায় যে, থালেসট্রীস (Thalestris) নামক এ্যামাজনস্-এর রানী আলেকজাণ্ডারের সন্তানের জননী হবার আকাঙ্ক্ষায় তাঁর শিবিরে এসেছিলেন।

এই এ্যামাজন রাষ্ট্রগুলির অস্তিত্ব যদি ঐতিহাসিক সত্য হয়, তবে তা পুরুষদের সম্পূর্ণ কড়াকড়ি ভাবে বাদ দিয়েই সম্ভব হয়েছিল। সুতরাং বলা হয়ে থাকে যে সেইসব রাষ্ট্রের নারীরা তাদের যৌন কামনা চরিতার্থ করবার জন্য এবং সন্তান ধারণ করে বংশ বিস্তার করবার জন্য বৎসরের কোনো কোনো দিনে আশে পাশের রাষ্ট্রের পুরুষদের সঙ্গে মিলিত হত।

কিন্তু এ হল কোনো একটা বিশেষ অবস্থার কথা, আর সেই অবস্থা যে টিকে থাকতে পারে না তার প্রমাণ স্বরূপ দেখা যায় যে তেমন কোনো রাষ্ট্র আর এখন কোথাও নাই।

আদিম যুগে নারীর দাসত্ব, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সেই দাসত্ব এবং তার ফলে শারীরিক ও মানসিক শক্তিতে পুরুষের সঙ্গে তার তফাৎ,—যেগুলি কিনা নারীর দাসত্ব আরো কঠোর করে তুলতে সাহায্য করেছে—এ সবেরই মূলে নারীদের

* **L. Buchner :** ***Die Frau ; ihre naturliche Stellung und gesellschaftliche Bestimmung.*** **(Woman, Her Natural Position and Social Destiny) "Neue Gesellschaft," Vols. 1878 and 1880.**

থেকে ব্যতিক্রম—অন্য সর্বত্রই পুরুষরা নিজেরাই ক্ষমতা দখল করে রেখেছে, আর সে অবস্থা এসেছে নিশ্চয়ই ব্যক্তিগত ভাবে একজন পুরুষের সঙ্গে একজন নারীর দীর্ঘদিন ধরে স্থায়ী সম্বন্ধ চলে আসবার পর—সম্ভবতঃ পুরুষই সেই সম্বন্ধ স্থাপন করেছিল। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে নারীর প্রাদুর্ভাব ছিল বলেই, অথবা কোনো বিশেষ নারীর গুণমুগ্ধ হয়ে তার প্রতি আকৃষ্ট হত বলেই পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম বিশেষ কোনো নারীকে স্থায়ীভাবে পাবার আকাঙ্ক্ষা জাগে। পুরুষের মধ্যে অহংভাব জেগে উঠল। অন্য পুরুষদের মত নিয়ে অথবা না নিয়েই একজন পুরুষ কোনো একজন নারীকে গ্রহণ করতে থাকল। তাই দেখে অন্য পুরুষরাও তার পথ অনুসরণ করতে থাকল। ঐ একটি বিশেষ নারীকে ঐ পুরুষটি শুধু তার একার আদর যত্নেই রেখে দিল, এবং তাকে নিজের স্ত্রী বলে মনে করতে থাকল এবং তার সন্তানদের নিজের সন্তান হিসেবে প্রতিপালন করার ভারও গ্রহণ করল। পুরুষের সঙ্গে এরূপ সম্বন্ধ নারীর পক্ষে সুবিধাজনকই মনে হল, কারণ তাতে তার নিরাপত্তা বাড়ল। এই ভাবেই বিবাহ প্রথার উৎপত্তি হল* ।

এইভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, পরিবার জাতি ও রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন হল।

নিজের স্ত্রী এবং সন্তানদের উপর অধিকার পাবার পরই আদিম যুগের মানুষদের মধ্যে স্থায়ী বাসস্থানের আকাঙ্ক্ষা জাগল। এতদিন তারা বনে বনে ঘুরে বেড়িয়েছে, বন্য পশুরা তাড়া করে না ভাগিয়ে দিলে রাত্রে গাছে গাছে বা পর্বত গুহায় নিদ্রা গিয়েছে। এখন তারা বসবাস করবার জন্য কুটির নির্মাণ করল, শিকার করার পর বা মাছ ধরার পর তারা সেই কুটিরে ফিরে আসত। শ্রমবিভাগ শুরু হল, পুরুষ শিকার করত, মাছ ধরত, লড়াই করত, আর নারী ঘরকন্নার কাজ করত—অবশ্যই প্রাথমিক যুগের ঘরকন্না বলতে যা বোঝায়। পরিবারগুলি যখন বাড়তে থাকল তখন শিকার করে কি পাওয়া যাবে না যাবে সে বিষয়ে অনিশ্চয়তা, বিভিন্ন ঋতুতে প্রাকৃতিক অবস্থার বিপর্যয়ের কারণে তারা

* অবশ্য আমি একথা নিশ্চয়ই বলছি না যে বিবাহ জিনিসটা কোনো ব্যক্তি বিশেষের "আবিষ্কার" বা কোনো ব্যক্তি বিশেষ-এর সৃষ্টি করেছে, যেমন বলা হয়ে থাকে যে "পরম পিতা ঈশ্বর আদি মানব আদমকে সৃষ্টি করেছে"। নতুন নতুন ধ্যানধারণা কোনো ব্যক্তিরই সম্পত্তি নয়, সেগুলি হল বহু ব্যক্তির সমবেত চিন্তাধারার ফল। কোনো কিছু নতুন জিনিস চিন্তা করা, তাকে রূপায়িত করে তোলা, এবং তা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করার মধ্যে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হয়। সেই পথে বহু ব্যক্তির দেখা মেলে। সেই কারণেই একে অপরের চিন্তাধারাকে নিজেরই চিন্তাধারা বলে মনে করে থাকে। সেই চিন্তাধারা একটা পরিণতি লাভ করে যখন সবারই প্রয়োজনের উপযোগী হয়ে দেখা দেয়, তখনই চট করে সবাই সেটি গ্রহণ করে। বিবাহের ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনিই হয়েছে। যদিও কোনো একজন ব্যক্তিই বিবাহের ব্যাপারটা আবিষ্কার করেনি, তবুও কেউ না কেউ নিশ্চয়ই বিবাহের সূচনা করেছিল এবং তারপর অন্যেরা তার অনুসরণ করেছিল।

বাধ্য হয়ে পশুপালন করতে শুরু করল এবং দেহের পুষ্টির জন্য সেই পশুদের মাংস ও দুধ খেতে শুরু করল, শিকারী পশুপালকে পরিণত হল। ছেলে মেয়েরা বড় হতে থাকল, তাদের মধ্যে বিবাহ হতে থাকল (নিজেদের রক্তের সম্বন্ধের বা আত্মীয়দের মধ্যে নিষিদ্ধ বিবাহের ধারণা তার অনেক পরে দেখা দেয়), এবং এইভাবে ক্রমশঃ পিতৃ প্রধান পরিবার, গ্রাম্য সমাজ ও জাতির* সূচনা হল। জাতিগুলি আবার বিভক্ত হয়ে হয়ে অনেক উপজাতিতে পরিণত হল। আবার সেই উপজাতিদের সংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকলে তাদের পরস্পরের মধ্যে পশুদের চারণভূমি নিয়ে ঝগড়া বিবাদ শুরু হল। চারণভূমি নিয়ে এই ঝগড়া, ক্রমশ জনসংখ্যা বৃদ্ধি সত্ত্বেও মানুষের বেশ ফলপ্রসূ ভালো অঞ্চলে বাস করবার ইচ্ছা—এর থেকে চাষ-বাসের উৎপত্তি হল।

সমাজ বিকাশের এই সমস্ত স্তরেই নারীর নিজস্ব ভূমিকা ছিল। নারী ছিল পুরুষের প্রধান ভৃত্য; নারী শুধু সন্তান পালন এবং ঘরকন্নার কাজই করত না পরিধেয় প্রস্তুত করত, বাসের জন্য কুটির অথবা তাঁবু তৈরি করত, আবার যখন পরিবারগুলি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বাস করবার জন্য চলে যেত, তখন সেই কুটির তাঁবুগুলি ভেঙে বয়ে নিয়ে যেত, চাষবাদের কাজ শুরু হবার পর যখন লাঙল আবিষ্কার হল, তখন নারীরাই প্রথম লাঙল টানার কাজ করত তারাই সব চেয়ে বেশি ফসল সংগ্রহ করত।

ইতিমধ্যেই পুরুষ প্রভুর ভূমিকা গ্রহণ করতে থাকল, তার উপর যে ধরনের দায়িত্ব ছিল তা পালন করতে গিয়ে তার চিন্তাশক্তি ও চেতনা বাড়তে থাকল। সুতরাং তার শারীরিক ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধি হতে থাকল, আর নারীদের উপর চাপানো হল দ্বিগুণ বোঝা—দাসত্ব এবং তার সঙ্গে সঙ্গে দাসত্বের উপযোগী ব্যবহার। ফলে অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম করতে করতে তাদের মানসিক দিকটা আর বাড়তে পারল না।

* ম্যাকস্ স্টারনার (MAX STIRNER) তাঁর 'Der Einzige und Sein Eigenthum' (The Individual and His Property) পুস্তকে নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে যৌন সংসর্গের সম্পর্কে যে মতের পরিবর্তন হচ্ছে তার বিরুদ্ধে বলেছেন। তাঁর মতে এ বিষয়টা প্রত্যেকের নিজের বিবেকের উপর নির্ভর করে। কেউ কেউ 'পবিত্র ঈশ্বরের' নামে, কেউবা 'পবিত্র অধিকারের' নামে একে দৈব অভিশাপ বলে বর্ণনা করে থাকে। বাইবেল বিশ্বাসীদের পক্ষে নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে যৌন সম্পর্কের নিন্দাটা আবার বিড়ম্বনার সৃষ্টি করছে। ঈশ্বরের প্রথম নরনারী যুগলের সৃষ্টির পর, তাদের পুত্র কেন (Cain) এ্যাবেলকে (Abel) হত্যা করে। তাহলে মনুষ্য বংশ রক্ষা করতে হলে হয় ঈশ্বরকে আবার মানুষ সৃষ্টি করতে হবে, নইলে কেনকে তার ভগ্নির সঙ্গে যৌন সম্পর্ক রাখতে হবে কিন্তু বাইবেলের কাহিনী অনুযায়ী তার কোনো ভগ্নি ছিল না, প্রথম মনুষ্য যুগ হয় ম্যালথাসপন্থী ছিল, নয়তো 'দুটি সন্তান' নীতির অনুগামী ছিল। সুতরাং কেন এ্যাবেলকে বিবাহ করেছিল। কিন্তু কোথা থেকে তার সে স্ত্রী এল? এবং এই ভগ্নি হত্যাকারী, আদমের একমাত্র বংশধরই হল সমগ্র মানবজাতির পূর্বপুরুষ।

পুরুষ কর্তৃত্ব করতে অভ্যস্ত হয়ে গেল। নারীকে সে জোর করে অন্য সমস্ত পুরুষদের কাছ থেকে আড়ালে, এবং নিজের কুটিরে নির্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য করল, এবং শেষ পর্যন্ত এমন কি কোনো প্রতিবেশীর লোলুপ দৃষ্টিও যাতে তার প্রতি না পড়তে পারে তাই তার মুখ, শরীর সব ঘোমটা বা বোরখার আড়ালে ঢেকে রাখল। প্রাচ্য দেশে, যেখানে জলবায়ুর কারণেই, সব সময়ই যৌন কামনা অনেক তীব্র এবং বাধাহীন দেখা গেছে সেখানে স্বভাবতই আগন্তুক পুরুষদের চোখের সামনে থেকে নারীদের আড়াল করে রাখার ব্যাপারটা চরমে পেঁছেছে। পুরুষ এবং নারীর মধ্যে প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ার পরিণাম হল নিম্নরূপ।

পূর্বের যাযাবর গোষ্ঠীদের মধ্যে যেমন ছিল, এখন আর নারীদের তেমনি কেবলমাত্র পুরুষদের যৌনকামনা চরিতার্থ করার এবং তাদের বংশবৃদ্ধি করবার উপায় হিসাবেই মনে করা হত না। নারীদের মনে করা হত পুরুষদের বংশ-ধরদের জননী, যাদের মাধ্যমে পুরুষরা মৃত্যুর পরেও সম্পত্তির অধিকার রক্ষা করতে পারত, এবং এইভাবে, বলতে গেলে নারীদের মাধ্যমে পুরুষদের যেন অমর হয়ে থাকবার একটা পথ পাওয়া গেল। তাছাড়া নারী পুরুষদের কাছে দাসী হিসেবেও ছিল মূল্যবান। নারীদের একটা বিশেষ মূল্য ছিল এবং তাদের এমন সামগ্রী মনে করা হত যাব বেশ ভালমতো বিনিময় মূল্য আছে। যাকে তার মালিকের কাছ থেকে অর্থাৎ তরুণী কন্যার পিতার কাছ থেকে দরকষাকষি করে পাওয়া যায়, এবং তার পরিবর্তে পুরুষকে দিতে হয় অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী—গবাদি পশু, শিকারের সামগ্রী, অস্ত্রশস্ত্র অথবা ক্ষেতের শস্য। আজও পর্যন্ত আমরা সমস্ত অসভ্য জাতির মধ্যে অন্যান্য মূল্যেবান দ্রব্য সামগ্রীর সংগে কুমারী কন্যা বিনিময় করার প্রথা চলে আসতে দেখি। তার ফলে নারী হয়ে যায় পুরুষদের হাতের সম্পত্তি, পুরুষ তার ইচ্ছামতো তাকে রাখতে পাবে বা ফেলতে পারে, দূর করে দিতে পারে, তাব প্রতি দুর্ব্যবহার করতে পারে অথবা খুশীমতো তাকে রক্ষাও করতে পারে। এর ফল আরো এমনই দাঁড়াল যে কুমারী কন্যা তার পিতৃগৃহ ছেড়ে গেলে তার সংগে সমস্ত সংস্পর্শ ছিন্ন হয়ে যেতে থাকল। তার জীবন যেন দুটি সম্পূর্ণ পৃথক ভাগে ভাগ হয়ে গেল, প্রথম অংশ তার পিতৃগৃহে, দ্বিতীয় অংশ তার স্বামী বা প্রভুর গৃহে। স্বামী গৃহে প্রবেশ করলেই মেয়েদের পিতৃ-গৃহের জীবন থেকে যে তারা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল তা বোঝাবার জন্য প্রাচীন গ্রীকদের মধ্যে একটা নিয়ম ছিল—যে সুসজ্জিত দুই চাকার গাড়িতে করে কনে এবং তার সংগেব যৌতুক সামগ্রী বরের বাড়ি দিয়ে আসা হত, সেই গাড়ীটিকে তারা বরের বাড়ির সামনে পুড়িয়ে ফেলত।

সভ্যতার উচ্চস্তরে এসে এই লেন-দেনের ব্যাপাবটা টাকার বদলে উপহার

হিসেবে দেওয়া হয়, আর সেই উপহার পিতা গ্রহণ না করে কন্যা গ্রহণ করে তার স্বামীর কাছে আত্মসমর্পণের ক্ষতিপূরণ হিসাবে, আর আমরা জানি যে এই প্রথাই এখনো পর্যন্ত সব আধুনিক দেশেই চলে আসছে।

সভ্যতা গড়ে উঠবার পূর্বে কোনো নারীকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করতে হলে কি পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হবে তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাত না। স্ত্রীকে কিনে নেওয়ার চেয়ে জোর করে নিয়ে যাওয়াটা অনেক সস্তা ছিল, এবং যে সময়ে দল বা গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে নারীদের প্রাদুর্ভাব ছিল তখন নারীর উপর পাশবিক অত্যাচার হতই। রোমানদের দ্বারা 'সাবিন, (Sabin's)-দের উপর ব্যাপকভাবে পাশবিক অত্যাচারের কাহিনী সুবিদিত। এখনো পর্যন্ত নারীধর্ষণ ব্যাপারটা অনেক ক্ষেত্রে পদ্ধতি হিসেবে চলে আসছে—যেমন সাউথ চিলির অরকানিয়ান ইন্ডিয়ানদের (Aracanian Indians) মধ্যে। বরের বন্ধুরা যখন কনের বাপের সঙ্গে দর কষাকষি করতে থাকে, তখন বর চুপি চুপি ঘোড়া নিয়ে বাড়ির কাছে এসে কনেকে ধরে নিয়ে ঘোড়ায় চড়িয়ে কাছাকাছি জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে যায়। তখন সেখানকার নারী পুরুষ শিশু সকলে মিলে চিৎকার চেঁচামেচি করতে থাকে। বর-কনে জঙ্গলের মধ্যে পোঁছে গেলেই বিয়ে হয়ে গেছে ধরে নেওয়া হয়। এমনকি এই কনে হরণের ব্যাপারটা মা-বাপের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও সে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেছে ধরে নেওয়া হবে। এই পবিত্র বনভূমিই হল বিবাহ-বাসর, এখানে প্রবেশ করলেই বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যাবে।

সবচেয়ে বেশি লাভ বা ফলনের দিকে মানুষের স্বাভাবিক ঝোঁক থাকেই, তাই যে নারীরা এবং তাদের সন্তানরা বেশি কাজ করে তাদের স্বামীদের সম্পদ ও মান সম্মান বাড়াতে পারত, তাদের কদর ছিল বেশি। বহুবিবাহের দিকেও যথেষ্ট প্ররোচনা ছিল। কিন্তু নারীদের সংখ্যা স্বভাবতই পুরুষদের থেকে বেশি থাকত না—এ বিষয়ে পরে আবার বলা হবে—তাই তাদের পক্ষে একমাত্র উপায় ছিল বিদেশী জাতি বা গোষ্ঠীগুলির কাছ থেকে নারীদের কিনে নেওয়া. অথবা আরো ভাল হত তাদের জোর করে হরণ করে নিতে পারলে। যুদ্ধের সময় লুটের মাল হিসেবে নারীদের খুব মূল্যবান মনে করা হত।

সভ্যতার একটা স্তর পর্যন্ত সর্বত্রই ভূমি জিনিসটা ছিল সর্বসাধারণের। তবে বন জঙ্গল, মাঠ ময়দান বা জলরাশিকে সর্বসাধারণের জ্ঞান করা হত, আর চাষের জন্য নির্ধারিত জমি ভাগ করে পরিবারগুলি ছোট বা বড় সেই হিসাবে তাদের পিতা বা কর্তাদের জন্য দেওয়া হত। এই ব্যবস্থা থেকে নারী পুরুষের মধ্যে একটা নতুন ধরনের তারতম্য দেখা গেল, যা থেকে দেখা গেল যে নারীদের পুরুষ অপেক্ষা অধঃস্তন পর্যায়ের মনে করা হচ্ছে।

কন্যাদের জমির অংশ দেবার নিয়ম ছিল না। কেবলমাত্র পুত্ররাই ঐ সব

জমির অংশ পেত। আর স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় যে সে ক্ষেত্রে পুত্রের জন্ম থেকে কন্যার জন্ম আলাদা চোখে দেখা হত। শুধু মাত্র 'ইনকাস'* (Incas) এবং আর কয়েকটি মাত্র জাতির মধ্যে কন্যাদের অর্ধেক অংশ জমি দেবার নিয়ম ছিল। মেয়েরা যে পুরুষদের চেয়ে হীন এই ধ্যান-ধারণার সংগে সংগতি রেখেই প্রাচীন জাতিগুলির মধ্যে সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে কন্যাদের বাদ দেওয়ার নিয়ম ছিল, এখনও কোনো কোনো পশ্চাৎপদ জায়গায় সেই নিয়ম চলে আসছে।

অপরপক্ষে জার্মানদের মতো যে সব জাতির মধ্যে এক বিবাহ প্রচলিত আছে, তাদের মধ্যে খুব ক্ষতিকর প্রথার প্রচলন ছিল। বিবাহের সময় পুত্রেরা গোষ্ঠীর কাছ থেকে সম্পত্তির অংশ পেত। সেজন্য পিতাদের একটা ঝোঁক থাকত তাড়াতাড়ি দশ বারো বছরের পুত্রদের প্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের সংগে বিয়ে দিয়ে দেবার। সে সব ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা গেছে যে বিবাহিত পুত্র নেহাতই নাবালক বলে তার পিতাই তার স্থান অধিকার করে পুত্রবধূর সংগে সহবাস করছে বা তার স্বামীর** স্থান অধিকার করেছে। তার ফলে পরিবারের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক যে কতদূর নীচে নেমে গেছে তা সহজেই বোঝা যায়। সেকালের অনেক কিছু গৌরবের কাহিনীর মতো আমাদের পূর্বপুরুষদের নৈতিক সততার কাহিনী-গুলোও চমৎকার গালগল্প বিশেষ।

যতদিন পর্যন্ত কন্যা তার পিতার বাড়িতে থাকত ততদিন পর্যন্ত তার কঠিন পরিশ্রম করে নিজের জীবিকা উপার্জন করতে হত। আর বিয়ে হলেই সেখানকার সব দাবি তাকে ছেড়ে দিয়ে যেতে হত, পিতার গোষ্ঠীর কাছে সে হয়ে যেত অন্য সমাজের লোক বা বহিরাগত। ভারত, ইজিপ্ট, গ্রীস, রোম, জার্মানী, ইংলণ্ড, আজটেক (Aztec) এবং ইনকা (Inka) রাজ্য সর্বত্রই এই একই অবস্থা ছিল। এখনও পর্যন্ত ককেসাসে, রাশিয়ার অনেক জেলার এবং ভারতবর্ষে এই ব্যবস্থা রয়েছে। কোনো পুরুষের মৃত্যুকালে তার পুত্র বা ভ্রাতুষ্পুত্র না থাকলে তার সম্পত্তি আবার তার গোষ্ঠীর হাতে ফিরে যেত। তারপর অনেকদিন পরেই এ নিয়ম হল যে কন্যারা উত্তরাধিকার সূত্রে ঘরকন্নার জিনিসপত্র বা গবাদি পশু পেতে পারবে, অথবা বিবাহের সময় যৌতুক গ্রহণ করতে পারবে, আর তারও অনেক পরে কন্যাদের ভূসম্পত্তির উত্তরাধিকার দেওয়া হয়েছে।

পুরুষরা যেভাবে নারীদের উপর অধিকার লাভ করত তার আরো একটা পদ্ধতির কথা বাইবেলে লেখা আছে, বাইবেলের জেকব-এর গল্পে দেখা যায় যে জেকব অন্যের কাছে খেটে খেটে প্রথমে লী (Leah) এবং তারপর রাচেল (Rachel)কে লাভ করেছিল; লেবান (Leban)-এর কাছে অনেক বৎসর

* Laveleye : 'Primitive Property'

** Laveleye : 'Primitive Property'

খাটুনির ফলেই জেকব তার মূল্য পেয়েছিল। ধূর্ত লেবান দর কষাকষিতে জেকবকে বোকা বানিয়ে দিয়ে প্রথমে রাচেলের বদলে লীকে দিয়েছিল এবং তারপর দ্বিতীয় ভগ্নির জন্য তাকে আরো সাত বছর খাটতে বাধ্য করেছিল। এখানে এক সঙ্গেই দুই ভগ্নি একজন স্বামীর স্ত্রী হল—যা কিনা আজকালকার ধারণায় নিষিদ্ধ বলে মনে করা হয়। বিবাহের যৌতুক হিসাবে জেকবকে পরবর্তী ভেড়ার পালের একাংশ দেওয়া হবে বলে বলা হল। স্বার্থপর লেবান ঠিক করল যে, যে সব ভেড়াগুলোর গায়ে দাগ দাগ থাকবে সেগুলিই জেকব নেবে—যে রকম ভেড়া কিনা সংখ্যায় বেশি হতে মোটেই দেখা যেত না ; আর লেবান নিজে নেবে যে ভেড়াগুলোর গায়ে দাগ থাকবে না সেইগুলো। কিন্তু এবার জেকব চালাকিতে লেবানকে হারিয়ে দিল। সে যেমন তার ভাইকে তার জন্মগত অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিল, লেবানকেও তেমনি তার মেষশাবকগুলি থেকে বঞ্চিত করেছিল। বাইবেলে বলে যে জেকব নাকি ডারউইনেরও পূর্বে ডারউইন তত্ত্ব অধ্যয়ন করেছিল। সে দাগ দাগ ওয়ালা কাঠকে খণ্ড খণ্ড করে ভেড়াগুলো যে গর্তের মধ্যে থাকত সেখানে তাদের চোখের সামনে রেখে দিল। চোখের সামনে অনাবৃত এই রকম নানা রকম চিত্র বিচিত্র দেখতে দেখতে গর্ভিনী ভেড়াগুলোর মন ও শরীরের উপর এমনই ফল হতে থাকল যে তাদের বেশির ভাগ বাচ্চাগুলোর গায়েই চিত্র বিচিত্র দাগ হতে থাকল। এইভাবেই নাকি ইস্রাইল তার একজন পূর্বপুরুষের ধূর্ত বুদ্ধির জন্য রক্ষা পেয়েছিল।

নারীর উপর পুরুষের প্রভুত্বের আর একটা কুফল—যা কিনা আগের চেয়ে এখন আরো বেশি দেখা যায় তা হল বেশ্যাবৃত্তি। যদিও পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশেই দাম্পত্য জীবনে পুরুষরা নারীদের উপর খুব কড়াকড়ি শাসন চালিয়ে থাকে যাতে অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে তাদের কোনো যৌন সংযোগ না হতে পারে, আর তার একটু ব্যতিক্রম হলেই নারীদের উপর নিষ্ঠুর শাস্তি বিধান করে থাকে—নারীদের তারা নিজেদের সম্পত্তিবিশেষ বলে মনে করে, যাদের জীবন মরণ নির্ভর করছে পুরুষের হাতে—কিন্তু এত সব সত্ত্বেও পুরুষরা কিন্তু কোনো কড়াকড়ি নিয়মের অধীনে আসেনি। পুরুষ ইচ্ছা করলে একসঙ্গে একাধিক স্ত্রী কিনে নিতে পারত, অথবা লড়াইয়ে জয়লাভ করে পরাজিতের কাছ থেকে নারীদের দখল করে নিতে পারত, কিন্তু সেই নারীদের বরাবরের মতো ভরণপোষণ চালাতে না পারলে তাদের নিয়ে কোনো লাভ হত না। পরবর্তী সময়ে যখন সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারা একেবারেই অসমান হতে থাকল তখন মাত্র অল্প সংখ্যক পুরুষই এভাবে নারীদের রাখতে পারত, আর স্বল্প সংখ্যক সুন্দরী নারীদের মূল্যই ছিল সবচেয়ে বেশি। পুরুষরা যখন যুদ্ধে যেত বা বিদেশ যাত্রায় যেত বা নিজ গৃহে থাকত সব সময়ই তারা নারীদের ভোগের বৈচিত্র্য চাইত। তাদের

এই যৌন কামনার পরিতৃপ্তি করার জন্য কুমারী মেয়েরা, বিধবা নারীরা, স্বামী পরিত্যক্তা স্ত্রীরা বা গরিবদের স্ত্রীরা অর্থের বিনিময়ে বেশ্যাবৃত্তি করত।

দীর্ঘদিন পর্যন্ত পূর্বাঞ্চলের দেশে বিবাহিত নারীদের মতো কুমারী মেয়েদের উপর কড়াকড়ি নিয়ম চাপানো হত না। কুমারীদের সতীত্বের প্রয়োজনবোধ পরবর্তী সময়ে উন্নত রুচিবোধের সঙ্গেই এসেছে। কুমারীদের বেলায় বেশ্যাবৃত্তি যে শুধু চলতে দেওয়া হত তাই নয়, বেবিলন, ফোনিসিয়া, লিডিয়া এবং অন্যান্য স্থানে ধর্ম অনুষ্ঠানের কাজ হিসাবেই চলত। এই প্রথার উদ্ভব হয়েছে আসলে আদিম যুগে যেভাবে বাছবিচারহীন যৌন সম্ভোগ চলত তার থেকে এবং পরবর্তীকালে ধর্মের নামে পুরোহিতরা লোকের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তাদের কাছে কুমারী মেয়েদের দিয়ে বেশ্যাবৃত্তি করাত। বেকোফেন (Bachofen) বলেন যে এই ধরনের প্রথা এখনো পর্যন্ত সুদূর ভারত, দক্ষিণ আরব, মাদাগাস্কার ও নিউজিল্যান্ডের অনেক উপজাতির মধ্যে চলে আসছে, যেখানে বিবাহের পূর্বে কনেকে সমগ্র উপজাতি বা গোষ্ঠীর কাছে সমর্পণ করা হয়। মালাবারে একরকম প্রথা আছে যে সেখানে যে ব্যক্তি কনের কুমারীত্ব প্রথম নষ্ট করবে তাকে বর পুরস্কার দেবে। "অনেক 'কাইমার' তাদের স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম যৌনসংগমের জন্য 'পাটামার'দের ভাড়া করে থাকে" ("Many Caimars hire Patamars who deprive their wives of their virginity") তার ফলে এই শ্রেণীর লোকদের খুব সম্মানের চোখে দেখা হত, এবং তারা এসব ব্যাপারে আগে থেকেই 'পাওনা-গণ্ডা' ঠিক করে নিত। রাজাদের (Zamorin) জন্য একাজ করবার দায়িত্ব ছিল উচ্চস্তরের পুরোহিতদের (Numburi), আর তারজন্য সেই পুরোহিতরা পঞ্চাশ স্বর্ণমুদ্রা করে পেত।* এই ধরনের নিয়ম কানুন পুরোহিতদের পক্ষে দ্বিগুণ সুবিধাজনক ছিল, তাই তারা এবং অন্যান্য কামুক পুরুষেরা এই নিয়মকানুনগুলিকে খুব সমর্থন করত ও জীইয়ে রাখবার চেষ্টা করত। এই রকম ভাবেই কুমারী মেয়েদের দ্বারা বেশ্যাবৃত্তির প্রথাটিকে ধর্মীয় নিয়ম ও কর্তব্যর মধ্যে ধরে নেওয়ার ব্যবস্থা হল। প্রকাশ্যে কুমারীত্ব নষ্ট করাকে মাতা ধরিত্রীকে ফলবতী ও উর্বর করার প্রতীক হিসাবে ধরা হত এবং ফলদাত্রী দেবীর আরাধনা হিসাবে প্রাচীনকালে আসচেরা-অস্টারট, মিলিটা এ্যাফ্রোডাইট, ভেনাস এবং কিবেলি (Aschera-Astarte, Mylitta, Aphrodite, Venus and Kybele)—এইসব দেবীর নামে সে সব প্রথা চলত। সেই দেবীর পূজার জন্য বিশেষ ধরনের মন্দির তৈরি করা হত, সেইসব মন্দিরে বহু রকমের কুঠরি থাকত যেগুলি কিনা ধর্মানুষ্ঠানের নামে উপরোক্ত ধরনের ব্যাভিচারের জন্য ব্যবহার করা হত। আর

*** K. Kautsky : Die Enstehung der Eheund Familie Kosmos, 1883. (The Origin of marriage and the Family).**

এই ব্যাভিচারের মূল্যস্বরূপ লোকেরা যে অর্থ দিত তা সবই ধর্মযাজকদের পকেটে যেত। যীশু যখন জেরুজালেমের মন্দির অপবিত্র করা হয়েছে বলে ব্যাপারী ও টাকা পয়সার লেনদেনকারীদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তখনও মন্দিরের সেই কক্ষগুলি কিন্তু ছিলই, এবং সেই কক্ষগুলিই আবার প্রেমের দেবীর সেবার নামে ব্যাভিচারের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

তখনকার দিনে নরনারীর মধ্যে যখন এই ধরনের যৌন সংসর্গ ছিল, তখন এতে আব আশ্চর্য হবার কিছু নাই যে পুরুষদের চোখে নারীব পতিতাবৃত্তি জিনিসটাকে নীতিবিগর্হিত বা অশোভন মনে হত না, আর বিশেষ করে যখন "জনমত" মানে ছিল শুধুমাত্র পুরুষদেরই মত। অনেক সংখ্যক নারী বিবাহিত জীবনের চেয়ে 'হেতেরে' (Hetaerae) প্রথার বা পতিতার স্বাধীন জীবন পছন্দ করত, এবং জীবিকা হিসাবে বেশ্যাবৃত্তি চালিয়ে যেত। পুরুষদের সংগে অবাধ যৌন সংসর্গের ফলে 'হেতেরে' বা পতিতাদের মধ্যে বেশী বুদ্ধিমতীরা, যারা কিনা ভাল বংশের থেকেই আসত, তারা কিন্তু জোর করে অজ্ঞ করে রাখা ও বন্দী করে রাখা বিবাহিত নাবীদের চেয়ে অনেক বেশী গুণসম্পন্ন ও শিক্ষিত হত।

এজন্য 'হেতেরে' বা পতিতাদের আকর্ষণ পুরুষদের কাছে খুব বেশী ছিল। এর থেকেই বোঝা যায় কেন গ্রীসের কোনো কোনো বিশিষ্ট ও বিখ্যাত ব্যক্তিদের কাছে অনেক পতিতা শ্রদ্ধার পাত্রী ছিল, যাদের সংগে তাদের ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ ছিল—যা তাদের আইনসম্মত বিবাহিতা স্ত্রীদের সংগে কখনও ছিল না। আজও পর্যন্ত এই বকম অনেক বিখ্যাত রক্ষিতাদের নাম শোনা যায়, কিন্তু তাদের বিবাহিতা স্ত্রীদের নাম শোনা যায় না।

এই অবস্থার মধ্যে প্রাচীনকালে নারীদের উপর চলত চরম শোষণ। তাদের যেমন শারীরিকভাবে আবদ্ধ করে নিষ্পিষ্ট করে রাখা হত, মানসিকভাবেও ততোধিক দাবিয়ে রাখা হত। ঘরকন্নার ক্ষেত্রে নারীর অবস্থা ছিল ভৃত্যের চেয়ে সামান্য উঁচুতে, নিজের ছেলে পর্যন্ত মায়ের উপর প্রভুত্ব করত, ছেলের কাছে মাকে নত হয়ে থাকতে হত। এই পারস্পরিক সম্বন্ধের কথা অডিসিতে (Odysey) চমৎকারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। টেলিমাচাস (Telemachus) যখন মনে করল যে সে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছে, তখন সে তার মায়ের পানি-প্রার্থীদের দলে ভিড়ে তার মা পেনিলোপা (Penelope)কে হুকুম করল নিজের ঘরে চলে যেতে। পেনিলোপা নিঃশব্দে তার পুত্রের হুকুম পালন করল। টেলিমাচাস তার মায়ের পানিপ্রার্থীদের কাছে কথা দিল যে তার পিতা যদি এক বৎসরের মধ্যে ফিরে না আসেন তবে ঐ পানিপ্রার্থীদের মধ্যে একজনের সংগে তার মায়ের বিবাহ দেবে। আর ঐ প্রার্থীরা মাতা সম্বন্ধে পুত্রের এই কথাকে বেশ স্বাভাবিক বলেই মনে করল। [সুসভ্য গ্রীসের নারীদের কথা "ইফিজেনিয়া ইন টরিস"-এ (Iphigenia

in Tauris) ভালভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ইফিজেনিয়া আপশোস করে বলেছে ঃ "মানবজাতির মধ্যে নারীদের অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয়। পুরুষের ভাগ্য প্রসন্ন হলে সে শাসকের পদে উন্নীত হয় এবং যুদ্ধক্ষেত্রে যশ লাভ করে, আর তার ভাগ্য বিমুখ হলে সে তার নিজের লোকের মধ্যেই স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করে। কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে সুখের সীমা খুবই সংকীর্ণ। তাকে অযাচিতভাবে, অনেক সময় অচেনা অজানা লোকের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে দেওয়া হয়। আর তার ঘর যদি ধ্বংসে হয়ে যায়, বিজিত ব্যক্তি তাকে ধ্বংসস্তূপের ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে, তার প্রিয়জনদের মৃতদেহের মধ্য দিয়ে তাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায়।"

এরপর যখন আমরা দেখি যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে বেশ গুরুত্ব দিয়েই এ প্রশ্ন আলোচিত হয়েছে যে নারীরা মনুষ্যজাতি কিনা এবং তাদের আত্মা আছে কিনা—তখন আমাদের বিস্মিত হবার কিছু নাই। চীনারা ও ভারতীয়রা নারীদের ক্ষেত্রে সমান মনুষ্যত্বের কথা অস্বীকার করেছে, এবং খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ম্যাকন-এর কাউন্সিলে (Council of Macon) নারীদের মনুষ্যত্ব ও আত্মার বিষয়টি খুব গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করা হলে সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠতায়ই তার সপক্ষে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। নারী মানুষ নয়, নারী যেন বস্তুবিশেষ, যাকে নিয়ে পুরুষ অন্যান্য সামগ্রীর মতো যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। সুতরাং যে সব রোমান-ক্যাথলিকরা মানুষের বিবেক নিয়ে চর্চা করত তারা যে এ নিয়ে কেন মাথা ঘামাবে না তার কোন কারণ নেই। এই সব থেকেই বোঝা যায় কেন এখনো পর্যন্ত নারীকে পরাধীন করে রাখা হয়েছে, এবং নারীর উপর শোষণ নিপীড়নের ধরন ধারণ বদল হলেও শোষণ নিপীড়ন ঠিকই চলে আসছে।

নারীর উপর অত্যাচারের বিভিন্ন রূপ ও তার ক্রমশঃ পরিবর্তনের বিষয় পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

সামাজিক সম্বন্ধের সর্বক্ষেত্রেই নারী পুরুষের পরাধীন ছিল, কিন্তু পুরুষের যৌন কামনার ক্ষেত্রে নারীর এই বশ্যতা ছিল আরো বেশি, যে দেশের আবহাওয়া যত গরম হয় সে দেশের মানুষের যৌন কামনা তত তীব্র ও উগ্র হয়ে ওঠে, তাদের রক্ত গরম হয়ে ওঠে ও দ্রুত প্রবাহিত হতে থাকে। আর সেই সঙ্গে সে সব দেশের জমি উর্বর হওয়ার দরুন তাদের জীবন সংগ্রামও অনেক সহজ থাকে। এই কারণে স্মরণাতীত কাল থেকে পূর্ব দেশগুলিতেই যৌন অপরাধ ও উচ্ছৃংখলতা বেশি দেখা গেছে, যেখানে কিনা সব চেয়ে ধনী ও সবচেয়ে দরিদ্র, সবচেয়ে জ্ঞানী ও সবচেয়ে অজ্ঞ—সকলেই সমানভাবে এদিকে ঝুঁকেছে, আর এই কারণেই সমস্ত সভ্য পূর্বদেশগুলিতে নারীদের বেশ্যাবৃত্তি অনেক আগে থেকেই চলে আসছে।

বেবিলোনিয়ান সাম্রাজ্যের শক্তিশালী রাজধানী বেবিলনে এই রকম আইন ছিল

যে প্রত্যেক কুমারী মেয়েকে অন্ততঃ একবার মিলিটা দেবীর (Goddess Mylitta) মন্দিরে তীর্থযাত্রা করতে হবে, এবং সেই দেবীর সম্মানার্থে সেখানে আগন্তুক পুরুষদের পছন্দ অনুযায়ী তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

আরমেনিয়াতে (Armenia) দেবী এ্যানাইটিসকেও (Anaitis) ঠিক এই একই ভাবে পূজা করা হত। ইজিপ্ট, সিরিয়া, ফোনিসিয়া, সাইপ্রাস, কারথেজ এবং এমন কি গ্রীস এবং রোমেও এই ধরনের যৌন পদ্ধতির সংগঠন ছিল। এমন কি ইহুদীদের মধ্যেও ধর্মানুষ্ঠানের অংগ হিসাবে নারীর পতিতাবৃত্তির চল ছিল তার প্রমাণ ওল্ড টেস্টামেণ্ট-এ (Old Testament) পাওয়া যায়। আব্রাহাম (Abraham) বিনা দ্বিধায় তার স্ত্রী সারাকে (Sarah) অন্যের কাছে ধার দিয়েছিলেন, অর্থাৎ ফেরোর (Pharaoh) কাছে দিয়েছিলেন যার জন্য ফেরো তাঁকে মূল্যবান পুরস্কার দিয়েছিলেন। ইহুদীদের পূর্বপুরুষ এবং যীশুখ্রীষ্টের পিতৃপুরুষ এই দর কষাকষির মধ্যে দোষের কিছুই দেখতে পাননি—আজকালকার ধারণায় যা কিনা আমাদের অত্যন্ত নোংরা আর বিশ্রী মনে হয়। ভাবতে অবাক লাগে যে এই ব্যক্তিকেই পরম শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখবার জন্য স্কুলের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। আমরা জানি যে লী এবং র‍্যাচেল নামে দুই ভগ্নিই জেকবের স্ত্রী ছিল, তারা আবার তাদের পরিচারিকাদের জেকবের রক্ষিতা হিসেবে দিয়েছিল, ডেভিড, সলোমন এবং অন্যান্যদেরও 'হারেম' বা অনেক রক্ষিতা থাকত, কিন্তু তার জন্য 'জেহবা' তাদের উপর রুষ্ট হয়নি। এসব ছিল স্বাভাবিক রীতি, এবং নারীরাও তার কোনো প্রতিবাদ করত না।

লিডিয়া, কারথেজ এবং সাইপ্রাসে তরুণী মেয়েদের বেশ্যাবৃত্তি করে তাদের বিবাহের যৌতুক সংগ্রহ করতে দেওয়া হত। একথা জোরের সংগে ঘোষণা করা হয়েছে যে মিশরের রাজা চিঅপস (Cheops) একটি পিরামিড তৈরি করার সমস্ত খরচই তাঁর কন্যার বেশ্যাবৃত্তি থেকে উপার্জিত অর্থে করেছিলেন। খ্রীঃ পূঃ ২০০০ সালে রাজা র‍্যামসিনিট (Rhampsinit) এক সময় তাঁর রাজকোষে একটি ধূর্ত চুরি আবিষ্কার করলেন। সেই চুরি ধরবার জন্য তিনি ঘোষণা করলেন যে, যে কেউ তাঁর কন্যার কাছে একটা বিশেষ কোনো কৌতূহল জানবার গল্প বলতে পারবে তার কাছেই তাঁর কন্যা আত্মসমর্পণ করবে। তারপর সেই চোরও সেই সব প্রার্থীদের মধ্যে ভিড়ে গেল। তার গল্প বলা হয়ে গেলে এবং পুরস্কার পাওয়া হয়ে গেলে রাজার কন্যা তাকে জোর করে ধরে রাখতে চেষ্টা করল। কিন্তু রাজকন্যা দেখল যে তার হাতের মধ্যে চোরের হাতের বদলে একখানি শবের হাত রয়েছে। এই ভেল্কিবাজী দেখে রাজা প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন যে চোর যদি নিজে থেকে এসে আত্মপ্রকাশ করে তবে তিনি তাকে কোনো শাস্তিই দেবেন না, এবং তার সংগে তাঁর কন্যার বিবাহ দেবেন। চোর তখন তাই করল।

এই জন্যই অনেকদিন পর্যন্ত, যেমন লিডিয়াবাসীদের মধ্যে, মায়েদের নামেই সন্তানদের পরিচয় দেবার প্রথা ছিল। অনেক প্রাচীন জাতির মধ্যে আরো একটা রীতির প্রচলন ছিল। জে সার (J. Scherr)-এর মতে প্রাচীন জার্মানদের মধ্যে যে রীতি প্রচলিত ছিল তা হল এই যে অতিথিদের প্রতি সৌজন্য দেখাবার জন্য লোকে নিজের স্ত্রী বা কন্যাকে তাদের সঙ্গে রাত্রি বাস করতে দিয়ে দিত।

বহু পূর্বে গ্রীসে সর্বজনীন প্রকাশ্য বেশ্যালয় রাখা হত। খ্রীঃ পূঃ ৫৯৪ এর সময়ে এথেন্সে সোলোন বেশ্যালয়গুলি সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে তৈরি করেছিল। আর তার জন্য সোলোন-এর সমসাময়িকরা তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বলেছিলঃ "ধন্য সোলোন। তুমি বেশ্যাদের কিনে নিয়ে শহরকে রক্ষা করেছ। কারণ তুমি যদি এই বিচক্ষণ পথ না নিতে তাহলে যে সব শক্তিশালী নবযুবকরাই শহরের নৈতিক মান রক্ষা করে, তারা অভিজাত নারীদের পিছনে লাগত।" এই ভাবেই পুরুষদের বেলায় যে ব্যাভিচারকে রাষ্ট্রীয় আইন মেনে নিয়েছে, নারীদের বেলায় তাকে অপমানজনক ও আইনত দণ্ডার্হ মনে করা হয়েছে। সেই একই সোলোন সেই একই এথেন্সে কিন্তু আবার এই নিয়ম চালু করেছে যে "কোনো নারী যদি তার প্রেমিকের সঙ্গে সহবাস করে তবে তার শাস্তি স্বরূপ তার সমস্ত স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হবে অথবা তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে।" তার স্বামী তাকে দাসী হিসাবে বিক্রি করেও দিতে পারে। আইনের চোখে নারী পুরুষের মধ্যে এই বৈষম্য তখনও যেমন ছিল আজও তেমনি আছে।

এথেন্সে একটা অতি মূল্যবান মন্দির উৎসর্গ করা হয়েছিল "হেতেরা" (Hetaera) বা পতিতাদের দেবীর নামে। খ্রীষ্টের ৪০০ বৎসর পূর্বে, প্লেটোর সময়ে করিন্থ (Corinth)-এর অ্যাফ্রোডাইট (Aphrodite) দেবী মন্দিরে অন্ততঃ হাজার বেশ্যা (Hierodulae) ছিল আর সেখানকার জাঁকজমক বিলাস-ব্যসনের জন্য সমগ্র গ্রীসময় সাড়া জাগত। যেমন ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি জার্মানদের কাছে প্রসিদ্ধ ছিল হামবুর্গ, তেমনি তখনকার দিনে গ্রীসের পুরুষ অধিবাসীদের কাছে ছিল করিনথ্। রক্ষিতারা (Hetaera) অনেকে ছিল তাদের রূপ এবং বুদ্ধিমত্তার জন্য প্রসিদ্ধ—যেমন ফ্রীন (Phryne), করিনথ-এর লাইস (Lais), ন্যাথোনা (Gnathoena) এবং আসপাসিয়া (Aspasia)—পরে যে কিনা বিখ্যাত পেরিক্লস্-এর স্ত্রী হয়েছিল—তারা ছিল গ্রীসের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের প্রশংসার পাত্র। আইন সভায় ও ভোজসভায়ও তাদের সঙ্গে নিয়ে যেত। আর গ্রীসের "সচ্চরিত্র" নারীরা কিন্তু প্রত্যেকেই থাকত তাদের ঘরের মধ্যে বন্দী। "সচ্চরিত্র" নারী প্রকাশ্যে কোথাও যেতে পারত না। রাস্তায় বেরুতে হলে তাদের বোরখা পরে বেরুতে হত, আর তার পোশাক পরিচ্ছদও থাকত অতি সাধারণ। তার শিক্ষা সভ্যতা খুব নীচু স্তরের থাকত, কারণ ইচ্ছে করেই তাকে শিক্ষাদীক্ষা

দেওয়া হত না। কথাবার্তাও সুন্দর ভাষায় বলতে পারত না, আর তার কোনো সুরুচি বা মাধুর্যও থাকত না। পুরুষদের মধ্যে অনেকেই তাই তাদের বিবাহিত স্ত্রীদের চেয়ে সুন্দরী পতিতাদের পছন্দ করত—আর তারাই ছিল সমাজের মাথা, দণ্ডমুণ্ডবিধাতা, তাদেরই কাজ ছিল বিবাহিত জীবন ও পারিবারিক জীবনের পবিত্রতা রক্ষা করা হচ্ছে কিনা তা দেখা।

শক্তিশালী বক্তা ডিমসথিনিস (Demosthenes) এথেনসবাসীদের যৌন-জীবনের সম্বন্ধের বর্ণনায় বলেছেন: "আমরা বিবাহ করি বৈধ সন্তানের জন্য এবং বিশ্বস্ত গৃহরক্ষকের জন্য। রক্ষিতাদের রাখি আমাদের প্রতিদিনের সেবার জন্য, পতিতাদের কাছে যাই প্রণয়ের স্ফূর্তির জন্য"। তাদের স্ত্রী ছিল শুধু সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র আর বাড়ি পাহারা দেবার বিশ্বস্ত কুকুর। বাড়ির কর্তা যেমন খুশী তেমন জীবন যাপন করত। নারী সম্বন্ধে এবং যৌন সম্বন্ধ বিষয়ে প্লেটো (PLATO) তাঁর "রাষ্ট্রে"র জন্য যে চিন্তা করেছিলেন, আমাদের ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী তা অত্যন্ত স্থূল এবং চরমপন্থী বলে মনে হয়। তিনি চেয়েছিলেন দলগত বা গোষ্ঠীগতভাবে স্ত্রী রাখার পদ্ধতি এবং নির্বাচনের দ্বারা বংশ বা প্রজন্ম নির্ধারণ করা। এ্যারিস্টটল (ARISTOTLE) আরো বুর্জোয়া, তাঁর "পলিটিকা"তে ("POLITICA") তিনি বললেন যে নারীরা স্বাধীন, যদিও তারা পুরুষদের চেয়ে নিচে, কিন্তু তিনি বললেন যে নারীদের "সৎপরামর্শ দেবার" অধিকার আছে। থাকিডাইডস (Thukydides)-এর মতের সংগে এখানকার অনেক সাধারণ লোকই একমত হবে। তিনি বললেন: "সেই স্ত্রীই সবচেয়ে বেশী প্রশংসার যোগ্য যার সম্বন্ধে বাড়ির বাইরে ভাল বা মন্দ কিছুই শোনা যাবে না"। সুতরাং তিনি চান যে নারীদের মধ্যে কোন উদ্যোগ বা সচেতনতা থাকবে না, তারা যেন কোন ক্ষেত্রেই পুরুষদের সীমা ছাড়িয়ে না যায়।

বেশীরভাগ গ্রীক রাষ্ট্রগুলি ছিল শহর এবং সেগুলির সংগে ভূখণ্ড সংযুক্ত ছিল। গ্রীকরা তাদের দাসদের* নিয়ে থাকত। সুতরাং শাসকশ্রেণীর লোক-সংখ্যা অতিরিক্ত বৃদ্ধি হলে অভ্যস্ত ধরনের জীবন যাপন করা মুস্কিল হয়ে পড়ত। সেজন্য এ্যারিস্টটল বললেন যে নারীদের সংযোগ থেকে বিরত থাকতে এবং স্বাভাবিক প্রণয়ের বদলে পুরুষদের পরস্পরের মধ্যে যৌন সংসর্গ চালাতে। সক্রেটিস (Socrates) সমলিঙ্গ যৌন সংসর্গকে উচ্চ সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ মনে করতেন। এক সময় গ্রীস দেশের পুরুষরাও তাই মনে করত এবং সেই নীতি অনুযায়ী চলত। পুরুষ বেশ্যালয়ের সংখ্যা নারী বেশ্যালয়ের সংখ্যার সমান সমান ছিল। এই রকমই এক সামাজিক আবহাওয়ার মধ্যেই থাকিডাইডস

* "যে এক ব্যক্তির জন্য কাজ করে সে হল দাস; আর যে জনগণের জন্য কাজ করে সে হল কারিগর বা দিনমজুর" এ্যারিস্টটল: পলিটিকা ("Politica")।

বলতে পেরেছিল ঃ "নারী বাত্যাহত তরঙ্গের চেয়ে, অগ্নির উত্তাপের চেয়ে, উম্মত্ত জল প্রপাতের চেয়ে অশুভ ; যদি কোন দেবতা নারীকে সৃষ্টি করে থাকেন, তবে তিনি যেখানেই থাকুন, তিনি জেনে রাখুন যে তিনি হলেন সবচেয়ে অশুভ শক্তির অসুখী সৃষ্টিকর্তা" ।*

রোম প্রতিষ্ঠিত হবার পর প্রথম কয়েক শতাব্দী ধরে সেখানকার নারীদের কোনো অধিকারই ছিল না। তাদের অবস্থা গ্রীসের নারীদের মতই শোচনীয় ছিল। রোম রাষ্ট্র যখন অনেক বৃদ্ধি পেল এবং সেখানকার অভিজাত ব্যক্তিরা বেশ ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে ফেলল তখনই সেখানকার নারীদের অবস্থার ক্রমশঃ পরিবর্তন এল, এবং তারা আইনের অধিকারের ক্ষেত্রে না হলেও সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্রে অনেকটা স্বাধীনতা পেল। তার জন্যই বয়ঃজ্যেষ্ঠ কেটো (CATO) অনুযোগ করে বললেন যে, যদি পরিবারের প্রত্যেকটি পিতা তার পূর্বপুরুষদের উদাহরণ মেনে চলত এবং তাদের স্ত্রীদের দাসী করে রেখে দিতে পারত, তবে আর নারীরা সাধারণ লোকেব মধ্যে এত উৎপাত করে বেড়াতে পারত না।**

রোম সাম্রাজ্যে নারী উত্তরাধিকারের অধিকার পেল। কিন্তু সে নিজে রইল অপ্রাপ্ত বয়স্কের পর্যায়ে, অর্থাৎ অভিভাবকের সম্মতি ছাড়া কোনো কিছু লেনদেন করার অধিকার তার ছিল না। পিতা যতদিন বেঁচে থাকত ততদিন পর্যন্ত সেই থাকত অভিভাবক, এমন কি কন্যার বিবাহ হয়ে গেলেও পিতাই অভিভাবক থাকত, যদি না সেই পিতা অন্য কাউকে অভিভাবকের স্থলাভিসিক্ত করত। পিতার মৃত্যুর পর তার সবচেয়ে নিকট আত্মীয় যে পুরুষ থাকত সেই হত তার কন্যার অভিভাবক, এমন কি সেই ব্যক্তির নিজের যদি উত্তরাধিকারের ক্ষমতা না থাকত তবুও সে অভিভাবক হতে পারত। আবার সেই নতুন অভিভাবক তার ইচ্ছামতো তার অভিভাবকের কাজের দায়িত্ব আর কোনো তৃতীয় ব্যক্তির উপরও দিয়ে দিতে পারত। রোমান আইন অনুসারে পুরুষই ছিল নারীর কর্তা, নারীর নিজস্ব কোনো ইচ্ছারই মূল্য ছিল না। বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকারও কেবল মাত্র পুরুষদেরই ছিল।

রোমের ক্ষমতা এবং ধনসম্পদ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পূর্বেকার নৈতিক কড়াকড়ি সব চলে গেল ও নানা রকম দোষ, অনাচার দেখা দিল। রোম হয়ে পড়ল লাম্পট্য ও ভোগবিলাসের কেন্দ্রস্থল। সাধারণ বেশ্যালয়গুলির সংখ্যা বাড়তে থাকল, আর সাধারণ মানুষদের মধ্যে গ্রীসের মতো সমলিঙ্গ যৌনসংসর্গ বেড়ে গেল। শাসক শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ না করা ও সন্তান হতে না দেওয়ার চল

* Leon Richer "La Femme Libre". (Free Woman)

** Karl Heinzen : "Ueber die Rechte und Stellung der Fraven" (The Rights and Position of Women).

বাড়তে থাকল, আর রোমের সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলারা তার শোধ তুলবার জন্য বেশ্যালয়গুলির তত্ত্বাবধায়কদের দলে নাম লেখাতে থাকল, যাতে তাদের ব্যাভিচারের অভিযোগে কঠোর শাস্তি না পেতে হয়।

বিবাহের সংখ্যা এবং সন্তানের জন্মহার দ্রুত কমে যেতে থাকল। বড় বড় ভূ-সম্পত্তির মালিকানা প্রথা ও তার ফলে গৃহযুদ্ধ হল তার কারণ। তখন খৃঃ পূঃ ১৬ সালে আগস্টাস (Augustus) তথাকথিত জুলিয়ান আইন (Julian Law) জারি করে ঘোষণা করলেন যে সন্তান হলে লোকে পুরস্কার পাবে আর অবিবাহিত থাকলে তাকে সাজা দেওয়া হবে। অবিবাহিত বা নিঃসন্তান পুরুষদের চেয়ে সন্তানের পিতাদের মর্যাদা বেশি হল। নিয়ম হল যে অবিবাহিত পুরুষরা শুধু তাদের নিকটতম আত্মীয়দের কাছ থেকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাবে, নিঃসন্তান পুরুষরা তাদের প্রাপ্য সম্পত্তির অর্ধেক মাত্র পাবে আর বাকি অর্ধেক সরকার নিয়ে নেবে। এই দেখেই প্লুটার্চ (Plutarch) বলেছিলেন: "রোমানরা বিবাহ করে বংশধরেব জন্য নয়, সম্পত্তির উত্তরাধিকারের জন্য।"

পরবর্তীকালে 'জুলিয়ান আইন' আরো কড়াকড়ি করা হল। টিবারিয়াস (Tiberius) ডিক্রি জারি করলেন যে এমন কোনো নারীই বেশ্যাবৃত্তি করতে পারবে না—যার পিতামহ, পিতা অথবা স্বামী হলেন রোমান নাইট। যে সমস্ত বিবাহিতা নারী বেশ্যাবৃত্তিতে নাম লিখিয়েছে তাদের ব্যাভিচারী বলে গণ্য করা হবে এবং ইটালী থেকে নির্বাসিত করা হবে। অবশ্যই পুরুষদের বেলায় এ সমস্ত সাজা ছিল না।

রোম সাম্রাজ্যে বিভিন্ন রকমের বিবাহ অনুষ্ঠান হত। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে অনুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন হত উচ্চস্তরের ধর্মযাজকদের দ্বারা এবং অন্তত দশজন সাক্ষীর সামনে। মিলনের নিদর্শন হিসাবে বর-কনে একসঙ্গে ময়দা, নুন আর জল দিয়ে তৈরী কেক একত্রে গ্রহণ করত। দ্বিতীয় পদ্ধতি ছিল "অধিকার গ্রহণ করা"—এই প্রথায় ছিল বিবাহ সম্পন্ন হবার পূর্বে পিতা বা অভিভাবকের সম্মতি নিয়ে পাত্রের সঙ্গে একই বাড়িতে পাত্রী এক বৎসর থাকত। তৃতীয় পদ্ধতি ছিল পরস্পরের মধ্যে একটা বেচাকেনার মতো: উভয়পক্ষ থেকেই স্বর্ণমুদ্রা এবং বিবাহের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হত।

ইহুদীদের মধ্যে অনেক আগে থেকেই বিবাহ জিনিসটা একটা ধর্মানুষ্ঠান হিসাবে চলত। তা সত্ত্বেও বিবাহের ব্যাপারে কনের মতামত দেবাব কোনো অধিকার ছিল না; তার পিতাই পাত্র নির্বাচিত করত। ইহুদীদের আইন ও নীতিবাক্য সম্পর্কিত 'তালমুদ'এ (TALMUD) লেখা আছে: "কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হলে, তোমার একজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দাও এবং তোমার কন্যাকে তার বাগদত্তা করে দাও"। ইহুদীদের মধ্যে বিবাহ জিনিসটা একটা কর্তব্য বলে ধরা হত। "ফলপ্রসূ হও এবং বংশ বৃদ্ধি কর"—ইহুদী জাতি সমস্ত ধর্মীয়

নির্যাতন ও নিপীড়ন সত্ত্বেও এই আদেশ মান্য করেছে এবং বহু সংখ্যায় বংশবৃদ্ধি করেছে। ইহুদীরা হল "ম্যালথাসবাদের" (Malthusianism) একেবারে বিরোধী।

তাদের সম্বন্ধে ট্যাসিটাস (TACITUS) বলেছেন: "তারা একগুঁয়ের মতো নিজেদের মধ্যেই মিশে থাকে, পরস্পরের প্রতি উদার থাকে, কিন্তু অন্য সবাইকে তারা শত্রু মনে করে, ঘৃণা করে। তারা বাইবের কোনো লোকের সঙ্গে পানাহার করে না। আর খুবই কামুক হওয়া সত্ত্বেও অন্য কোনো জাতির নারীদের সঙ্গে সহবাস করে না···কিন্তু তারা নিজেদের বংশবৃদ্ধি করে যায়। তারা নিজেদের সন্তানকে হত্যা করাকে পাপ মনে করে। তারা বিশ্বাস করে যে যুদ্ধে বা ফাঁসিতে যারা প্রাণ দেয় তাদের আত্মা অমর। তাই তাদের মধ্যে দেখা যায় নিজেদের জাতির বংশবিস্তার করার আকাঙ্ক্ষা ও মৃত্যুর প্রতি ঘৃণা"।

ট্যাসিটাস ইহুদীদের ঘৃণা ও বিদ্বেষের চোখে দেখতেন, কারণ তারা তাদের পূর্বপুরুষদের অখ্রীষ্টান (Heathen) ধর্ম মানত না, এবং উপহার ও ধনসম্পদ জড়ো করত। তিনি তাদের সবচেয়ে নীচুস্তরের মানুষ, জঘণ্য জাতি বলে মনে করতেন।*

তখন রোমানদের অধীনে ইহুদীরা বিতাড়িত হয়ে নিজেদের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠভাবে মিশে থাকত, আর সেইভাবে তাদের মধ্যে পারিবারিক সম্বন্ধ আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠত। খ্রীষ্টানদের আমলে প্রায় সমগ্র মধ্যযুগ ধরেই কঠোর দুঃখ দুর্দশাই ইহুদীদের অদৃষ্টে জুটেছে এবং ইহুদীদের প্রতি এভাবে অত্যাচার নিপীড়ন করা তো এখনকার বুর্জোয়া দুনিয়ায় আদর্শের নিদর্শন হিসাবে চলে আসছে আর তাদের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকার বৈশিষ্ট্যই দেখা গেছে। তখন কিন্তু রোমের সমাজের মধ্যে ভাঙন চরমে পৌঁছেছে। একদিক থেকে চরম ব্যাভিচার, আর অন্য দিক থেকে কঠোর সংযম দেখা গেছে। কঠোর সংযম ধর্মের অঙ্গ হয়ে উঠল, আর অত্যন্ত গোঁড়ামির সঙ্গে তার প্রচার করা হত। উচ্ছৃংখল বিলাস ব্যসন সীমা ছাড়িয়ে গেল। তারই বিপরীত অবস্থা দেখা গেল চরম দুঃখ দুর্দশা লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে—যাদের বিজিত রোম পৃথিবীর সমস্ত দিক থেকে নিয়ে এসেছিল ইতালীতে দাসত্ব করবার জন্য। তাদের মধ্যে ছিল অসংখ্য নারী, যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে এসেছিল তাদের গৃহ ও সন্তানদের কাছ থেকে, তাদের স্বামীদের কাছ থেকে, তারাই সবার চেয়ে বেশি দুঃখ ভোগ করেছিল, এবং সেই অবস্থা থেকে উদ্ধারের জন্য আকুল হয়ে উঠেছিল। রোমান নারীদের মধ্যেও অনেকের অবস্থাও তাদের চেয়ে বিশেষ উন্নত ছিল না, আর তারা অন্যাদের দুঃখ দুর্দশা অনুভব করত। তার উপর রোমানরা

* Tacitus : 'History' 5th Book.

যখন জেরুজালেম এবং ইহুদীদের রাজত্ব জয় করে নিল, এবং সমস্ত জাতীয় স্বাধীনতার নিধন করল, তখন সেখানকার কঠোর ধার্মিকদের মধ্যে গোঁড়ামি মাথা-চাড়া দিয়ে উঠল, আর তারা ঘোষণা করল যে নূতন এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে, যা কিনা সকলের জন্য আনবে সুখ ও স্বাধীনতা।

খ্রীষ্টধর্ম জেগে উঠল। তার মনুষ্যদ্বেষী উপদেশাবলী, সংযম ও দেহের কৃচ্ছ্র সাধনার বাণী প্রচার করল। তার দ্ব্যর্থবোধক ভাষাগুলি স্বর্গের এবং মর্তের রাজ্যে সমানভাবেই প্রয়োগ করা চলে বলে রোম রাজ্যের জলাভূমির পক্ষে বেশ উপযোগীই হল। অন্য সমস্ত দুর্ভাগাদের মতো নারীরাও তাদের দুরবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য এই ধর্মের খুব আগ্রহী অনুরক্ত হয়ে পড়ল। এই দুনিয়ায় অতীতে বা বর্তমানে এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ বড় আন্দোলন হয়নি যার মধ্যে নারীরা গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রামী ভূমিকা না গ্রহণ করেছে আর শহীদ হয়েছে। যারা খ্রীষ্টধর্মকে মানব সভ্যতার একটা মস্তবড় কীর্তি বলে উচ্চকণ্ঠে গেয়ে থাকে তারা যেন না ভুলে যায় যে এর সাফল্যের পিছনে নারীদের অবদান রয়েছে অনেকখানি। খ্রীষ্টধর্ম প্রবর্তনের গোড়ার দিকে এই ধর্মের বিষয়ে নারীদের প্রবল আগ্রহ দেখা গিয়েছে, এবং তারা এই ধর্ম প্রচারের জন্য খুব সফল প্রতি-নিধির কাজ করেছে—যেমন মধ্যযুগের বর্বর জাতিগুলির লোকেদের তেমনি উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিদের তারা এই ধর্মে ধর্মান্তরিত করেছে। অন্যান্যদের মধ্যে ক্লটিলডার (CHLOTILDA) নাম শোনা যায়, যে ফ্রাংক-এর রাজা ক্লডউইগ (CLODWIG)-কে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতে প্ররোচিত করেছিল। শোনা যায় যে কেণ্ট-এর রানী বার্থা (BERTHA) ও হাঙ্গেরীর রানী গীসেল (GISEAL) তাদের নিজেদের দেশে খ্রীষ্টধর্মের প্রবর্তন করেছিল। আর নারীর প্রভাবেই পোল্যাণ্ডের ডিউক, জ্যারিশ্লর জার এবং আরো অনেক রাজা ও উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল।

খ্রীষ্টধর্ম কিন্তু তার বদলে নারীর প্রতি অবিচারই করেছিল। পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য প্রাচীন ধর্মের মতো খ্রীষ্টধর্মও নারীদের বিষয়ে একই রকম উপদেশ দিল। এই ধর্ম নারীকে পুরুষের দাসীর পর্যায়ে নামিয়ে দিল এবং স্বামীদের বশবর্তী হয়ে থাকতে বাধ্য করল।

এবার দেখা যাক বাইবেল এবং খ্রীষ্টধর্ম নারী এবং বিবাহ সম্বন্ধে কি সুরে কথা বলেছে।

সৃষ্টির গোড়া থেকেই নারীকে পুরুষের বশবর্তী হয়ে থাকতে বলা হয়েছে। বাইবেলের পূর্বভাগে (Old Testament) বর্ণিত দশটি বিধান (Ten Commandments) প্রকৃত পক্ষে শুধু পুরুষদের জন্যই বলা হয়েছে, কারণ দশম বিধানটিতে নারীদের উল্লেখ দাসদাসী এবং গৃহ পালিত পশুদের

সঙ্গে একসঙ্গে করা হয়েছে। সত্যিই, নারী হল একটা সম্পত্তি বিশেষ যা কিনা পুরুষ অর্থের বিনিময়ে বা কাজের বিনিময়ে লাভ করে থাকে। যীশুর সম্প্রদায়, বিশেষ করে যৌন সম্পর্ক বিষয়ে, তাদের দলের লোকদের উপর কঠোর কৃচ্ছ্র-সাধনার আদেশ দিত। যীশু বিবাহ জিনিসটাকে অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। তিনি প্রচার করেছিলেন ঃ "কোনো কোনো লোক মাতৃগর্ভ থেকেই নপুংসক হবে, কোনো কোনো লোককে নপুংসক করা হবে, আর কোনো কোনো লোক স্বর্গ রাজ্যের জন্য নপুংসক থাকবে"। যীশুর মাতা যখন ক্যানাতে (CANA) বিবাহের ভোজের জন্য বিনীতভাবে তাঁর সাহায্য চেয়েছিলেন তখন তিনি জবাব দিয়েছিলেন ঃ "হে নারী, তোমাকে দিয়ে আমার কি প্রয়োজন ?"

আর পল, যাঁর সম্বন্ধে বলা হয় যে যীশুর চেয়েও খ্রীষ্টধর্ম প্রবর্তনের জন্য বেশী করেছিলেন তাঁর কথা দেখা যাক। পল, যিনি সর্বপ্রথম এই ধর্মকে ইহুদীদের সংকীর্ণ গন্ডী থেকে মুক্ত করে আন্তর্জাতিক রূপ দিয়েছিলেন, তিনি প্রচার করলেন ঃ "পুরুষের পক্ষে নারীকে স্পর্শ না করা ভাল। যে পুরুষ নারীকে (কুমারীকে) বিবাহ দেয় সে ভাল করে, কিন্তু, যে বিবাহ দেয় না সে আরো ভাল করে।" আধ্যাত্মিক পথে চল, জৈব কামনা চরিতার্থ কোরো না, কারণ দেহ এবং আত্মা পরস্পর বিরোধী। "যারা খ্রীষ্টের ভক্ত তারা জৈব কামনা বাসনাকে ক্রুশবিদ্ধ করে বধ করে ফেলেছে।" তিনি তাঁর নিজের নীতি মেনে চলেছিলেন এবং অবিবাহিত ছিলেন। দেহের প্রতি এই ঘৃণা থেকেই দেখা গেল নারীর প্রতি ঘৃণা, কারণ নারীকেই মনে করা হত পুরুষকে প্রলুব্ধ করছে বলে। 'প্যারাডাইস' বা স্বর্গের দৃশ্যের তুলনা করে দেখ, এই দৃষ্টি দিয়ে দেখলে তা কত তাৎপর্যপূর্ণ দেখাবে। এই একই নীতি উদ্বুদ্ধ করেছে ধর্মপ্রচারকদের, গীর্জার পুরোহিতদের, এই একই নীতি সমগ্র মধ্যযুগব্যাপী গীর্জার কর্মপদ্ধতি নির্দিষ্ট করেছে এবং সেই একই নীতি এখনো পর্যন্ত চালু রয়েছে।

খ্রীষ্টধর্মের মতে নারী হল অপবিত্র, সে পুরুষকে প্রলুব্ধ করে, এবং এ দুনিয়ায় পাপ নিয়ে এসেছে এবং পুরুষের পতন ঘটিয়েছে। ফলতঃ সমস্ত ধর্ম প্রচারকরা, গীর্জার পুরোহিতরা বিবাহ জিনিসটাকে একটা অনিবার্য অমঙ্গল বলে মনে করেছে, ঠিক যেমন আজকের দিনে পতিতাবৃত্তিকে মনে করা হয় একটা অনিবার্য অমঙ্গল বলে। যেমন, টারটুলিয়ান (Tertullian) ঘোষণা করলেন "হে নারী, তোমার উচিত সর্বদা ছিন্নবস্ত্র পরিধান করে অনুশোচনায় কাঁদতে কাঁদতে শোক প্রকাশ করে চলা, যাতে মানুষ ভুলতে পারে যে তুমিই সমগ্র মানব-জাতির ধ্বংসের কারণ। নারী! তুমি নরকের দ্বার"। জেরোম (Jerome) বলেছেন ঃ "বিবাহ হল বড় জোর একটা দোষ, আমরা যা করতে পারি তা হল এর জন্য ক্ষমা করা এবং একে বিশুদ্ধ করা"। তদনুসারে বিবাহকে করা হল

গীর্জার একটি ধর্মানুষ্ঠান। অরিজেন (Origen) ঘোষণা করলেন : "বিবাহ হল একটা অপবিত্র নোংরা জিনিস, যৌন কামনা চরিতার্থ করার উপায় বিশেষ"। সুতরাং তিনি প্রলোভন এড়াবার জন্য নিজেকে পুরুষত্বহীন করেছিলেন। টারটুলিয়ান বলেছেন : "চিরকৌমার্যই ভাল, তাতে যদি শেষ পর্যন্ত মনুষ্যজাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তো যাক"। আগস্টিন (Augustine) বলেছেন : "অবিবাহিত ব্যক্তিরা স্বর্গে উজ্জ্বল তারকার মতো আলোক বিকীরণ করবে, আর যারা সন্তানের জন্ম দিয়েছে সেই পিতামাতারা থাকবে দীপ্তিহীন তারকার মতো। ইউসেবিয়াস এবং জেরোম (Eusebius and Jerome) উভয়েই এবিষয়ে একমত যে বাইবেল যে বলেছে : "ফলপ্রসূ হও এবং বংশবৃদ্ধি কর" তা সময়োপযোগী নয় এবং খ্রীষ্টানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এরকম প্রখ্যাত ধর্মযাজকদের শত শত উদ্ধৃতি দিয়ে দেখানো যায়, তাঁরা সকলেই এই একই উপদেশ দিয়েছেন, আর এই শিক্ষা একটানাভাবে ছড়াতে ছড়াতে যৌন জীবন ও যৌন সম্বন্ধ সম্পর্কে অস্বাভাবিক ধ্যান ধারণা ছড়িয়ে গেছে, যদিও একথা ঠিক যে মানুষের যৌন সম্বন্ধ প্রকৃতিরই স্বাভাবিক নিয়ম, এবং তার মধ্য দিয়ে সে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য সমাধান করে থাকে। আধুনিক সমাজে পর্যন্ত এই শিক্ষার দোষ রয়ে গেছে, অবশ্য তা ক্রমশঃ ক্রমশঃ দূর হচ্ছে।

পিটার (Peter) জোরের সঙ্গে নারীদের বলেছেন : "তোমাদের স্বামীদের বাধ্য হয়ে চল"। পল (Paul) ইফিউসিয়ানদের (Ephesians) লিখেছেন : 'খ্রীষ্ট যেমন গীর্জার মাথা, স্বামীও তেমনি স্ত্রীর মাথা" এবং করিনথিয়ানদের "প্রত্যেক পুরুষের প্রভু খ্রীষ্ট আর প্রত্যেকটি নারীর প্রভু হল পুরুষ"। এই ধারণা অনুযায়ী যে কোন হাঁদা বোকা পুরুষ নিজেকে সবচেয়ে চালাক নারীর চেয়েও শ্রেষ্ঠ মনে করতে পারে, এবং করেও তাই। পল তাঁর প্রভাবশালী কণ্ঠস্বর নারীদের শিক্ষা ও কৃষ্টির বিরুদ্ধে তুলে বলেছিলেন : "নারীরা পরাধীন থেকে নীরবে শিক্ষালাভ করুক, কিন্তু তারা যে শেখাবে অথবা পুরুষের উপর কর্তৃত্ব করবে আমি তা সহ্য করব না, তারা চুপচাপ থাকুক।"

একথা সত্য যে এই রকম নীতি শুধু খ্রীষ্টধর্মের বৈশিষ্ট্যই ছিল না। খ্রীষ্টধর্ম ছিল ইহুদী ধর্ম ও গ্রীক দর্শনের মিশ্রণ, এবং গ্রীক দর্শনের উৎপত্তি হয়েছিল মিশর, বেবিলন ও ভারতের প্রাচীন সভ্যতা থেকে। খ্রীষ্টধর্মে নারীকে যেভাবে হেয় করে রাখা হয়েছিল, প্রাচীন বিশ্বের সর্বত্রই নারীর সে অবস্থা ছিল। তথাকথিত খ্রীষ্টান জগতে নারীর অবস্থার ক্রমশঃ যে উন্নতি হয়েছে, তার জন্য খ্রীষ্টধর্মের কোনো কৃতিত্ব নাই—খ্রীষ্টধর্মের বিধিনিষেধ সত্ত্বেও পাশ্চাত্য সভ্যতার অগ্রগতির ফলেই তা হতে পেরেছে।

সুতরাং খ্রীষ্টধর্মের প্রবর্তনের সময় থেকে আজকের দিনে নারীদের অবস্থার

যদি উন্নতি হয়ে থাকে তার জন্য খ্রীষ্টধর্মের কোনো কৃতিত্ব নাই। খ্রীষ্টধর্ম শুধু অনিচ্ছা সত্ত্বে, চাপে পড়ে নারীদের প্রতি তার প্রকৃত মনোভাবটা চেপে রেখেছে। ধর্মান্ধ ব্যক্তিরা, যারা কল্পনা করে থাকে যে খ্রীষ্টধর্মের উদ্দেশ্য হল মানব জাতিকে মুক্ত করা, তারা অন্য অনেক বিষয়ের মতো এ বিষয়েও ভিন্ন মত পোষণ করে থাকে। তারা দৃঢ়তার সঙ্গে বলে থাকে যে, খ্রীষ্টধর্মই নারীকে তার পূর্বেকার পরাধীন অবস্থা থেকে মুক্ত করেছে, আর এই কথা প্রমাণ করার জন্য তারা ঈশ্বরের মাতা, মেরী মাতাকে পূজা করার উদাহরণ দেখায়, মেরীমাতাকে শ্রদ্ধা জানাবার মাধ্যমে সমগ্র নারীজাতিকেই শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে বলে থাকে। আমাদের সন্দেহ আছে যে, যে ক্যাথলিক গীর্জায় মেরী মাতার পূজা হয়ে থাকে, তারা হয়তো জোরের সঙ্গেই এই মতবাদ অস্বীকার করবে। যে সব মহাপুরুষ ধর্মযাজকদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাঁরা সকলেই, এবং তাদের মতো আরো অনেকেই যাঁদের মধ্যে আছেন সবচেয়ে বড় বড় বিখ্যাত ব্যক্তিরা তাঁরা সকলেই নারীদের বিরুদ্ধে একমত। পূর্বে যে 'কাউন্সিল অব ম্যাকন'এর (Council of Macon) কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যারা ষষ্ঠ শতাব্দীতে আলোচনা করেছিল যে নারীদের আত্মা আছে কিনা, তাদেরও যে নারীদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল তা মনে হয় না। সপ্তম জর্জের* কৌমার্য প্রথা প্রবর্তন করার মধ্য দিয়ে সমাজ সংস্কারকদের বিশেষ করে কলভিন (Calvin) এর ব্যগ্রতার মধ্য দিয়ে, "যৌন কামনার" বিরোধিতার মধ্য দিয়ে, এবং সর্বোপরি বাইবেল-এর অসংখ্য মানব-বিদ্বেষী, নারীবিদ্বেষী লেখার মধ্য দিয়ে তার উল্টোটাই অর্থাৎ নারীর প্রতি অশ্রদ্ধাই প্রমাণিত হয়।

ক্যাথলিক গীর্জাগুলি যখন মেরী মাতার পূজা আরম্ভ করল তখন তারা একটা ধূর্ত কূটবুদ্ধি দ্বারাই তা করেছিল। যে সব তথাকথিত "অসভ্য" দেশে খ্রীষ্টধর্মের প্রচার চলছিল তারা যে সব দেবীর পূজা করত তার বদলে খ্রীষ্টানদের নিজেদের একটি দেবীর প্রতিষ্ঠা করার জন্যই তারা মেরী মাতার পূজা আরম্ভ করল। দক্ষিণ দেশগুলির কিবেল (Kebele), মিলিট্টা (Mylitta), এ্যাফ্রোডাইট (Aphrodite), ভেনাস (Venus) প্রভৃতি দেবী, জার্মান জাতির এড্ডা (Edda)

* যে নিয়মের বিরুদ্ধে মেইনজ-এর (Mainz) বিশপ এলাকার পুরোহিতরা প্রতিবাদ করে বলেছিলেন: "আপনারা বিশপ ও মঠাধ্যক্ষরা অনেক ধন ঐশ্বর্যের অধিকারী, অনেক আমোদ-প্রমোদ, বিলাসিতার সুযোগ পান, আর আমাদের আনন্দ দেবার জন্য থাকে শুধু স্ত্রী। কৌমার্য পালন করা একটি গুণের কাজ হতে পারে, কিন্তু সত্য কথা বলতে কি তা অত্যন্ত কঠোর ও কঠিন কাজ।"

Yves Guyot: "Les Theories Sociales du Christianisme" (The Social Theories of Christianity.) Second edition, Paris.

ফ্রেয়া (Freya) প্রভৃতি দেবীর বদলে খ্রীষ্টধর্ম মেরী মাতাকে আদর্শ দেবী বলে প্রতিষ্ঠা করল।

খ্রীষ্টান যুগের প্রথম শতাব্দীগুলিতে দুর্বল হয়ে পড়া রোম সাম্রাজ্যে অশিক্ষিত শক্তিশালী অথচ সাদাসিদে, প্রচুর শারীরিক শক্তি সম্পন্ন জাতিগুলি ব্যাপকভাবে ছেয়ে গিয়েছিল, আর সেখানেই পূর্ব ও পশ্চিম থেকে প্রচণ্ড ঢেউয়ের মতো এসে যে খ্রীষ্টধর্ম গেঁড়ে বসেছিল তার, খ্রীষ্টান ধর্মযাজকদের কৃচ্ছ্রসাধনার শিক্ষাগুলির তারা সর্বশক্তি দিয়ে বিরোধিতা করেছিল, আর সেই ধর্মযাজকদের ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক সেই শক্তিশালী জাতিগুলির কথা গণ্য করতে হয়েছিল। রোমবাসীরা বিস্ময়ের সংগে দেখেছিল যে তাদের নিজেদের চেয়ে এই জাতিগুলির নীতিবোধ সম্পূর্ণ পৃথক। ট্যাসিটাস তা স্বীকার করে বলেছেন ঃ "তাদের বিবাহ পদ্ধতি খুব কড়া, তাদের অন্যসব রীতি নীতির চেয়ে তা প্রশংসনীয়। কারণ তারাই প্রায় একমাত্র বর্বর জাতি যাঁরা একটি মাত্র স্ত্রী গ্রহণ করেই সন্তুষ্ট থাকে। এই জনবহুল জাতির মধ্যে ব্যাভিচারের কথা প্রায় শোনাই যায় না, আর কোথাও ব্যাভিচার হলেই তৎক্ষণাৎ স্বামীরা তার শাস্তি বিধান করে। পুরুষ সেই ব্যাভিচারী নারীকে মাথা মুড়ে, উলংগ করে আত্মীয় স্বজনের সামনে গ্রাম থেকে বিতাড়িত করে দেয়, কারণ শিষ্টাচারের বিরুদ্ধে কোনো অপরাধকে ক্ষমা করা হয় না। তারপর তার রূপ যৌবন অর্থ যাই থাক না কেন তার আর স্বামী জুটবে না। কারো দোষ দেখে কেউ ঠাট্টা করে না, প্রলুব্ধ করাকে সদগুণ বলে মনে করা হয় না। যুবক পুরুষরা দেরীতে বিয়ে করে নিজেদের শক্তি রক্ষা করে। নারীরাও তাড়াতাড়ি বিয়ে করে না, শরীরের দিক থেকেও তারা লম্বা চওড়ায় একই রকম। বিবাহের সময় তাদের নারী-পুরুষের বয়স এবং স্বাস্থ্য একই রকম থাকে, এবং তাদের সন্তানরাও পিতামাতার স্বাস্থ্য শক্তি পেয়ে থাকে।"

আমরা যেন ভুলে না যাই যে ট্যাসিটাস রোমানদের কাছে একটা আদর্শ খাড়া করবার জন্য অতি আগ্রহে প্রাচীন জার্মানদের বিবাহ সম্পর্কের একটা উজ্জ্বল চিত্র এঁকেছেন, অবশ্য যদিও সে বিষয়ে তাঁর নিজেরই যথেষ্ট জ্ঞান ছিল না। যদিও একথা সত্য যে ব্যাভিচারী নারীকে কঠোরভাবে শাস্তি দেওয়া হত, কিন্তু ব্যাভিচারী পুরুষদের বেলায় তা হত না। জার্মান স্ত্রীও সম্পূর্ণভাবেই তার স্বামীর পদানত ছিল। স্বামীই ছিল তার প্রভু। স্ত্রীই সবচেয়ে কঠিন কাজগুলি করত, গৃহস্থালীর সমস্ত দায়িত্ব পালন করত, আর স্বামী যুদ্ধ করত, শিকার করত, পান করত, স্ফূর্তি করত, অথবা তার ভাল্লুকের চামড়ার উপর শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখে দিন কাটিয়ে দিত।

সমস্ত প্রাচীন জাতির মতো প্রাচীন জার্মান জাতির মধ্যেও পিতৃ প্রধান

পরিবারই ছিল সমাজের প্রথম রূপ। তার থেকে ক্রমশঃ গড়ে উঠল গোষ্ঠী, দল ও জাতি। পরিবারের প্রধান ছিল দলের জন্মগত কর্তা, তার পরেই ছিল পরিবারের পুরুষরা। স্ত্রী কন্যা এবং পুত্রবধূদের পরামর্শ দেওয়ার বা কর্তৃত্ব করার কাজ থেকে বাদ দেওয়া হত।

ঘটনাক্রমে এরকমও দেখা গেছে যে বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে নারীরাও যে গোষ্ঠীর নেতৃত্ব করেছে, সে কথা ট্যাসিটাস খুবই বিরক্তি ও অবজ্ঞার সংগে বলেছেন, কিন্তু সে রকম উদাহরণ খুবই কম। গোড়ার দিকে নারীদের উত্তরাধিকারের কোনো অধিকার ছিল না। পরবর্তীকালে তারা উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে পুরুষদের অংশীদার হয়েছে। অরণ্য, মাঠ বা জলরাশি ছাড়া যে সব সাধারণ জমি গোষ্ঠীর সকলের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হত, প্রত্যেক স্বাধীন জার্মানীর তার অংশ পাবার অধিকার ছিল। জার্মান তরুণদের বিবাহ হলেই সে তার জমির অংশ পেত ; আর তার সন্তান হলে সে আরো কিছু অতিরিক্ত জমি পেত। এটাও একটা সাধারণ নিয়ম ছিল যে তরুণ বিবাহিত দম্পতিদের ঘর-সংসারের জন্য কিছু কিছু বিশেষ সুবিধা দিতে হবে ; যেমন, তাদের ঘর বানাবার জন্য বড় বড় গাছের কাঠ দেওয়া হত। প্রতিবেশিরা তাদের জিনিসপত্র জোগাড় করা, ঘরবাড়ি তৈরি করা, চাষবাসের উপকরণ, ঘরকন্যার বাসনপত্র প্রস্তুত করার কাজকর্মে স্বেচ্ছায় সাহায্য করত। কন্যা সন্তানদের জন্ম হলে পিতামাতা একবোঝা কাঠ পাবার অধিকারী হত, কিন্তু পুত্র সন্তানের জন্ম হলে তারা পেত দুই বোঝা।* এই থেকেই আমরা দেখতে পাই যে মেয়েদের মূল্য ধরা হত ছেলেদের মূল্যের অর্ধেক।

বিবাহ অনুষ্ঠান ছিল সাদাসিদা, ধর্মানুষ্ঠানের কোনো ব্যাপার ছিল না। পরস্পরের সম্মতিসূচক ঘোষণাই যথেষ্ট ছিল এবং বর কনে বাসর ঘরে গেলেই বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেছে ধরা হত। বিবাহ জিনিসটা সিদ্ধ বা বিধিবদ্ধ করতে হলে যে পাদ্রী পুরোহিতের দ্বারা মঞ্জুর করাতে হবে সে ধারণা দেখা যায় ৯ম শতাব্দী থেকে, আর ১৬শ শতাব্দী থেকেই "ট্রেন্ট এর কাউন্সিল" (Council of Trent) বিবাহ জিনিসটাকে একটা ধর্মের সংগে জড়িত আধ্যাত্মিক পর্যায়ে তুলল। প্রথম যুগের সহজ সরল বিবাহ অনুষ্ঠানে থেকে, যা কিনা ছিল শুধু দুটি পুরুষ ও নারীর মধ্যে ব্যক্তিগত চুক্তি বিশেষ—তার থেকে গোষ্ঠীর বা নৈতিক

---

* Eyn iglich gefurster man, dere n Kindbette hat ist sin kint eyn docher, so Mager eyn wagen Vol bornholxes von urholx verkaufen of den samstag. Ist iz eyn sone, so mag he iz tun of den dinstag und of den samstag von ligendem holz oder von urholz und sal den frauwen davon kaufen win und schon brod dyeweile sie kintes june lit. "G. L. V. Maurer : *Geschichte der* Markenverfassung in *Deutschland.*" (History of the constitution of the Marks in Germany.)

জীবনের ক্ষেত্রে কোনো ক্ষতি হয়েছে বলে ইতিহাসে কোনো সাক্ষ্য আমরা পাই না। বিবাহের পদ্ধতি থেকে নৈতিক অবনতি হয়নি, নৈতিক অবনতি হয়েছে স্ত্রীদের যেভাবে স্বামীদের দাসী ও গোলাম করে রাখা হয়েছে আর স্বামীরা তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে যেভাবে স্বেচ্ছাচার করেছে তার থেকে। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় দাসদের উপর ও কৃষক প্রজাদের উপর জমিদারদের প্রভাব ছিল অপরিসীম। সে জোর করে যে কোন আঠার বছরের পুরুষ ও চৌদ্দ বছরের মেয়েকে বিবাহ করতে বাধ্য করতে পারত। বিবাহের পাত্র ও পাত্রী নির্বাচনের বেলায়ও জমিদারদের হুকুম চলত। বিধবা নারী বা বিপত্নীক পুরুষদের বেলায়ও জমিদার তার ইচ্ছামত হুকুম দিতে পারত। 'জাস প্রাইমা নক্‌টিস' (Jus Primae Noctis) বা 'প্রথম রাত্রির অধিকার' বা বিবাহের প্রথম রাত্রিতে কনের সঙ্গে বাস করবার অধিকারও ছিল জমিদারদের. অবশ্য তারা ইচ্ছা করলে কিছু মূল্য নিয়ে সে অধিকার ছেড়ে দিতে পারত।*

গোলামদের মধ্যে বিবাহ হলে জমিদারদের স্বার্থই সিদ্ধ হত। কারণ গোলাম মা বাপের সন্তানরাও একই গোলামীর শৃংখল পরে জন্মাত, ফলে জমিদারদের জন্য খাটবার গোলামের সংখ্যা যত বাড়ত, ততই সেই অনুপাতে জমিদারদের আয়ও বেড়ে যেত। এই কারণেই পরজগতের ও ইহজগতের প্রভুরা তাদের জমিদারীর মধ্যে বিয়ে টিয়ে পছন্দ করত। গীর্জার কর্তারা অনেক সময় অন্য পন্থা নিত, বিশেষ করে যে সব ক্ষেত্রে বিবাহ ঠেকিয়ে দিলে গীর্জার হাতে সম্পত্তি এসে যেত, সে সব ক্ষেত্রে তারা তাই করত। বিশেষতঃ যে সমস্ত নিচের তলার স্বাধীন মানুষরা, যাদের অবস্থা বিশেষ কোনো পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে—যা কিনা এখানে আলোচনা করা যায় না—এমন হয়ে পড়ত যে তারা তাদের নিজেদের সম্পত্তি আগলে রেখে স্বাধীনভাবে আর থাকতে পারছে না, তারাই তাড়াতাড়ি ধর্মোপদেশের ও কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে তাদের যথাসর্বস্ব গীর্জাকে দিয়ে মঠের চার দেওয়ালের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে শান্তির অন্বেষণ করত। আরো কিছু ভূসম্পত্তির মালিক, যাদের বড় বড় জমিদারদের খপ্পর থেকে

* তারপর বলা হয়েছে যে, এ অধিকার কখনই ছিল না। কিন্তু আমার মনে হয় যে, সে কথার কোনো ভিত্তি নেই। এটা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এ অধিকার বিষয়ে কোনো লিখিত আইন ছিল না; তবে একে অপরের নির্ভরশীল থাকার দরুনই স্বাভাবিক ভাবেই এ অধিকার এসে যায়, তার জন্য কোনো লিখিত আইন কানুনের প্রয়োজন হয় না। ক্রীতদাসী যদি তার প্রভুকে খুসী করতে পারত, তবে প্রভু সে ক্রীতদাসীকে ভোগ করত, নইলে ছেড়ে দিত। হাঙ্গেরী, ট্র্যানসিলভেনিয়া, দানিউব অঞ্চলেও এমন কোনো লিখিত আইন ছিল না, কিন্তু সে সব জায়গার কথা যাঁরা জানেন তাঁরা একথাও জানেন সেখানকার নারীদের সঙ্গে আর ভূস্বামীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। এ সব জিনিস যে চলত তা অস্বীকার করা যায় না।

নিজেদের রক্ষা করার মতো শক্তি ছিল না, তারা কিছু কিছু মূল্য ও উপকারের বিনিময়ে গীর্জায় আশ্রয় নিত। কিন্তু এর ফলে আবার দেখা গেছে যে, যে অদৃষ্টকে এড়িয়ে যাবার জন্য পূর্বপুরুষরা চেষ্টা করেছে, সেই অদৃষ্টের খপ্পরেই আবার তাদের বংশধররা অনেক সময় পড়েছে। তারা গীর্জার উপর নির্ভরশীল বা তার অধীন হয়ে পড়েছে, অথবা যে মঠের প্রতি তারা আকৃষ্ট হয়েছে সেই মঠই তাদের বিষয় সম্পত্তি আত্মসাৎ করেছে।

মধ্যযুগে যখন শহরগুলির উন্নতি হতে থাকে, তার প্রথম শতাব্দীগুলিতে তখন সেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য, বসতি স্থাপন ও বিবাহের ব্যাপারে খুব উৎসাহ দেওয়া হত। সুযোগ সুবিধা দেওয়া হত। কিন্তু সে অবস্থা বেশি দিন রইল না। যখনই শহরগুলি শক্তিশালী হয়ে উঠল, আর সুশিক্ষিত সংগঠিত কারিগর শ্রেণী দাঁড়িয়ে গেল, তখনই নবাগতদের অবাঞ্ছিত প্রতিযোগী মনে করে তাদের প্রতি বিরূপ মনোভাব দেখানো শুরু হল। বুর্জোয়াদের গুরুত্ব বাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই বাইরে থেকে আসা নবাগতদের প্রতি বাধা নানাভাবে বাড়তে লাগল। বসতি স্থাপন করবার জন্য মোটা রকমের ট্যাক্স, খাজনা বহুল, মালিকানা পরীক্ষা, প্রত্যেকটা ব্যবসার অধিকার কিছু সংখ্যক মালিক ও দিন মজুরদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার দরুন হাজার হাজার মানুষকে পরাধীন হয়ে থাকতে বাধ্য করা হল, তাদের মধ্যে বিবাহ ছাড়াই উচ্ছৃংখল যৌন সম্বন্ধ চলতে থাকল, আর তাদের জীবন হল ভবঘুরে ছন্নছাড়ার মতো।

শহরগুলির উন্নতির যুগ যখন শেষ হয়ে গেল, তাদের পতন শুরু হল, যখন দেখা গেল যে, সে যুগের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে আগের চেয়ে অনেক বেশি কড়াকড়িভাবে বসতি স্থাপন ও স্বাধীনতাকে বাধা দেওয়া হয়েছে অন্যান্য পরিস্থিতিও তেমনিই হতাশাজনক দেখা গেল।

যুগের পর যুগ ধরে ভূ-স্বামী জমিদারদের অত্যাচার এতই বেড়ে চলল যে তাদের প্রজাদের মধ্যে অনেকেই তাদের সেই পশুর মতো দুঃসহ জীবনের চেয়ে পথের ভিখারী বা দস্যু ডাকাতের জীবনই বেছে নিল। আর তখনকার দিনে বিশাল বিশাল বনভূমি থাকায় এবং যানবাহনের ভাল ব্যবস্থা না থাকায় রাহাজানি দস্যুদের পক্ষে সুবিধা ছিল। অথবা তারা অনেকে অনেক উচ্চ মূল্যের আশায় ভাড়াটে সৈনিকের দলে চলে গেল। এ রকম বহুসংখ্যক নিঃসম্বল বাউণ্ডুলে নারীপুরুষ সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে পড়ল। সর্বব্যাপী দুর্নীতি ছড়াবার কাজে গীর্জাগুলোও কিছু পেছিয়ে ছিল না। গীর্জার ধর্মযাজকরা যে অবিবাহিত থাকত সেও একটা বড় কারণ ছিল যা থেকে যৌন উচ্ছৃংখলতা বেড়ে যেত, ইটালী ও রোমের সঙ্গে একটানা যোগাযোগ থাকার জন্য তা আরো বেড়ে যেত।

রোম যে শুধু খ্রীষ্টধর্মের ও পোপের শাসনের কেন্দ্রস্থল ছিল তাই নয়, রোম ছিল নব ব্যাবিলন, সমগ্র ইউরোপের দুর্নীতির শিক্ষায়তন বিশেষ, আর পোপদের বাসস্থানগুলো ছিল সেই দুর্নীতির প্রধান প্রধান স্থল। রোম সাম্রাজ্য তার পতনের সময় খ্রীষ্টান ইউরোপকে তার গুণের চেয়ে দোষই বেশী দিয়েছিল, আর ইটালী ছিল সেই দুর্নীতিগুলির পীঠস্থান, সেখান থেকেই তা জার্মানীতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভ্রমণকারী যাজকদের মারফৎ প্রবেশ করে। অসংখ্য সুস্থ সবল পুরুষ ধর্মযাজক ছিল, অলস বিলাসবহুল জীবন যাপন করত বলে তাদের যৌন কামনা তীব্রতম হয়ে উঠত। কিন্তু তাদের জবরদস্তি করে চিরকুমার রাখা হত। তাই তারা বাধ্য হয়ে বিবাহ বন্ধনের বাইরে বা অস্বাভাবিক উপায়ে তাদের যৌন কামনা চরিতার্থ করত। সমাজের বিভিন্ন স্তরে, গ্রামে শহরে নারীদের মধ্যে তারা ব্যাভিচার ছড়াতো। পুরুষ ও নারীদের মঠের চার দেওয়ালের মধ্যেকার জীবনে বেশ্যালয়গুলোর থেকেও কামুকতা ব্যাভিচার বেশী ছিল, সেখানে তারা বেশ সহজেই নানা অপরাধ করে যেতে পারত, বিশেষতঃ শিশুহত্যার অপরাধ করত, আর তা সেখানকার বিচারকরা বেশ গোপন করে ফেলত, কারণ তারা নিজেরাই ছিল সে ব্যাভিচারের মাথা। কৃষকরা চেষ্টা করত যাজকদের প্রলোভন থেকে তাদের স্ত্রী কন্যাদের রক্ষা করতে। তাই তারা বলত যে, যে ধর্মযাজকের রক্ষিতা নেই তাকে ধর্মযাজক হিসাবে গ্রহণ করবে না। তার জন্যই কনস্টান্স-এর এক বিশপ নিয়ম করে দিলেন যে তাঁর এলাকার মধ্যে রক্ষিতা রাখার জন্য ট্যাক্স দিতে হবে। এর থেকেই বোঝা যায় যে, যে মধ্যযুগের ধর্মনীতি নিয়ে দুর্বল চরিত্রের রোমান্টিক লোকেরা বড়াই করে থাকে, তখনো কেন ১৪১৪ সালে কনস্ট্যানস্-এর কাউন্সিলের (Council of Constance) সামনে অন্ততঃ ১৫০০ নারীকে হাজির করা গিয়েছিল, যাদের বিয়ে-থা' হয়নি বা যারা ঘুরে ঘুরে বেড়াতো।

বিয়ে-থা' করে সংসারে স্থিতি হবার পথে অনেক রকম বাধা তো ছিলই, তদুপরি মেয়েদের অবস্থা আরো খারাপ ছিল এই কারণেই যে, সে সময় পুরুষদের চেয়ে নারীদের সংখ্যাই ছিল অনেক বেশী। পুরুষদের সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণ, তারা যুদ্ধবিগ্রহে যেত, ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য বাইরে যেত, কখনো বা অত্যধিক সুরাপান ও অতিভোজন করত বলে তাদের জীবন হানি হত, বিশেষতঃ সমগ্র মধ্যযুগব্যাপী একটানা মহামারীর সময়ও তো এইভাবে পুরুষদের ক্ষেত্রে বেশি জীবন হানি হত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ১৩৩৬ থেকে ১৪০০ সালের মধ্যে ৩২ বছর, ১৪০৩ থেকে ১৫০০ সাল পর্যন্ত ৪২ বছর এবং ১৫০০ সাল থেকে ১৬০০ সাল পর্যন্ত ৩০ বছর* প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে বলে লিখিত আছে।

*** Dr Karl Bucher : Die Frauenfrege im Mittelalter. Tubingen (The Women's Questions in the Midde Ages)**

নারীরা দলে দলে বহুরূপী, গায়ক, বাদ্যকার হয়ে পাণ্ডিতদের ও যাজকদের সঙ্গে সঙ্গে নানা জায়গায়, যেখানে মেলা বা উৎসব উপলক্ষ্যে লোকজন জড় হত, সেই সব জায়গা ছেয়ে ফেলত। সৈন্যবাহিনীর মধ্যে তারা একটি একটি আলাদা দল হিসাবে থাকত, তাদের নিজেদের আলাদা ডাক্তার থাকত। মেয়েদের রূপ এবং বয়স অনুসারে তাদের সৈন্যদলের বিভিন্ন স্তরে নিয়োগ করা হত এবং নিজেদের গণ্ডির বাইরে কোনো নারী পতিতাবৃত্তি করলে তাকে গুরুতর সাজা দেওয়া হত। শিবিরের মধ্যে নারীরা পুরুষ সৈন্যদের সাহায্য করত খড় কাঠকুটো জোগাড় করত, নালা গর্ত সব ভরাত, তাঁবু পরিষ্কার করত। শত্রুদের অবরোধ করবার সময় তারা পরিখাগুলো ডালপালা, ঝোপঝাড় কেটে এনে ভরে দিত, যাতে আক্রমণ করতে সুবিধা হয়, তারা কামানগুলোকে ঠিক জায়গায় বসাতে সৈন্যদের সাহায্য করত। কামানের চাকা কাদায় ডুবে গেলে টেনে তুলত।

দুস্থ নারীদের অবস্থার উন্নতি করার জন্য বহু শহরে পৌরপ্রশাসনের মধ্যেই তথাকথিত 'বেটিনা প্রতিষ্ঠান' (ঈশ্বরের আলয়) থাকত সেখানে তারা আশ্রয় পেত এবং ভদ্রজীবন যাপন করতে পারত। কিন্তু এই আশ্রয়গুলি বা নারীদের মঠগুলি সমস্ত দুঃস্থ নারীদের আশ্রয় দিতে পারত না।

মধ্যযুগের একটা বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যবসার কাজ চালাতে হলেও তার একটা নির্দিষ্ট নিয়মকানুন ছিল। সেই অনুসারে বেশ্যাবৃত্তির জন্যেও সংগঠন থাকত। সমস্ত শহরেই পতিতালয়গুলো ছিল পৌরসভা, সরকার বা গীর্জার অধীনে। সেই অনুসারে পতিতালয়গুলির রোজগারও যেত সেই মালিকদের ভাণ্ডারে। পতিতালয়গুলির নারীরা তাদের নিজেদের প্রধান বা মোড়ল নির্বাচিত করে নিত। তার কাজ হত সেখানকার নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষা করা, এবং সে খুবই সতর্কতার সঙ্গে দেখতে চেষ্টা করত যাতে বাইরে থেকে কোনো প্রতিযোগী এসে তাদের ব্যবসা নষ্ট করে না দিতে পারে। সে রকম কোনো প্রতিযোগী যদি ধরা পড়ত তবে তার কঠোর সাজা হত, এবং কখনো কখনো তার উপর খুব বর্বরভাবে নির্যাতন করা হত। পতিতালয়গুলির জন্য বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল। প্রতিবেশীদের কোনো অসুবিধার সৃষ্টি করলে দ্বিগুণ কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। এক সংগঠনের সভ্যরা অন্য পৌরসভার সভ্যদের আনন্দ উৎসবে শোভাযাত্রা করে যেতে পারত, এবং অনেক সময়ই তারা কাউন্সিলারদের বা রাজপুত্রদের টেবিলে আমন্ত্রিত অতিথি হয়ে গিয়েও বসত।

অপরপক্ষে, বিশেষতঃ মধ্যযুগের প্রথম দিকে, পতিতাদের উপর ভীষণ অত্যাচারও চলত। আর যে পুরুষদের ব্যাভিচার ও অর্থ নারীদের পতিতাবৃত্তি করাত, সেই পুরুষরাই আবার পতিতাদের দণ্ড দেবার জন্য প্ররোচনার সৃষ্টি করত। যখন আমরা শুনতে পাই যে, যে চার্লস দি গ্রেট, "সর্বশ্রেষ্ঠ খ্রীস্টান"

রাজা এবং সম্রাটের নিজের যখন এককালে অন্ততঃ ছ'টা স্ত্রী ছিল, তখন তিনি একজন পতিতাকে এই শাস্তি দিলেন যে তাকে বাজারের মধ্যে উলঙ্গ করে টেনে এনে ডাণ্ডা দিয়ে প্রহার করা হত, তখন আর আমাদের বলার কি থাকে। যে সব লোকের দল আনুষ্ঠানিকভাবে পতিতাবৃত্তি সংগঠিত করেছে, তাকে রক্ষা করেছে, প্রেমের পূজারিণী বলে তাদের সর্বরকমের সুযোগ সুবিধা করে দিয়েছে, তারাই আবার কোনো নারীর প্রলোভনে পড়লে, পরিত্যক্ত হলে তার প্রতি সবচেয়ে কঠোর, নিষ্ঠুর সাজার ব্যবস্থা করেছে। কোনো নারী হতাশ হয়ে গিয়ে তার সদ্যজাত শিশুকে হত্যা করলে আইন মতেই তাকে অত্যন্ত বর্বরভাবে হত্যা করা হত। কিন্তু যে বেপরোয়া পুরুষটি তাকে সেই প্রলোভনের পথে টেনে আনত তার সম্বন্ধে কেউ কোনো প্রশ্নই করত না। বোধহয় সে নিজেই বিচারকের আসনে বসে সেই দুঃখিনী নারীটির প্রতি শাস্তি বিধান করত। আজও আমাদের মধ্যে এমন ঘটনা ঘটছে।*

উয়ার্জবার্গ (Wurzburg)-এর বেশ্যালয়গুলোর মালিকরা ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে শপথ নিত "শহরের প্রতি বিশ্বস্ত ও বন্ধুত্বপূর্ণ থাকবার এবং নারীদের সংগ্রহ করবার" জন্য। নার্নবার্গ, অলম, লিপজীগ, কলন ও ফ্রাংকফুর্ট (Nurnberg, Ulm, Leipzig, Koln, Frankfurt) এবং অন্যান্য জায়গায়ও এই ধরনের শপথ নিতে দেখা গেছে। ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দের অলম-এ পতিতালয়গুলি তুলে দেওয়া হল, ১৫৫১ খ্রীষ্টাব্দে গীল্ডগুলি আবার "বৃহত্তর ক্ষতি ঠেকাবার জন্য" পতিতালয়গুলিকে আবার চালু করবার জন্য আবেদন করল। উচ্চপদস্থ অতিথিদের জন্য পৌরসভার খরচায় বেশ্যাদের সরবরাহ করা হত। ১৪৫২ খ্রীষ্টাব্দে যখন রাজা লেডিস্লস (King Ladislaus) ভিয়েনায় প্রবেশ করল তখন তাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য পৌরসভার পতিতাদের এক প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছিল। অতি ফিনফিনে কাপড়ের নিচে তাদের উলঙ্গ শরীরের শোভা জাহির করছিল। সম্রাট দ্বিতীয় চার্লস যখন বর্জেস (Burges) প্রবেশ করল তখন তাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল সম্পূর্ণ উলঙ্গ নারীদের একটি প্রতিনিধি দল। এ রকম ঘটনা কিছু অস্বাভাবিকও ছিল না, আবার কেউ তাকে কোনো অসভ্যতাও মনে করত না।

অলীক কল্পনা বিলাসীরা আর হিসেবী ব্যক্তিরা এই সময়টাকে এক নৈতিকতা

* লেওঁ রিশার (Leon Richer) তাঁর "La Femme Libre"-এ এমন একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন যে প্যারিসের একটি দাসী তার শিশুসন্তানকে হত্যা করার অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত হয়। আর সেই সাজা দেয় ঐ শিশুটির পিতা নিজেই, যে ছিল কিনা একজন পুণ্যবান নামকরা আইনজ্ঞ। সে নিজেই আদালতে জুরীর কাজ করেছিল। আরও জঘন্য ব্যাপার, ঐ আইনজ্ঞ নিজেই ছিল হত্যাকারী, আর সেই সাহসী মেয়েটি ছিল সম্পূর্ণ নির্দোষ, এবং পরে সে বাধ্য হয়ে সব কথা স্বীকার করেছিল।

ও নারীদের প্রতি আন্তরিক ভক্তিশ্রদ্ধার যুগ হিসেবে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। বিশেষতঃ ১২শ খ্রীষ্টাব্দের শেষ থেকে ১৪শ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জার্মানীর মিনি-সিঙ্গার (Minnesingers) এর সময়টাকে তার একটা উদাহরণ বলে তুলে ধরা হয়। স্পেন ও সিসিলির 'মুর'দের অনুকরণে ফরাসী, ইটালিয়ান এবং জার্মান নাইটদের "প্রেমের পুজাকে" ("Service of Love") তখনকার দিনে নারীদের প্রতি উচ্চসম্মান প্রদর্শনের প্রমাণ হিসেবে ধরা হত। এর জবাব দিতে হলে পাঠকদের কতগুলি জিনিস মনে করিয়ে দেওয়া দরকার ; প্রথমতঃ নাইটরা এবং 'লেডিজ' বা অভিজাত মহিলারা ছিল সমগ্র জনসংখ্যার খুব সামান্য শতাংশ। দ্বিতীয়তঃ খুব অল্প সংখ্যক নাইটই "প্রেমের পুজা"র ব্যাপারে থাকত। তৃতীয়তঃ এই 'প্রেমের পুজা'র ব্যাপারটার আসল বিষয়টা অতিরঞ্জিত করে বলা হয়েছে। ভুল বোঝানো হয়েছে বা ইচ্ছা করেই ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যে সময় এ ব্যাপারটা খুব বেশী দেখা গেছে ঠিক সেই সময়ই 'নিগুল' বা আইনের বিচার ছাড়াই হত্যা করার নীতি চরম আকারে দেখা গিয়েছিল, আইন শৃংখলা সবই খুব শিথিল হয়ে গিয়েছিল, আর দস্যু, ডাকাত, রাহাজানীকারীরাই হোমড়া-চোমড়া ব্যক্তির পদে বসত। এই রকম একটা সময়ে, যখন সবচেয়ে জঘন্য নৃশংস অত্যাচার চলত, তখন মানুষের মধ্যে সুন্দর অনুভূতি এবং কাব্যপ্রেরণা আসতে পারে না। অপর পক্ষে, গোড়ার দিকে মেয়েদের যেটুকু মান সম্মান ছিল, এই সময়ে তা একেবারেই নষ্ট হয়ে যায়। গ্রামের এবং শহরের হোমড়া-চোমড়া বা অভিজাতরাই ছিল সবচেয়ে উচ্ছৃংখল ব্যাভিচারী, আর তাদের প্রধান কাজই ছিল বিবাদ বিসম্বাদ করা, মদ্যপান করা আর অবাধ যৌন কামনা চরিতার্থ করা। ১৩শ এবং ১৪শ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গ্রামে এবং শহরে এই অভিজাত ব্যক্তিরাই যখন ছিল সর্বেসর্বা শাসকগোষ্ঠী, তখনকার ইতিহাসে দেখা যাবে তাদের দ্বারা নারী-ধর্ষণ, বলাৎকার-এর কাহিনীতে ভরা। আর যারা এই জঘন্য অত্যাচারের শিকার হয়েছে, তাদের এর প্রতিকার করবার কোনো ক্ষমতা ছিল না। শহরে ম্যাজিস্ট্রেটের আসনে সেই অভিজাত ব্যক্তিরাই বসত। আর গ্রামে অপরাধ বিচার করবার সব ক্ষমতাই থাকত সেখানকার জমিদার, ধর্মযাজকদের হাতে। যে অভিজাত সম্প্রদায় এ রকম অত্যাচার দুর্নীতির মধ্যে ডুবে থাকত, তাদের পক্ষে তাদের কন্যাদের কোনো রকম সম্মান করা বা তাদের কোনো রকম উচ্চ আসনে বসানো অসম্ভব ছিল।

কিন্তু তবুও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে অল্প কিছু লোক ছিল যারা আন্তরিকভাবেই রমণীর সৌন্দর্য মহিমার প্রশংসা করত। কিন্তু তারা নিজেরাই ভাল করে জানত না তারা কি বলছে। তাদের উপর, যেমন আলরিচ ভন লিচটেনস্টেন (Ulrich von Lichtenstein) এর উপর, খ্রীষ্টান রহস্যবাদ ও

কঠোর আত্মসংযমের সঙ্গে যৌন কামনার ব্যাপারটা এমন একটা অদ্ভুতভাবে জড়ানো থাকত, যে তাদের ব্যাপারটা কিছুটা ছিল স্বাভাবিক আর কিছুটা ছিল কৃত্রিম। অন্য যাদের আরো উঁচুদরের মনে হত, তাদের একটা বিশেষ লক্ষ্য ছিল। যাই হোক, এই প্রেমের পূজো ব্যাপারটা ছিল আসলে বিবাহিত স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য প্রেমিকাকে দেবীর আসনে বসানো, ঐ খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে যে 'হেতেরে প্রথা' বা রক্ষিতা রাখবার প্রথা চালু করা হয়েছে তাই। ঠিক এই জিনিসই পেরিকলস (Pericles) এর সময়ে ঘটেছে বলে আগেই বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে পরস্পরের স্ত্রীদের প্রলুব্ধ করাটা মহাযুদ্ধের 'নাইট' বা অভিজাতদের মধ্যেই একটা রীতি হিসেবে খুবই প্রচলিত ছিল, আর আজকের দিনে আমাদের বুর্জোয়াদের অনেকের মধ্যেও এ জিনিস চলছে।

এই গেল মধ্যযুগের আদর্শবাদীদের কথা, আর নারীজাতির প্রতি তাদের ভক্তিশ্রদ্ধার কথা।

একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে মধ্যযুগে মানুষের যৌনকামনা চরিতার্থ করবার যেরকম সুযোগ সুবিধা দেওয়া হত তার থেকে এটা বেশ বোঝা যায় যে সুস্থ সবল মানুষদের মধ্যে যে স্বাভাবিক প্রবণতা তার তৃপ্তি লাভ করবার যে মানুষের অধিকার আছে তা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। আর এ হল খ্রীষ্ট-ধর্মের কৃচ্ছ্রসাধনার আদর্শের উপর মানুষের সহজ সরল স্বাভাবিক ধর্মেরই জয়। অপরপক্ষে একথাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে যৌনকামনা চরিতার্থ করবার যে সুযোগ সুবিধা বা উৎসাহ দেওয়া হত তা শুধু এক পক্ষেই, অর্থাৎ পুরুষদের বেলায়ই চলত। আর নারীদের বেলায় ধরে নেওয়া হত তাদের যেন ঐ রকম কোনো স্বাভাবিক প্রবণতা থাকতেও পারে না, থাকবার অধিকারও নাই, আর নারীদের উপর নৈতিক রীতিনীতি বিষয়ে পুরুষরা যে সব কড়াকড়ি নিয়ম চাপিয়েছিল, তার বিন্দুমাত্র এদিক ওদিক হলে তাদের কঠোরভাবে শাস্তি দেওয়া হত। দীর্ঘকাল ধরে এই নিপীড়ন, এবং তারই অনুকূলে প্রচলিত শিক্ষাদীক্ষার দরুন নারীরাও তাদের প্রভু পুরুষদের একতরফা রীতিনীতিতে এমনই অভ্যস্ত হয়ে উঠল যে তারাও নিজেদের এই হীন অবস্থাটাকেই সঠিক ও স্বাভাবিক বলে ধরে নিতে লাগল।

লক্ষ লক্ষ দাসদের মধ্যেও কি এই ধারণা ছিল না যে তাদের পক্ষে দাস জীবনটাই সঠিক এবং স্বাভাবিক? আর তাদের মালিকদের মধ্য থেকেই অনেকে যদি তাদের মুক্তির কাজে এগিয়ে না আসত তবে কি তারা মুক্ত হতে পারত? ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দের পর 'স্টেইন আইন' দ্বারা প্রুশিয়ার ভূমিদাসদের মুক্তি দেওয়া হল। তখন কি প্রুশিয়ার কৃষকরা মুক্তি চায় না বলে দরখাস্ত করেনি, "কারণ অসুস্থ ও বৃদ্ধ অবস্থায় তাদের কে দেখবে?"

আর আজকালকার শ্রমিক আন্দোলনও কি সেই একই জিনিস প্রমাণ করে না? বহু সংখ্যক শ্রমিকই কি তাদের শোষক মালিকদের সঙ্গেই চলছে না? কেউ না কেউ এগিয়ে এসে শোষিত মানুষদের জাগরিত ও উদ্বুদ্ধ করতে হয়। নিজে থেকে এগিয়ে এসে উদ্যোগ গ্রহণ করবার তাদের ক্ষমতা নেই, সুযোগও নেই। দাসপ্রথা, মধ্যযুগীয় ভূমিদাস প্রথার বিরুদ্ধে লড়াই-এর বেলায়ও তাই দেখা গেছে, সর্বহারার আন্দোলনের বেলায়ও তাই দেখা গেছে, আর নারীমুক্তির সংগ্রামের বেলায়ও ঠিক তাই দেখা যায়। এমনকি আধুনিক বুর্জোয়া প্রতি-যোগিতার মধ্যে, যখন আগের তুলনায় নারীরা অনেক সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকে, তখনও অভিজাত ব্যক্তিরা ও ধর্মযাজকরা সর্বপ্রথম সেজন্য চেষ্টা করেছিলেন।

মধ্যযুগের সময়ে অনেক দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও একথা সত্যি যে তখন মানুষের মধ্যে একটা সুস্থ যৌনকামনা ছিল, যাকে খ্রীষ্টধর্ম চাপা দিয়ে রাখতে পারেনি। তার মধ্যে ছিল না শঠতা, লজ্জা এবং এখনকার মতো গোপন ব্যাভিচার, আর এরকম সত্য কথা বলতে ভয়, আর স্বাভাবিক জিনিসকে স্বাভাবিক বলে স্বীকার করতেও ভয়। তারা আমাদের মতো এমন দ্ব্যর্থবোধক ভাষাও জানত না, আমরা যেমন করে সহজ সরল জিনিসকে রেখে ঢেকে চলতে গিয়ে দ্বিগুণ ক্ষতিকর করে তুলি, যেমন গোলমেলে কথাবার্তার মধ্যে মানুষের ঔৎসুক্য জাগানো হয় কিন্তু তার জবাব দেওয়া হয় না, সে সব তখন ছিল না। এখনকার সমাজে যেভাবে আলাপ আলোচনা করা হয়, যে ভাষায় উপন্যাস লেখা হয় বা অভিনয় করা হয় তা সবই দ্ব্যর্থবোধক।

তার কারণও পরিষ্কার বোঝা যায়। এই আধ্যাত্মিকতা কোনো অলৌকিক আধ্যাত্মিকতা নয়, লম্পটের আধ্যাত্মিকতা, যা কিনা ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতার আড়ালে আশ্রয় নিয়ে থাকে—আজকের দিনে তাই হল সমাজের একটা মস্তবড় শক্তি।

মধ্যযুগের সুস্থ যৌনকামনার বিষয়টি লুথার খুব চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন। আমি এখানে একজন ধর্ম সংস্কারকের বিচার করতে বসিনি, তাকে একজন মানুষ হিসাবে দেখতে বলছি। মানবিকতার দিক থেকে দেখতে গেলে লুথারের দৃঢ় সরল প্রকৃতি স্পষ্ট দেখা যায়, যার জন্যই তিনি বাধ্য হয়েছিলেন তার প্রেম ও সম্ভোগের প্রয়োজনের কথা স্পষ্ট করে বলতে। রোমান ক্যাথলিক পুরোহিত হিসাবে তাঁর পূর্বেকার অবস্থা তাঁর চোখ খুলে দিয়েছিল, তিনি নিজের উপলব্ধির মধ্য দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন যে মঠাধ্যক্ষ/মঠাধ্যক্ষাদের

* Cf Mallock : "Romance of the Nineteenth Century." Rem of the transl.

জীবন যাপন হ'ল প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে। তার থেকেই তিনি মঠের পুরোহিত ও সন্ন্যাসীর জীবনের বিরুদ্ধে লড়াই করবার প্রেরণা পেয়েছিলেন। তাঁর কথা থেকে মানুষ বুঝতে পারে যে ধর্মের নামে প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাওয়াটা পাপ, আর কোনো নৈতিকতা ও শোভনতার দিক থেকেই রাষ্ট্র বা কোনো সামাজিক প্রতিষ্ঠান লক্ষ লক্ষ মানুষকে তাদের স্বাভাবিক বৃত্তির ক্ষেত্রে বাধা দিতে পারে না। লুথার বলেছেন ঃ "বিশেষ কোনো দৈব শক্তির অধিকারিণী ছাড়া সব নারীর জীবনেই পুরুষের প্রয়োজন থাকা স্বাভাবিক, যেমন স্বাভাবিক তাদের আহার নিদ্রা, তৃষ্ণার নিবৃত্তি বা অন্য যে কোনো শারীরিক প্রয়োজন মেটানো, আর পুরুষের জীবনেও নারীর প্রয়োজন তেমনিই স্বাভাবিক। তার কারণ আমাদের মধ্যে ক্ষুধা তৃষ্ণার নিবৃত্তির প্রবৃত্তির মতন সন্তানের জন্ম দেবার প্রবৃত্তিও স্বাভাবিকভাবেই রয়েছে। সেই অনুসারেই ঈশ্বর আমাদের শরীরের সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। যারা এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি রোধ করিতে চাইবে তারা প্রকৃতির ধর্মেরই বিরোধিতা করবে—আগুনকে পোড়াতে, জলকে ভেজাতে, মানুষকে আহার নিদ্রা তৃষ্ণার নিবৃত্তি করতে বাধা দেবে।"

লুথার মানুষের যৌনকামনা নিবৃত্ত করার ইচ্ছাকে প্রকৃতির নিয়ম মনে করে মঠগুলি তুলে দিয়ে, পুরোহিতদের চিরকুমার থাকার নিয়ম তুলে দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে তাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির পথ খুলে দিলেন, কিন্তু আরো অনেক লক্ষ মানুষ পূর্বেকার মতোই সে স্বাধীনতার সীমার বাইরে রয়ে গেল। এই সংস্কার বা রিফর্মেশনই হল গীর্জা, রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যযুগীয় সীমাবদ্ধতার বিরুদ্ধে বিত্তশালী নাগরিকদের প্রথম প্রতিবাদ। এই সব নাগরিকরা চেষ্টা করেছিল গোষ্ঠী, আদালত, বিচারবিভাগের আওতা থেকে, কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে মানুষের স্বাধীনতার জন্য, চেষ্টা করেছিলেন ধর্মযাজকদের বেহিসাবী ব্যয়বাহুল্য কমাতে, তাদের কর্মভারহীন পদগুলি তুলে দিতে, আর যারা অলস হয়ে বসে আছে তাদের কোনো উৎপাদনশীল কাজে লাগাতে। বিষয় সম্পত্তির উপর সমাজতান্ত্রিক মালিকানা ব্যবস্থার বদলে বুর্জোয়াদের ধরনের মালিকানা ব্যবস্থা ও বুর্জোয়া রীতি অনুসারে শিল্পগুলির উপর অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা চালু হল। বলা যায় যে ছোট ছোট গোষ্ঠীগত মালিকানার ধরন বদলে ব্যক্তিগত মালিকানার স্বাধীন প্রতিযোগিতা চালু হল।

এই সব নতুন উদ্যমের ক্ষেত্রে ধর্মের দিক থেকে লুথার ছিলেন একজন প্রতিনিধি। লুথার যখন বিবাহের স্বাধীনতা চেয়েছিলেন, তখন তিনি শুধু বুর্জোয়া বিবাহের স্বাধীনতাই চেয়েছিলেন। আর জার্মানীতে কয়েক বছর আগেই রেজেস্ট্রী করে বিবাহের স্বাধীনতা, অন্য দেশে গিয়ে বসবাস করবার এবং স্বাধীন ব্যবসার স্বাধীনতা চালু হয়ে গেছে। এর পর আমরা দেখতে পাব যে

সে সবের থেকে নারীদের কি উপকার হয়েছে। এখনকার মতো রিফরমেশনের সময় পরিস্থিতি এত চরমে পৌঁছায়নি। উপরোক্ত নিয়মকানুনের জন্য একদিক থেকে যেমন অনেকেই স্বাধীন বিবাহ করবার, বা স্বাধীনভাবে যৌনকামনা পরিতৃপ্ত করবার সুযোগ পেত, অন্যদিক থেকে আবার অনেককে কঠিন শাস্তিও পেতে হত। ক্যাথলিক পাদ্রী যৌন সম্পর্কের ব্যাপারে খুব উদার মনোভাব দেখাত। কিন্তু প্রটেস্টান্ট পাদ্রী নিজের ব্যবস্থা করে নিয়ে নরনারীর যৌন সম্পর্ককে অত্যন্ত ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করত। পতিতালয়গুলির বিরুদ্ধে তারা জেহাদ ঘোষণা করেছিল, শয়তানের বাসা বলে পতিতালয়গুলিকে বন্ধ করে দিয়েছিল। পতিতা নারীদের 'শয়তানের কন্যা' বলে নির্যাতন করা হত। এবং যাদের দোষী সাব্যস্ত করা হত, তাদের সর্বরকম অশুভ জিনিসের মূল বলে প্রকাশ্যে চরম অপমান করা হত।

মধ্যযুগের সেই দিলদরিয়া মানুষগুলো হয়ে গেল কেমন যেন মনমরা আড়ষ্ট —তাদের ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বপুরুষরা বেহিসাবী ভাবে প্রচুর খরচপত্র করে গেছে, আর এরা হল তাদেরই হিসেবী উত্তরাধিকারী, তাদের জীবনের পরিসর সঙ্কুচিত, কঠোর ন্যায়নীতির নিয়মতারাই হল সম্ভ্রান্ত নাগরিক।

মধ্যযুগের শেষভাগে আইনসম্মত বিবাহিতা স্ত্রীরা ছিল ক্যাথলিকদের যৌন স্বেচ্ছাচারের শত্রু। তারা প্রটেস্টান্টদের কট্টর মনোভাবে খুশী হল। সাধারণ-ভাবে নারীদের অবস্থা পূর্বের চেয়ে কিছুই উন্নতি হল না। আমেরিকা আবিষ্কারের পর ও ইস্ট ইন্ডিয়ার সমুদ্রপথগুলি আবিষ্কারের পর ব্যবসা বাণিজ্য, অর্থনীতি ও উৎপাদনের দিক থেকে যেসব পরিবর্তন এল তার প্রভাব জার্মানীতে সবচেয়ে বেশি দেখা গেল এবং সেখানে প্রবল সামাজিক প্রতিক্রিয়া দেখা গেল।

জার্মানী আর ইউরোপের ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল রইল না। স্পেন, পর্তুগাল, হল্যান্ড, ইংল্যান্ড পরের পর এগিয়ে চলল, এবং ইংল্যান্ড আজও পর্যন্ত তেমনি এগিয়ে চলেছে। জার্মানীর ব্যবসা বাণিজ্য পড়ে গেল। তারপর আবার রিফরমেশন-এর ফলে দেশের রাজনৈতিক ঐক্য নষ্ট হয়ে গেল। সেই অজুহাত দেখিয়ে জার্মান রাজকুমাররা সম্রাটের অধীনতা থেকে মুক্তি পেতে চাইল। আবার সঙ্গে সঙ্গে তারা অভিজাত শ্রেণীর উপর দখল রেখে দিতে চেষ্টা করল, এবং তার জন্য শহরগুলিকে রক্ষা করার জন্য সেখানে সর্বরকমের সুযোগ সুবিধা করে দিল। তখন একটা অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে পড়ে অনেক শহর স্বেচ্ছায় রাজপুত্রদের শাসনাধীনে আসতে লাগল। এ সবের ফল এই হল যে ব্যবসা বাণিজ্য পড়ে যেতে থাকায় ভীত সন্ত্রস্ত বুর্জোয়ারা প্রতিযোগিতা এড়াবার জন্য চতুর্দিকে আরো প্রতিবন্ধক তৈরি করতে লাগল। সমাজের অবস্থা অবনতির দিকে যেতে লাগল, আর লোকের দারিদ্র্য বাড়তে থাকল। 'রিফরমেশন'এর পর

জার্মানীর সর্বত্র যে ধর্ম নিয়ে লড়াই শুরু হল, যার মধ্যে প্রটেস্টান্ট ও ক্যাথলিক উভয় সম্প্রদায়ই প্রচণ্ড ধর্মান্ধতা ও অসহিষ্ণুতার সঙ্গে লেগে গেল, তাতে জার্মানীর সব উন্নতির পথ বন্ধ হয়ে গেল। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সর্বক্ষেত্রে জার্মানীর অক্ষমতা, দুর্বলতার ফলে এমন অবস্থা দেখা দিল যে কয়েক শতাব্দী অবধি জার্মানীর উন্নতির আর আশা রইল না।

মধ্যযুগে বহু রকম শহরে পুরুষদের সঙ্গে সমান অধিকারের মর্যাদায় নারীরাও ছিল। যেমন, ফ্রাঙ্কফুর্ট এবং সাইলেসিয়ান শহরে নারীরা পশম বিক্রি করত, মধ্য রাইন-এর শহরগুলিতে নারীরা রুটি তৈরীর কাজ করত, কলন এবং স্ট্র্যাসবার্গ শহরে নারীরা সৈন্যদের পোশাকে এমব্রয়ডারী করত, ঘোড়ার জিন তৈরি করত, ব্রেমেন শহরে নারীরা পশুর সাজপোশাক তৈরি করত, ফ্রাঙ্কফুর্টে নারীরা দর্জির কাজ করত, নামবার্গে চামড়ার কাজ করত। এবং কলন-এ নারীরা সেকরার কাজ করত, কিন্তু এখন তাদের সে সমস্ত কাজ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর সব সময়ই দেখা যায় যে সমাজের একটা অবস্থা শেষ হয়ে আসতে থাকলে তার রক্ষকরা এমন সব কাজ করতে থাকে যে তাতে ক্ষতিই হতে থাকে। জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার একটা আতঙ্ক মানুষকে পেয়ে বসল, আর বিবাহ ও স্বাধীন নাগরিক জীবনের উপর বাধা নিষেধ আরোপ করা হতে থাকল, যদিও নামবার্গ, আগসবার্গ, কলন-এর মতো উন্নত শহরগুলিতে ১৬শ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই জনসংখ্যা কমতে শুরু করেছিল, কারণ সেখানে ব্যবসা বাণিজ্য অন্যধারায় চলছিল ; যদিও 'ত্রিশ বছরের যুদ্ধে' জার্মানীর জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল, তবুও শহরে ও পৌর এলাকায় অবস্থার অবনতির জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির আতঙ্ক দেখা গিয়েছিল। কিন্তু তখনকার সর্বেসর্বা শাসকদের জনসংখ্যা কমাবার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল—যেমন ব্যর্থ হয়েছিল আগের কালের রোমান অধিবাসীদের মধ্যে বিবাহ করলে পুরস্কার দেবার আইন। চতুর্দশ লুই জনসংখ্যা ও সৈন্যদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য দশটি সন্তানের পিতামাতাদের জন্য পেনশনের ব্যবস্থা করলেন, বারোটি সন্তান হলে পেনসন আরো বেড়ে যেত। তাঁর জেনারেল, মার্শাল ভন সাশেন আরো এক কদম এগিয়ে গেলেন এবং প্রস্তাব করলেন যে কোনো বিবাহ বন্ধনই পাঁচ বছরের বেশি টিকতে দেওয়া উচিত নয়। ফ্রেডারিক দি গ্রেট তার পঞ্চাশ বছর পর লিখলেন ঃ "আমি মনে করি মানুষরা হল মহান প্রভুর উদ্যানে হরিণের দল ; তাদের একমাত্র কাজ হল সংখ্যাবৃদ্ধি করা ও উদ্যান ভরিয়ে দেওয়া"।* সে হল ১৭৪১ সালের কথা।

* Karl Kantsky: "Der Einffluss der Volksvermeharung auf den Frotschritt der Gesellschaft" (The Influence of increasing Population on the Progress of Society.) Vinna 1880

পরবর্তীকালে তার লড়াই আরো এগিয়ে সেই উদ্যান জনশূন্য করার কাজেই লেগেছিল।

এই সময়ই নারীদের অবস্থা ছিল যারপরনাই শোচনীয়। অসংখ্য নারীদের বেলায় দেখা গেল যে, তাদের এমন বিবাহিত জীবন হল না যাতে তাদের ভরণ-পোষণের উপায় হতে পারে, বা তাদের স্বাভাবিক যৌন কামনা পূর্ণ হতে পারে। জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে পুরুষদের নিজেদের মধ্যেই প্রতিযোগিতার ভয় ছিল, তারপর আবার উৎপাদনশীল কাজের অভাবের দরুন তারা নারীদের রোজগারের কাজ থেকে সরিয়ে দিল। নারীদের তখন শুধু শারীরিক পরিশ্রম বা খুব নিচু স্তরের কাজ নিয়েই থাকতে হল। কিন্তু মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে দমন করে রাখা যায় না এবং অনেক পুরুষও ঠিক ঐ অবস্থার মধ্যে পড়েছিল, তাই শত পুলিস পাহারা সত্ত্বেও নারী পুরুষের মধ্যে নিষিদ্ধ যৌন সম্পর্ক চলতে থাকল, আর দেখা গেল যে সেই সাদাসিধে খ্রীষ্টধর্মের আমলে সর্বেসর্বা শাসকদের আমলেই জারজ সন্তানের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি।

বিবাহিতা নারীদের থাকতে হত সবচেয়ে কঠোর নিয়মের মধ্যে। এত রকমের কাজ তাকে করতে হত যে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তাকে খাটতে হত, তাদের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মেয়েদেরও সমানে খাটতে হত। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারীদের ঘরকন্নার কাজ ছাড়াও আরো বহু রকমের কাজ করতে হত। সেই সব কাজ থেকেই তাদের মুক্তি দিয়েছে আধুনিক শিল্পের বিকাশ ও যানবাহনের প্রসার ; তারা সুতো কাটত, তাঁত বুনত, সুতো পরিষ্কার করতো, কাপড় তৈরি করত, সাবান তৈরি করত, মোমবাতি তৈরি করত এবং মদ চোলাই করত। তাছাড়াও তারা অনেক সময়ে ক্ষেত খামারে কাজ করত, এবং হাঁসমুরগী পালন ও পশুপালনের কাজও করত। এই রকম বহু রকমের কাজ নারীদের করতে হত এবং তাদের একমাত্র আমোদ ফুর্তির অবসর বলতে বোঝাত তাদের রবিবার গীর্জায় যাবার সময়টুকু। বিবাহের ব্যাপারটা সমাজের একই গোষ্ঠীর মধ্যে চলত। অত্যন্ত কট্টর বাজে জাতিভেদ প্রথা চালু ছিল। ঐ একই নীতিতে কন্যাদের শিক্ষা দেওয়া হত। তাদের বাইরের সংস্রব বর্জিত চার দেওয়ালের মধ্যে মানুষ করা হত। তাদের মানসিক বিকাশও হতে পারত না, তারা ঘরকন্নার জীবনের বাইরে কোনো উচ্চ চিন্তাই করতে পারত না। আর এই সবের উপরই এমন একটা অন্তঃসার শূন্য নিরর্থক 'ভদ্রসমাজের' আবরণ দিয়ে এক মানসিকতা ও সভ্যতাকৃষ্টির ভাবধারা চালু করা হল যে তার ফলে নারীরা শুধু একঘেয়ে ঘরকন্নার কাজের মধ্যে বদ্ধ হয়ে গেল।

এইভাবেই রিফর্মেশনের ভাবধারার অবনতি হতে থাকল আর একটা প্রচলিত ন্যায়নীতির কাঠামোর মধ্যেই পুরুষ তাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করবার চেষ্টা করতে থাকল।

অন্য সব কিছুর মধ্যে 'রিফর্মেশন' নারীদের সেইসব সুযোগ সুবিধাগুলি হরণ করে নিল, যেগুলি কিনা মধ্যযুগে—বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে ভোগ করে আসছিল। পশ্চিম ও দক্ষিণ জার্মানীতে, আলসাস ও অন্যান্য জায়গায় এরকম একটা প্রথা ছিল যে গ্রামাঞ্চলে নারীদের বছরের কয়েকটা দিনের জন্য ছুটি দেওয়া হত, তখন তারা ইচ্ছামত আমোদ আহ্লাদ করতে পারত, তখন কোনো পুরুষ তাদের উপর কোনো অত্যাচার করতে পারত না। সরল গ্রাম্য লোকেদের মধ্যে এই ধরনের প্রথা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে নারীদের দাসত্বটা তারা অবচেতন মনে অনুভব করত, আর বছরের মধ্যে অন্ততঃ কয়েকটা দিনের জন্যেও তাদের সে দাসত্বের কষ্ট ভুলতে দেওয়া হত।

এটাও জানা কথা যে মধ্যযুগে রোমান "স্যাটারনিলা" (SATURNALIA) এবং "ফ্যাসিং" (FASCHING) প্রথা ঐ একই উদ্দেশ্যে প্রচলিত করা হয়েছিল। রোমান "স্যাটারনিলা"র সময়ে প্রভুরা তাদের গোলামদের দু' দিনের জন্য ছেড়ে দিত, যখন তারা নিজেদেরই প্রভু মনে করতে পারত; এবং নিজেদের ইচ্ছামত থাকতে পারত। তারপরই আবার তাদের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হত গোলামির জোয়াল। রোমের পোপেরা সমস্ত চলতি প্রথাগুলির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিত, এবং ঠিক জানত কিভাবে সেগুলিকে নিজেদের কাজে লাগানো যায়। তাই তারা 'স্যাটারনিলা' প্রথাটিকেই নতুন 'ফ্যাসিং' নামে চালু রাখল। 'ফ্যাসিং'-এর সময়ে 'প্যাশন সপ্তাহ'-র আগে সমস্ত গোলাম ক্রীতদাসদের তিনদিনের জন্য ছেড়ে দেওয়া হত, তারা নিজেদেরই প্রভু মনে করতে পারত। তারা ঐ তিনদিন পর্যন্ত নিজেদের ইচ্ছামত পানাহার করতে পারত, আমোদ আহ্লাদ করতে পারত, সমাজের ও ধর্মের নিয়মগুলিকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে পারত। এমনকি ধর্ম-যাজকরা, নিজেরাও সেই হুল্লোড়ে যোগ দিত—স্বাধীনভাবে তখন তাদের মধ্যে এমন মাতামাতি চলত যে অন্য সময় হলে তার জন্য আইন ও ধর্মের অনুশাসন অনুযায়ী তাদের গুরুতর শাস্তি ভোগ করতে হত। আর কেনই বা হবে না? সমস্ত গোলামরা মাত্র কয়েকটা দিনের জন্য নিজেদের প্রভু মনে করে এমনি প্রচণ্ড উৎসবে মত্ত হয়ে সমস্ত শক্তি ক্ষয় করে ফেলত, এইটুকু স্বাধীনতা দেবার জন্য তারা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হয়ে থাকত এবং পরের বছর ঐ আনন্দটুকু পাবার আশায় আশায় আরো বেশি বশীভূত হয়ে থাকত।

নারীদের মধ্যে উৎসব অনুষ্ঠানের বেলায়ও ঐ একই জিনিস দেখা যায়, সেগুলি কোথা থেকে যে উৎপত্তি হয়েছিল তা জানা যায় না, কিন্তু যা একেবারে উন্মাদনার সৃষ্টি করে। 'রিফর্মেশন'-এর পরে যে গুরুগম্ভীর মনোভাব দেখা দিল তা ওসব জিনিসকে যেখানেই পারল দমন করে রাখল। অন্যান্য জায়গায় ঐসব প্রথাগুলি আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হল।

ব্যাপকভাবে কলকারখানার প্রসার, যন্ত্রপাতির আবিষ্কার, উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রয়োগ, ব্যবসাবাণিজ্যের উন্নতি—এইসব কারণে পুরাতন অচল সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি বাতিল হয়ে গেল। আগেকার অবস্থার পরিবর্তন হয়ে জার্মানীতে রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে উঠল। বিবাহ, ব্যবসা বাণিজ্য অন্য-দেশে গিয়ে বসবাস করা—এসবের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হল।*

এই উন্নতির জন্য কত শতাব্দী ধরে জার্মানীর বিভিন্ন লোকে লিখেছেন। অবশেষে একটা নতুন যুগ এল। নারী পুরুষ উভয়ের জন্যই নতুন যুগ। নারীরা নারী হিসাবে এবং সামাজিক ব্যক্তি হিসাবে একটা নতুন স্বীকৃতি পেল। অনেক নারী বিবাহ আইনের সুযোগ সুবিধা পেল। ব্যবসা বাণিজ্য ও অন্য-দেশে গিয়ে বসবাস করার আইনগত সুযোগ সুবিধা অনেকের সামনে শিল্পের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার সুযোগ খুলে দিল, খুলে দিল অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সুযোগ। আইনের চোখেও মানুষের মর্যাদার অনেক উন্নতি হল। তাহলে তারা কি তখন প্রকৃতই মুক্ত, স্বাধীন হয়ে গেল? তাদের জীবনের পূর্ণ বিকাশ কি সম্ভব হল? সম্ভব হল কি কার্যক্ষেত্রে তাদের স্বাভাবিক যোগ্য ভূমিকা পালন করা?

এ প্রশ্নের জবাব মিলবে পরবর্তী অধ্যায়ে।

---

* প্রতিক্রিয়াশীল পাণ্ডরা ভাবল যে এই সব বিধিব্যবস্থার দ্বারা সব শালীন্য ও নৈতিকতা একেবারে শেষ হয়ে গেল।

মেই-জের (Mainz) ভূতপূর্ব বিশপ কেটলার (Ketteler) ১৮৬৫ সালেই, এই নতুন আইন কার্যকরী হবার পূর্বেই, আফসোস করে বলেছিলেন যে 'বিবাহ সম্বন্ধে বর্তমান বিধিনিষেধগুলি তুলে দেওয়ার অর্থই দাঁড়ালো প্রকৃতপক্ষে বিবাহ বিচ্ছেদ, কারণ এখন সকলের পক্ষেই নিজের ইচ্ছামত বিবাহবন্ধন ছিন্ন করে দেওয়া সম্ভব হবে"। চমৎকার স্বীকারোক্তি। কারণ এতে দেখা গেল আমাদের বিবাহবন্ধন জিনিসটা কতদুর্বল, বাধ্যবাধকতা আছে বলেই তাহলে স্বামী স্ত্রীর যৌথ জীবন রয়েছে। আসলে বিবাহের সংখ্যাও বেড়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যাও বেড়েছে। আবার অপর পক্ষে নতুন যুগের বিরাট শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এমন সব ক্ষতিকর জিনিস দেখা দিচ্ছে যা আগে ছিল না। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে রক্ষনশীল ও উদার নৈতিক বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের মতের মিল দেখা যায়। এই গ্রন্থের শেষে আমি এই আতঙ্কের ব্যাপারটা কি এবং তার উৎসই বা কি সেই বিষয়ে বিশ্লেষণ করে দেখাব। অধ্যাপক এ. ওয়াগনার (Prof. A. Wagner) একজন এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির আতঙ্কের শিকার। এবং ফলে তিনি চান বিবাহের অধিকারকে সীমাবদ্ধ রাখতে, প্রধানতঃ শ্রমিক শ্রেণীর জন্য তিনি বলেন শ্রমজীবী লোকেরা খুব অল্প বয়সে বিয়ে করে, মধ্যবিত্তদের চেয়ে অল্প বয়সে। হতে পারে যে মধ্যবিত্তরাই প্রধানতঃ পতিতালয়ে গিয়ে থাকে; যদি শ্রমজীবিদের বিয়ে করতে মানা করা হয় তাদেরও বিকল্প পথে ঠেলে দেওয়া হবে। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের চুপচাপ থাকাই ভাল নৈতিকতা অধঃপাতে যাচ্ছে বলে চেঁচামেচি করে কাজ নেই। আর এতেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে নারীদেরও যখন পুরুষদের মতো স্বাভাবিক প্রবৃত্তি রয়েছে, তখন তারাও "অবৈধ সংসর্গের" মধ্য দিয়েই সে প্রবৃত্তির চরিতার্থ করতে চেষ্টা করবে।

বর্তমান যুগে নারীর অবস্থা

যৌন প্রেরণা, বিবাহের ক্ষেত্রে বাধাবিঘ্ন

এই বইয়ের গোড়াতে এমন মতামত প্রকাশ করা হয়েছিল যে নারীদের যৌন জীবনের কতগুলি বৈশিষ্ট্যের জন্যেই পুরুষদের কাছে অর্থনৈতিকভাবে তারা পরাধীন হয়েছিল।

অনেক বিজ্ঞলোক এর জবাবে বলবে যে প্রকৃতির নিয়ম, যাকে আমরা যৌন প্রেরণা বলে থাকি, তাকে জয় করাও যায়। যৌন কামনা যে চরিতার্থ করতেই হবে তার কোনো মানে নাই। সম্ভবত কোনো কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে এ কথা খাটে। কিন্তু সমগ্র জাতির ক্ষেত্রে সেকথা খাটে না। কারণ নরনারীর যৌন জীবনের উদ্দেশ্য সন্তানের জন্ম দেওয়া। সমাজের একটা অবস্থার পরিবর্তন কোনো একক ব্যক্তিদের আচরণ থেকে আসে না। সুতরাং সে জবাব খাটবে না। লুথার একেবারে গোড়ার কথা তুলে বলেছেন—যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে— ঃ "যারা এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে রোধ করতে চাইবে তারা প্রকৃতির ধর্মেরই বিরোধিতা করবে—আগুনকে পোড়াতে, জলকে ভেজাতে, মানুষকে আহার নিদ্রা তৃষ্ণার নিবৃত্তি করতে বাধা দেবে"। এই কথাগুলি আমাদের গীর্জার দরজার উপর খোদাই করে রাখা উচিত—যে গীর্জার থেকে কিনা মানুষের জৈব প্রবৃত্তিকে অস্বীকার করা হয়েছে। মানুষের প্রণয়াকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করবার প্রয়োজন যে কত বড় তা এর চেয়ে কোনো চিকিৎসক বা শরীর-বিজ্ঞানীরাও জোরের সঙ্গে বলতে পারেনি। মানুষের জীবনের সুস্থ সবল বিকাশের জন্য প্রত্যেকটি ব্যক্তিকেই তার নিজের প্রতি পবিত্র কর্তব্য হিসাবেই তার স্বাভাবিক বাসনা কামনাকে পরিতৃপ্ত করতে হবে। প্রকৃতির নিয়মকে তাদের মেনে চলতে হবে। আমাদের মানসিক বিকাশের দিকটা যেমন দেখতে হবে, শারীরিক বিকাশের দিকটাও তেমনি দেখতে হবে। মানসিক প্রক্রিয়ার মধ্যে মানুষের শারীরিক অবস্থাটা ফুটে বেরোয়। এ-দুটো জিনিস অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একের অনিষ্টে অপরের অনিষ্ট হয়ে থাকে। মানসিক প্রবৃত্তির চেয়ে জৈব প্রবৃত্তি কোনো অংশেই ছোট নয়। উভয় প্রবৃত্তিই ব্যক্তিমানবের সম্পূর্ণ অস্তিত্বের অংগ এবং একটি অন্যটির দ্বারা সর্বদাই প্রভাবিত হয়।

এর থেকেই বোঝা যায় যে মানসিক কার্যকলাপের বাস্তব ভিত্তি সম্বন্ধে যেমন জানা প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন যৌন সম্বন্ধীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধেও জানার। প্রত্যেকেরই বোঝা দরকার যে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং মানসিক প্রবৃত্তি

যা কিনা প্রত্যেক ব্যক্তিরই আছে, এবং তার অস্তিত্বের অংশ বিশেষ, এবং জীবনের কখনও কখনও সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করে সে সম্বন্ধে লোকের জানা দরকার, এবং তেমন জিনিস কখনই একটা রহস্যের বা লজ্জার বিষয় হতে পারে না। উপরন্তু নরনারী উভয়েরই অন্যান্য জ্ঞানের বিষয়ের মতো শরীরবিজ্ঞান ও যৌনতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন। শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলে আমরা অনেক বিষয়ই অন্য দৃষ্টি কোণ থেকে দেখতে পারতাম। তাহলে যেসব অবাঞ্ছিত বাস্তব অবস্থা আধুনিক সমাজের প্রত্যেক পরিবারের মধ্যেই দেখা যায় আমরা তার সামনা-সামনি মোকাবিলা করতে পারতাম। অন্য প্রত্যেকটি বিষয়েই জ্ঞান লাভ করাকে মানুষ ভাল মনে করে ও তার জন্য খুবই চেষ্টা করে কিন্তু শুধু যে জিনিসটি প্রতিটি ব্যক্তির চরিত্র ও স্বাস্থ্যের সংগে, এবং সমগ্র সমাজের ভিত্তির সংগে সবচেয়ে অংগাংগীভাবে জড়িয়ে আছে—সেই বিষয়টি ছাড়া।

কান্ট (KANT) বলেছেন "নরনারী উভয়ে মিলেই একটি সম্পূর্ণ সত্তা। একে অপরের পরিপূরক।" স্কপেনহর (Schopenhauer) জোরের সংগে বলেছেন: "যৌন প্রেরণাই হল মানুষের বাঁচবার আকাঙ্ক্ষার জন্য সবচেয়ে পরিপূর্ণ প্রেরণা—এখানেই মানুষের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা কেন্দ্রিভূত হয়েছে।" আরও বলেছেন: "মানুষের বাঁচবার আকাঙ্ক্ষার সবচেয়ে বড় প্রমাণ তার সন্তানের জন্ম দেবার বা বংশ বৃদ্ধি করার প্রেরণার মধ্যে"। মেনল্যান্ডারও (Mainlander) একই মত প্রকাশ করে বলেছেন: "যৌন প্রেরণা হল মানুষের অস্তিত্বের মাধ্যাকর্ষণ। সবকিছুর উপরে মানুষ নিজের জন্য ঠিক যে জীবনটি চায় তা এর থেকেই পায়…সন্তানের জন্ম দেওয়ার ব্যাপারে মানুষ সবচেয়ে আগ্রহী হয়ে থাকে এবং সচেষ্ট হয়।" তারও পূর্বে বুদ্ধ লিখেছিলেন: "মানুষের যৌনকামনা হাতিধরা ফাঁদের চেয়েও বেশি শক্তিশালী, অগ্নিশিখার চেয়েও বেশি উত্তপ্ত, এ হল সেই তীর যা কিনা মানুষের হৃদয়কে বিদ্ধ করে।"*

উপযুক্ত বয়সে যৌনকামনাকে দমন করে রাখলে মানুষের স্নায়ুর উপর এবং সমস্ত শরীরের উপরই তার যে প্রবল প্রতিক্রিয়া হয় এমন কি অনেকের মাথা খারাপ হয়ে যায় বা অনেকে আত্মহত্যাও করে তার থেকেই বোঝা যায় যৌন-প্রবৃত্তির শক্তি কতখানি। যৌনকামনা সফল সুষ্ঠুভাবে পরিতৃপ্ত করার উপর মানুষের আধ্যাত্মিক ও চরিত্রগত উন্নতি নির্ভর করে। যৌনকামনা পরিতৃপ্ত হলে ব্যক্তিজীবনের পূর্ণতা আসতে পারে। ক্লেনকে (Klencke) তাঁর "উইম্যান ইন দি পজিশন অফ ওয়াইফ" (Woman in the position of wife) গ্রন্থে লিখেছেন: "সভ্য সমাজে যৌনজীবনের রীতিনীতিগুলি যুক্তিদ্বারাই নিয়ন্ত্রিত

---

* Mainlandar : Philosophie der Erlosung' 2nd Vol. 12 Essays (Philosophy of Redemption.)

হয়ে থাকে। কিন্তু নরনারীর মধ্যে বংশ বিস্তার করার প্রবল আকাঙ্ক্ষাকে কেউই কোনোদিন দমন করে রাখতে পারে নাই। প্রকৃতির নিয়মেই তা চলে আসছে। স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে জোর করে দমন করে রাখলে শরীর ও মনের উপর তার নানা প্রকার বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে। প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ীই নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য আছে। সেই নিয়মের ব্যতিক্রমেই অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে চেহারায় এবং প্রকৃতিতে কোনো কোনো পুরুষ নারীদের মতো ও কোনো কোনো নারী পুরুষের মতো হয়ে উঠেছে। যৌন জীবনের বৈশিষ্ট্যের পূর্ণতা ছাড়া ব্যক্তি জীবনের পূর্ণতা বা তার অস্তিত্বের সম্পূর্ণতা হয় না।" ডাঃ এলিজাবেথ ব্ল্যাকওয়েল (Dr. Elizabeth Blackwell) তাঁর "দি মরাল এডুকেশন অব ইয়ং ইন রিলেশন টু সেক্স" (The Moral Education of Young in Relation to sex) গ্রন্থে লিখেছেন: "মানুষের যৌন কামনা তার জীবনে অপরিহার্যরূপে এবং সমাজের ভিত্তিরূপেই রয়েছে। এ হল মানুষের স্বভাবের সবচেয়ে বড় শক্তি। আর সবকিছু চলে গেলেও মানুষের যৌনপ্রবৃত্তি থেকে যাবে। অনেক সময় তার বিকাশ হয় না, বা আমরা সে বিষয় চিন্তাও করি না, কিন্তু এই প্রবৃত্তি মানুষের জীবনে কেন্দ্রীয় শক্তি হিসাবে থেকে যায়। এই অপরিহার্য প্রবৃত্তি আছে বলেই কখনই মনুষ্য সমাজের বিলোপ হতে পারে না।"

এইভাবেই আধুনিক দর্শনশাস্ত্রও বিজ্ঞানের সঠিক বক্তব্যের সঙ্গে ও লুথার-এর সাধারণ জ্ঞানের কথার সঙ্গে একমত হয়ে যায়। তার ফলে প্রত্যেকটি মানুষেরই তার যে প্রবৃত্তি তার নিজের সত্তারই অন্তর্গত, সেই প্রবৃত্তির তৃপ্তি সাধন করার অধিকার আছে এবং সে তার কর্তব্যও। যদি সামাজিক বিধিনিষেধ ও সংস্কার মানুষকে তাতে বাধা দেয় তবে মানুষের জীবনের বিকাশ প্রতিহত হয়। এইসব বিধিনিষেধ, সংস্কারের কুফল যে কতদূর হয়ে থাকে তা আমরা ডাক্তারদের কাছ থেকে, হাসপাতাল, পাগলা গারদ, জেলখানার হিসাব থেকেই জানতে পারি, আর কত হাজার হাজার পরিবার যে ভেঙে যাচ্ছে, তাদের সুখ-শান্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তা তো বলাই বাহুল্য।

কয়েকটি ঘটনা থেকেই বিষয়টি ভাল করে বোঝা যাবে। ডাঃ হেগারিশ (Hegerisch) যিনি ম্যালথস্-এর "এসে অন পপুলেশন (Essay on population)" অনুবাদ করেছিলেন, তিনি জোর করে নারীদের যৌনকামনা দমন করবার বিষয়ে বলেছেন: "যদিও আমি ম্যালথসের সঙ্গে একমত যে সতীত্বের সংযমের মূল্য আছে, কিন্তু একজন চিকিৎসক হিসাবে দুঃখের সঙ্গে একথা আমায় মানতে হয় যে নারীর সতীত্বের সংযম এত গৌরবের হওয়া সত্ত্বেও তা প্রকৃতির বিরুদ্ধে একটা অপরাধ এবং অনেক সময় তার ফলে অত্যন্ত নির্মম ব্যাধিও দেখা দেয়। শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপর তার নানা প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এই সংযমের ফলে

অবশেষে নারীদের বহু দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হয়। দেখা যায় যে নারী সমাজের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ এমন অনেকেই প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করে করে সফল-ভাবে সংযম পালন করতে পারে বটে, কিন্তু তাদের অবস্থা হয় সবচেয়ে মর্মান্তিক। স্বামী পরিত্যক্তা, বাল্যবিধবা নারীরা তাদের নিঃসঙ্গ শয্যায় একাকী শুকিয়ে যেতে থাকে..." তিনি তারপর দেখিয়েছেন যে বিশেষ করে 'নান' বা মঠের সন্ন্যাসিনীরা এই সব দুঃখ কষ্ট ও ব্যাধির শিকার হয়ে থাকে।

নীচের সংখ্যাগুলি থেকেই বোঝা যাবে যে নরনারী উভয়ের ক্ষেত্রেই যৌন আবেগ দমন করার কুফল কত এবং বোঝা যাবে যে বিবাহ যদি ততটা সুখের না হয়, তবুও চিরকৌমার্য থেকে বিবাহিত জীবন ভাল ঃ ১৮৫৮ সালে ব্যাভেরিয়াতে ৪৮৯৯ জন উম্মাদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ছিল ২৫৭৬ (৫৩%) এবং নারীর সংখ্যা ছিল ২৩২৩ (৪৭%) সুতরাং পুরুষের সংখ্যা নারীর সংখ্যার থেকে বেশী ছিল। কিন্তু সেই উম্মাদদের মধ্যে নারীপুরুষ মিলে অবিবাহিতদের সংখ্যা ছিল ৮১ শতাংশ এবং বিবাহিতদের সংখ্যা ছিল ১৭ শতাংশ ; বাকি ২ শতাংশের কথা জানা যায়নি। অবশ্য অবিবাহিত উম্মাদদের সংখ্যার মধ্যেই যাবা জন্ম থেকেই উম্মাদ তাদেরও ধরা হয়েছে। হ্যানোভার-এর ১৮৫৬ সালের লোকগণনার হিসাবে দেখা যায় যে সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে প্রতি ৪৩৭ জন অবিবাহিতের মধ্যে একজন, ৫৬৪ জন বিধবার মধ্যে একজন এবং প্রতি ১৩১৬ জন বিবাহিতের মধ্যে একজন করে উম্মাদ ছিল। স্যাকসনিতে প্রতি ১,000,000 জন অবিবাহিত পুরুষের মধ্যে ১000 জন আত্মহত্যা করেছে, এবং প্রতি ১,000,000 বিবাহিত পুরুষের মধ্যে মাত্র ৫00 জন আত্মহত্যা করেছে। নারীদের মধ্যে আত্মহত্যার সংখ্যা গড়ে পুরুষদের চেয়ে কম। নারীদের মধ্যে প্রতি দশ লক্ষ কুমারী ও বিধবার মধ্যে ২৬০ জন এবং প্রতি দশ লক্ষ বিবাহিত নারীর মধ্যে ১২৫ জন আত্মহত্যা করেছে। অন্যান্য অনেক প্রদেশেও এই ধরনের হিসাব দেখা গেছে। দেখা গেছে যে-নারীরা আত্মহত্যা করেছে তাদের মধ্যে অধিকাংশেরই বয়স ছিল ১৬ বছর থেকে ২১ বৎসরের মধ্যে। তার থেকেই যথেষ্ট প্রমাণ হয় যে তাদের আত্মহত্যা করার কারণ প্রধানতঃ যৌনকামনার অতৃপ্তি, হতাশ প্রেম, গুপ্ত অন্তঃসত্ত্বা অবস্থা এবং পুরুষদের দ্বারা পরিত্যক্ত হওয়া। ঐ একই কারণে অনেকেরই মাথা খারাপ হয়ে গেছে। উদাহরণ স্বরূপ দেখা যায় যে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়াতে প্রতি ১০,০০০ সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের অধিবাসীদের মধ্যে ৩২.২ জন অবিবাহিত পুরুষ উম্মাদ, ২৯.৩ জন অবিবাহিত নারী উম্মাদ, ৯.৫ জন বিবাহিত পুরুষ উম্মাদ, ৯.৫ জন বিবাহিত নারী উম্মাদ, ৩২.১ জন বিপত্নীক পুরুষ উম্মাদ ও ২৯.৯ জন বিধবা নারী উম্মাদ ছিল।

এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে যৌন অতৃপ্তির ফলে পুরুষ ও নারী উভয়েরই

শরীর ও মনের উপর অত্যন্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে। আর এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির পথে বাধা সৃষ্টিকারী কোনো সামাজিক রীতিনীতিকেই ভাল বলা যায় না।

সুতরাং প্রশ্ন হল এই যে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় সমস্ত মানুষের, বিশেষ করে নারীদের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত স্বাভাবিক জীবনধারার প্রয়োজনগুলি মেটাতে পারে কি না। এ সমাজ কি পারে সে প্রয়োজন মেটাতে? যদি না পারে, তবে তার জন্য কি করতে হবে?

"বিবাহ পরিবারের ভিত্তি। পরিবার রাষ্ট্রের ভিত্তি। যদি বিবাহ ব্যবস্থাকে আক্রমণ কর, তবে সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে আক্রমণ করা হবে এবং উভয় ব্যবস্থাকেই ছোট করা হবে"—বর্তমান "সমাজ ব্যবস্থার" প্রবক্তারা এই কথাই বলে থাকে। নিশ্চয়ই তো, বিবাহই তো সমাজ বিকাশের মূল। কিন্তু আমাদেব বুঝতে হবে কোন্ ধরনের বিবাহের নৈতিক মান বেশি। অথবা, কোন্ ধরনের বিবাহ ব্যবস্থা সমস্ত স্তরেই মানবজাতিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। বুর্জোয়া সম্পত্তি চিন্তার উপর যে বিবাহ ব্যবস্থার ভিত্তি, তা আবশ্যিক এবং তার সঙ্গে যুক্ত আছে বহু রকমের খারাপ জিনিস। তার দ্বারা বিবাহের আসল উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হতে পারে না। সমাজের লক্ষ লক্ষ মানুষ সে বিবাহ ব্যবস্থার সুবিধা পায় না। সেই বিবাহ ব্যবস্থাই ভাল, না স্বাধীন, প্রতিবন্ধক-হীন, ভালবাসার ভিত্তিতে যে বিবাহ,—যে বিবাহ একমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজেই সম্ভব—সেই বিবাহ ভাল?

এমনকি জন স্টুয়ার্ট মিল, যাঁকে কেউ কোনোদিন কমিউনিস্ট বলে সন্দেহও করবে না, তিনি বলেছেন: "আজকের দিনে বিবাহই হল একমাত্র ক্ষেত্র যেখানে আইনত দাসপ্রথা বজায় আছে।"

কান্ট-এর মতবাদ অনুযায়ী নরনারী উভয়ে মিলেই একটা সম্পূর্ণ সত্তা। তাদের যৌন জীবনের স্বাভাবিক মিলনের উপর নির্ভর করে জাতির সুস্থ বিকাশ। যৌন জীবনের স্বাভাবিকতার উপর নির্ভর করে নরনারী নির্বিশেষে প্রতিটি ব্যক্তি জীবনের বিকাশ। কিন্তু মানুষ তো শুধু পশু নয়, তার যে মনুষ্যত্ব আছে। তাই তার সবচেয়ে প্রবল শক্তিশালী প্রবৃত্তি শুধু শারীরিক প্রয়োজন মেটালেই পরিতৃপ্ত হয় না, যার সঙ্গে তার যৌনজীবনের মিলন হয় তার সঙ্গে তার মনের মিলনের প্রয়োজন আছে। যদি এই মনের মিল না থাকে, তবে তাদের যৌন সংসর্গ হয়ে যায় নিছক যান্ত্রিক, আর নৈতিকতা বর্জিত কলঙ্কের কাজ। এরকম যান্ত্রিক যৌন সংসর্গ কখনও উন্নত মানব জীবনের প্রয়োজন মেটাতে পারে না। তার জন্য প্রয়োজন নরনারীর উভয়ের মধ্যে মানসিক আকর্ষণ, যাতে তাদের যৌন জীবনের আকর্ষণও সুন্দর মহৎ হয়ে ওঠে। রুচি সম্পন্ন

মানুষ নরনারীর পরস্পরের মনের টানের দিকের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। যার প্রভাব তাদের যৌন সংসর্গের ফলে যে সন্তানের জন্ম হয় তার উপরও গিয়ে পড়ে।*

সুতরাং সন্তানদের জন্য চিন্তা, তাদের প্রতি কর্তব্য এবং তার থেকেই আনন্দলাভের কথা ভাবতে হবে। তার জন্যই তো সমস্ত রকমের সমাজেই দুটি নরনারী প্রণয়বন্ধন চিরস্থায়ী হয়ে থাকে। প্রত্যেক দম্পতিকেই ভেবে দেখতে হবে তাদের পরস্পরের শারীরিক মানসিক গুণাবলী তাদের মিলনের অনুকূলে কিনা। তার উত্তর সঠিক নিরপেক্ষ হতে পারে মাত্র দুটি সর্তে। প্রথমত তাদের মিলনের আসল উদ্দেশ্য, অর্থাৎ তাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি করা এবং সন্তানের জন্ম দেওয়া ছাড়া অন্য কোনো স্বার্থ থাকবে না; দ্বিতীয়ত, মিলনের পিছনে যেন শুধুই অন্ধ আবেগ বা যৌনকামনা না থাকে তা দেখতে হবে। আমাদের বর্তমান সমাজে বিবাহের ক্ষেত্রে প্রায় এই দুটি জিনিসেরই অভাব দেখা যায়। তার থেকেই দেখা যায় যে আধুনিক বিবাহ ব্যবস্থায় কোনোমতেই বিবাহের আসল উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে না। সুতরাং আধুনিক বিবাহকে পবিত্র বা নৈতিকতাযুক্ত বলা যায় না।

বর্তমানে কত অসংখ্য বিবাহের ক্ষেত্রে যে উপরোক্ত সর্তগুলির ঠিক উল্টো-টাই পালন করা হচ্ছে তা সংখ্যা দিয়ে প্রমাণ করা অসম্ভব। আর নিজেদের স্বার্থেই তারা প্রকৃত অবস্থাটাকে চেপে রেখে দুনিয়ার সামনে তাদের বিবাহটাকে অন্য রকমভাবে তুলে ধরে। আধুনিক রাষ্ট্রও, যা কিনা সমাজের প্রতিনিধি, এমন কোনো গবেষণামূলক কাজে উৎসাহ দেয় না যাতে এ বিষয়ের উপর কিছু আলোকপাত হতে পারে। রাজকর্মচারী ও আমলাদের বেলায় বিবাহের এক-রকমের নিয়ম, আর অন্যদের বেলায় আর একরকমের নিয়ম চালিয়ে থাকে।

আমরা মানি যে বিবাহবন্ধন হওয়া উচিত শুধু দুটি নরনারীর পারস্পরিক ভালবাসার উপর ভিত্তি করে, তাদের স্বাভাবিক জীবন যাপনের উদ্দেশ্যেই হওয়া উচিত। সেই উদ্দেশ্যই হল পবিত্র, অবিমিশ্র। তার উল্টোটায় এই হয়ে থাকে যে নারীরা মনে করে বিবাহ হল তাদের কাছে একটা অনাথ আশ্রম, সেখানে তাদের যে কোনো মূল্যেই ঢুকতে হবে। আর পুরুষরা মনে করে বিবাহে তাদের একটা আর্থিক সুবিধা আছে, আর যত পারে আদায় করে নেয়। আর এমন কি

* "যে অনুভূতি ও আবেগ নিয়ে স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয় তা সন্দেহাতীতভাবে যৌনক্রিয়ার পরিণতিতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে ও ফলশ্রুতিতে কতকগুলি বৈশিষ্ট্যও প্রদান করে।" ডাঃ এলিজাবেথ ব্লাক ওয়েল: "দি মোরাল এডুকেশন অব দি ইয়ং ইন রিলেশন টু সেক্স"। গেটের, Wahlverwandschaften দেখুন, সেখানে তিনি এই ধরনের অনুভূতির কার্য স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।

যে-সব বিবাহের ক্ষেত্রে সে রকম নীচ স্বার্থবুদ্ধি নাই, সেখানেও কঠিন বাস্তব অবস্থার জন্য এমন পরিস্থিতি হয় যে, সে বিবাহ থেকে নরনারীর তরুণ জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, উদ্দীপনা, পূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

একথা যথার্থই সত্য। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের পক্ষেই বিবাহিত জীবন সুখের হতে হলে শুধু যে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধা থাকারই প্রয়োজন তাই নয়, তাদের এবং তাদের সন্তানদের সুখ সুবিধার উপযোগী পরিবেশ ও অবস্থাও থাকা দরকার। কঠিন জীবন সংগ্রাম, গুরুতর ভাবনা চিন্তায় পড়ে বিবাহিত জীবনের সুখ শান্তি নষ্ট হয়ে যায়। আর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিলন যতই সফল হয়, ততই তাদের দুশ্চিন্তা বেশি বেশি হতে থাকে। যে কৃষক তার গরু ভেড়ার বাচ্চা হলে প্রতিবেশির কাছে হাসি মুখে সংবাদ দিতে যায় ক'টি বাচ্চা হল বলে —সেই কৃষকেরই আবার ২/১টি সন্তানের পরই তার স্ত্রী আবার একটি নবজাত শিশুর জন্ম দিয়েছে শুনে মুখ শুকিয়ে যায়, ভাবে কেমন করে তাদের মানুষ করবে ; আর সেই নবজাতক শিশুটি যদি আবার পুত্র না হয়ে কন্যা হয়, তবে তো তার মুখ একেবারেই শুকিয়ে যায়।

যে মানব শিশুকে আমাদের ধর্মে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি বলা হয়, তার মূল্য শেষকালে কিনা গৃহপালিত পশুশাবকদের চেয়েও কম। এর থেকেই বোঝা যায় আমাদের অবস্থার কতদূর অধঃপতন হয়েছে। এখানেও আবার মেয়েদেরই কষ্ট বেশি। অনেক বিষয়েই প্রাচীন এবং আধুনিক বর্বরদের সঙ্গে আমাদের ধ্যান-ধারণার তফাৎ কিছুই নেই। বর্বররা তাদের মেয়ে বাড়তি হলে তাদের মেরে ফেলত, আর যুদ্ধবিগ্রহের সময় তারা বেশিরভাগ মেয়েদের বাড়তি মনে করত। আমরা খুব সভ্য হয়েছি, তাই কন্যাদের হত্যা করে ফেলি না, কিন্তু আমরা তাদের সমাজের ও পরিবারের গলগ্রহ মনে করি। পুরুষের শক্তি বেশি, তাই মেয়েদের তারা জীবন সংগ্রামের সর্বত্রই পিছনে ঠেলে দেয়। কিন্তু তবুও যখন আত্মরক্ষার তাগিদেই প্রতিযোগিতায় নেমে আসে, তখন অনেক সময়ই সেই প্রতিযোগিতার ভয়ে পুরুষ তাদের ঘৃণা করে, তাদের উপর নিপীড়ন করে। এদিক থেকে সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য, কর্মক্ষেত্রেই এক অবস্থা দেখা যায়। যাদের কোনো দূরদৃষ্টি নাই তারা নারীদের উপার্জনের কাজকে একেবারেই নিষিদ্ধ করে দিতে চায়—যেমন, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী শ্রমজীবীদের সম্মেলনে সেই দাবিই করা হয়েছিল, কিন্তু অধিকাংশের ভোটে তা অগ্রাহ্য হয়ে যায়—। এখানে অবশ্য তাদের সঙ্কীর্ণতাকে ক্ষমা করা যায়, কারণ—নারীদের বাইরে কাজ করতে না দেবার পক্ষে তাদের যে যুক্তি ছিল তা অস্বীকার করা যায় না। তারা দেখিয়েছিল যে নারীরা যদি বাইরে রোজগার করতে যায় তবে পারিবারিক জীবন একেবারে ভেঙে যায়, আর তার ফলে জাতির অধঃপতন হবেই। কিন্তু নারীদের চাকরি

করাটা নিষিদ্ধ করা অসম্ভব। শত সহস্র নারী শুধু নিছক পেটের আগিদেই কলে কারখানায় ও তার বিভিন্ন শাখায় কাজ খুঁজতে যেতে বাধ্য হয়েছে। এমনকি বিবাহিত নারীরা পর্যন্ত শুধু তাদের স্বামীদের রোজগারে সংসার চলে না বলে আরো কিছু রোজগার করবার জন্য বাধ্য হয়ে কাজের প্রতিযোগিতায় নেমেছে।*

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে পূর্বের যে কোনো সময় থেকে আজকের দিনে সমাজ অনেক সভ্য হয়েছে। নারীদের অবস্থার উন্নতি হয়েছে। নারীদের উপার্জনের জন্য শুধু শারীরিক পরিশ্রমই করতে হয় না, নানা রকমের কাজ তারা করতে পারে, কিন্তু নারীপুরুষের উভয়ের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্বন্ধ সেই একই রকম রয়ে গেছে। অধ্যাপক লরেন্জ ভন ষ্টেন (Lorenz Von Stein) তাঁর 'উইম্যান ফ্রম স্ট্যান্ড পয়েন্ট অব পলিটিকাল ইকনমি'তে (Woman from standpoint of Political Economy) এ বিষয়ে যা লিখেছেন তাতে বিষয়টি সম্বন্ধে এত ভালো আলোচনা না হলেও তিনি আধুনিক বিবাহ সম্বন্ধে একটা মনগড়া আদর্শগত কাব্যিক চিত্র এঁকেছেন। কিন্তু তবুও সেখানে পুরুষসিংহের কাছে নারীর বশ্যতার কথা ফুটে উঠেছে। ঐ পুস্তকে তিনি লিখেছেন "পুরুষ চায় এমন নারীকে যে শুধু তাকে ভালই বাসবে তাই নয়, যার করস্পর্শ তার ললাট স্নিগ্ধ করবে, সংসারে সুখ শান্তি আনবে, হাজার রকম খুঁটিনাটি সমস্যা সমাধান করে সংসারকে সুন্দর করবে; সর্বোপরি যার নারীত্বের অপরূপ মহিমা তার পারিবারিক জীবনকে মধুর উত্তাপে সজীব রাখবে।

নারীর এই প্রশংসার সুরের মধ্যেই রয়েছে তার অবমাননা, রয়েছে পুরুষের হীনতম অহমিকা। হের অধ্যাপক নারীকে এঁকেছেন এক কাল্পনিক জীব হিসেবে; কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সংসার চালাবার মতো তার সব ক্ষমতা চাই, সর্বশক্তিমান পুরুষসিংহের চারিপাশে পাখা উড়িয়ে মলয় হিল্লোল তুলবে, পুরুষের মনের সব ইচ্ছাকে বুঝবে, আর তার কোমল করস্পর্শে পুরুষ নিজের দোষে জীবনে যে সব গ্লানি টেনে আনবে তা মুছে দেবে। সংক্ষেপে বলতে গেলে

* "শ্রীযুক্ত ই, একজন কারখানা মালিক, আমাকে বলেছেন যে তাঁর যন্ত্রচালিত তাঁতের জন্য তিনি শুধু নারীদেরই নিয়োগ করে থাকেন; তিনি বলেন যে তিনি বিবাহিতা নারীদের নিয়োগ করাটাই বেশী পছন্দ করেন, বিশেষত মায়েদের, যাদের উপর তাদের পরিবার নির্ভর করে; তারা অবিবাহিত মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশী মনোযোগী এবং তাড়াতাড়ি শেখে, তারা নেহাৎ মুখের গ্রাস জোগাবার জন্যই তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে। এইভাবেই তাদের গুণাবলীকে, নারীচরিত্রের বিশেষ গুণগুলিকে অপব্যবহার করা হয়; এইভাবেই নারীচরিত্রের নৈতিকতা ও কোমনীয়তাকে তাদেরই শোষণ নিপীড়ন করার যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়।"
Speech of Lord Ashley on the Ten Hours Bill, 1855.v. **Karl Marx, Kapital,** (Capital) 2nd edition.

অধ্যাপক স্টেন যেরকম নারী ও যেরকম বিবাহের কথা বলেছেন তা শতকরা নব্বই জনের মধ্যে সম্ভব নয়। বিদগ্ধ অধ্যাপক ভদ্রলোক কিন্তু হাজার হাজার অসুখী বিবাহের সম্বন্ধে কিছু জানেনও না, বোঝেনও না। তিনি জানেন না যে কজনই বা নিজের ইচ্ছামতো বিবাহ করতে পারে, আর তার চেয়ে কতগুণ বেশি ক্ষেত্রে জোর করে বিবাহ দেওয়া হয়, জানেন না যে কত অগণিত নারী আছে যারা বিবাহের কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না, আর কত লক্ষ লক্ষ নারী নিছক প্রতিদিনের আহার যোগাতে তাদের স্বামীদের সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও খেটে খেটে মরছে তার ঠিক নেই। কঠিন বাস্তব তাদের জীবন থেকে কাব্যসুষমা মুছে দেয়। এই বাস্তবের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই হের অধ্যাপকের কাব্যিক ভাবোচ্ছ্বাস কোথায় চলে যাবে।

হামেশাই মন্তব্য শোনা যায়ঃ "সমাজের নারীর স্থান কোথায়—তাই হল সভ্যতার মানদণ্ড।" আমরাও সে বিষয়ে একমত, কিন্তু তাহলেই আমরা দেখতে পাব যে আমাদের সভ্যতা কতদূর পৌঁছিয়ে আছে।

জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) তাঁর 'সাবজেকশন অব উইমেন' (Subjection of womcn) গ্রন্থে (গ্রন্থের নাম থেকেই সমাজের নারীদের অবস্থা সম্বন্ধে লেখকের মতামত বোঝা যায়) বলেছেনঃ "এখন মানুষের পারিবারিক জীবন অনেক ভালভাবে গড়ে উঠেছে। এজন্য নারীদের কাছে অনেক ঋণী।" প্রথম কথাটা ঠিক নয়, দ্বিতীয়টা আংশিক সত্য। যেসব ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আন্তরিক দাম্পত্য সম্বন্ধ রয়েছে, সে সব ক্ষেত্রে একথা নিশ্চয়ই খাটে। স্ত্রী যদি বাইরের জগতের সংগে পরিচিত হয়, যদি সে ঘরকন্নার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে বাইরের সামাজিক জীবনের সংগে জড়িত হয়, তবে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি তা তার নিজের পক্ষে এবং তার স্ত্রীর পক্ষে ভাল বলে মনে করবে, কিন্তু সেজন্য তার যে কর্তব্য রয়েছে তার তাগিদ অনুভব করে না। অন্যদিকে দেখা যাবে যে আধুনিক সমাজের বিবাহিত জীবন পূর্বের চেয়ে কিছু উন্নত নয়।

এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে সমস্ত যুগেই, যখন নারীরা সম্পত্তির অধিকারী ছিল বিবাহের ব্যাপারে বহু ক্ষেত্রেই প্রেম ভালবাসার চেয়ে অর্থের বিষয়টা প্রাধান্য পেত। কিন্তু তাই বলে এ প্রমাণ পাওয়া যায় না যে এখনকার মতো বিবাহ ব্যাপারটা খোলা বাজারের লেনদেন, ফাটকাবাজারির মতো ছিল। এখনকার দিনে বিত্তশীল শ্রেণীর মধ্যে—গরিবদের কাছে এর কোনো প্রয়োজন নাই—বিবাহের লেনদেনের ব্যাপারটা অত্যন্ত নির্লজ্জের মতো করা হয়ে থাকে, তার পবিত্রতা সম্বন্ধে অনেক ঢাক ঢোল পেটানো হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবই অন্তঃসারশূন্য প্রহসনে দাঁড়ায়। প্রত্যেকটি বিষয়ের মতো এরও কারণ আছে। এখনকার দিনে ব্যাপকভাবে অধিকাংশ মানুষের পক্ষে ধনসম্পদ সুখ ভোগ করাটা পূর্বের যে

কোনো সময়ের চেয়ে কঠিন হয়ে পড়েছে, অথচ তাদের ধনসম্পদ সুখ ভোগ করবার আকাঙ্ক্ষাটা ন্যায্যতই ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। আবার সকলেই বিশ্বাস করে যে তাদের সুখভোগ করবার সমান অধিকার আছে, তাই না পাবার ব্যর্থতাও বাজে বেশি। নীতির দিক থেকে উচ্চশ্রেণী ও সাধারণ মানুষের অধিকারের ক্ষেত্রে কোনো তফাৎ নেই। পারিবারিক জীবনে ভোগ সুখের সমান অধিকারের ধারণাটা বাস্তবে পরিণত করবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়। কিন্তু অধিকাংশ লোক একথা বোঝে না যে ভোগ সুখের সমান অধিকারটা তখনই কার্যকরী হতে পারে যখন সামাজিক অবস্থার ক্ষেত্রে সকলের মধ্যে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তদুপরি জনমত ও উচ্চশ্রেণীর নজির মানুষকে প্রভাবিত করে। সুতরাং বিবাহের মাধ্যমে যাতে বেশ বড় রকমের প্রাপ্তি যোগ হয় তার জন্য ফাটকাবাজারী করা, জীবনের উন্নতি সাধন করার একটা উপায় বিশেষ হয়ে দাঁড়াল।

একদিক থেকে অর্থের লোভ অন্যদিক থেকে সমাজে পদোন্নতির আকাঙ্ক্ষা উভয় পক্ষকেই প্রলুব্ধ করেছে। এই শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ জিনিসটা একটা ব্যবসার আদান প্রদানের কাজের মতন। এ যেন একটা আনুষ্ঠানিক বন্ধন, যাকে বাহ্যত উভয় পক্ষই সম্মান দেখায়, কিন্তু ভিতরে ভিতরে নিজেদের যা ইচ্ছে তাই করে। এই প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ ধারণা করার জন্য উচ্চ রাজনৈতিক পর্যায়ে কি ধরনের বিবাহ হত তার উল্লেখ করা দরকার। যেসব ক্ষেত্রে অবশ্যই বিবাহের সম্বন্ধের বাইরে অন্যত্র স্বেচ্ছামতো যৌন কামনা চরিতার্থ করার পথ খোলা থাকত—অবশ্য নারীদের চেয়ে পুরুষদের বেলায়ই সে সব পথ অনেক বেশী খোলা থাকত। এমন একটা সময় ছিল যখন রাজা রাজড়াদের বেলায় অন্ততঃ একজন করে রক্ষিতা রাখা তাদের রাজকীয় সম্মানের অংগ ছিল। যেমন, প্রাশিয়ার ১ম ফ্রেডরিক উইলহেলম (১৭১৩-১৭৪০) তার একজন জেনারেলের স্ত্রীর সংগে লোক দেখানো সম্পর্ক রাখত, দুর্গের প্রাংগনে তারা দৈনিক একঘণ্টা করে হেঁটে তাদের ঘনিষ্ঠতা দেখাত। একথা সর্বজনবিদিত যে ইটালীর পূর্বতন রাজার পূর্বপুরুষ যাকে "কনিগ আরেনম্যান" (Konig Ehrenmann) বলা হত, সে অন্ততঃ ৩২টি অবৈধ সন্তান রেখে গিয়েছিল। এ রকম আরো বহু উদাহরণ দেখানো যায়।

ইউরোপের অধিকাংশ রাজপরিবারের ও অভিজাতদের ভিতরের ইতিহাস বরাবরই অত্যন্ত কলংকময়, কখনো কখনো জঘন্য রকমের অপরাধের কালিমালিপ্ত। তাই তাদের ভিতরের ব্যাপার সব ঢাকা চাপা দিয়ে তাদের বংশধরদের বিষয়ে ফলাও করে বলা হয়ে থাকে, আর তাদের সবাইকে বিশ্বস্ত স্বামী ও চমৎকার পিতা বলে তুলে ধরা হয়। জনসাধারণের অজ্ঞতার উপর ভর করেই রোমান যুগেও যেমন ছিল, এখনো তেমনি আগররা (Augurs) বেঁচে থাকছে।

বড় বড় শহরে এমন কতগুলি নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট দিনে অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তিরা জড় হয় প্রধানত বেশ্যালয়গুলির ব্যবস্থা করার জন্য। এই সভাগুলোর নাম যথার্থই রাখা হয়েছে বিবাহ-বিনিময় সভা। তাদের প্রধান কাজ হইল ফাটকাবাজারি, দর কষাকষি, প্রতারণা ও দালালির কাজ। যে সব উচ্চ বংশের বড় অফিসার দেনায় ডুবে গেছে, উচ্ছৃংখলতার জন্য স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে, তারাও একটা বিবাহকে আশ্রয় করে দাঁড়াতে চায়—যে শিল্পপতিরা দেউলিয়া হয়ে গেছে, যে ব্যবসাদাররা, ব্যাংকের মালিকরা, বিপদে পরিত্রাণ চায়, যে রাজকর্মচারীরা অর্থ সংকটে পড়েছে, কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে—অর্থাৎ যারাই তাড়াতাড়ি ধনী হয়ে উন্নতি লাভ করতে চায় তারাই এখানে এসে দেনাপাওনার দর কষাকষি করে থাকে। আর যে নারীর জন্য এই রকম দরদাম চলে সে তরুণী বা বয়স্কা, সুরূপা বা কুরূপা, স্বাস্থ্যবতী বা ব্যাধিগ্রস্থ, শিক্ষিতা বা অশিক্ষিতা, ধার্মিক বা বাচাল, খ্রীষ্টান বা ইহুদী—যাই হক না কেন তাতে কিছু এসে যায় না। জনৈক বিশেষজ্ঞের মতে ঃ "খ্রীষ্টান পুরুষ ঘোড়ার সঙ্গে ইহুদী মাদী ঘোড়ার বিয়েও অনুমোদন করা হয়ে থাকে।" উচ্চস্তরের অভিজাত সমাজের মধ্যে এ সবই চলে। সর্বরকম ত্রুটি বিচ্যুতি, চরিত্র দোষ—টাকার জোরেই সব কিছুর ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়। "পবিত্র বিবাহ ব্যবস্থার" জন্য নানা ধরনের অসংখ্য দালাল সংগঠন, মেয়ে বা পুরুষ ঘটক চতুর্দিক থেকে হন্যে হয়ে বেড়ায়। বিশেষ করে উচ্চশ্রেণীর জন্য যখন পাত্রপাত্রী সন্ধানের কাজ করা যায় তখন এ ব্যবসা বিশেষ করে লাভজনক হয়ে থাকে। ১৮৭৮ খ্রীঃ এক ঘটকীয় একজনকে বিষপান করাবার অপরাধে ভিয়েনার আদালতে বিচার হয় এবং ১৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। এই সময় জানা যায় যে ভিয়েনার প্রাক্তন ফরাসী রাষ্ট্রদূত কাউন্ট ব্যানেভিল সেই মেয়েলোকটিকে তার একজন স্ত্রী জোগাড় করে দেবার জন্য ২২০০০ ফ্লোরিন (১৮৭০ পাউণ্ড) দিয়েছিল। এই মামলার মধ্যে অভিজাত ব্যক্তিদের মধ্যে আরো অনেকেই জড়িত ছিল। দেখা গেল যে ঐ ঘটকী মেয়েলোকটিকে দুর্নীতির কাজ করানোর জন্য কোনো কোনো উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিরাও সাহায্য করেছে। এর থেকেই সব ব্যাপারটা বোঝা যায়। জার্মানীর রাজনীতিতেও এই ধরনের জিনিস এখনো দেখা যায়। অবিবাহিত পুরুষ বা নারী যারই উপযুক্ত বিয়ের সুযোগ না হয় তারাই তাদের প্রয়োজনের কথা ধার্মিক রক্ষণশীল বা নীতিবাদী উদারনৈতিক সংবাদপত্রকে জানায়, যারা টাকার বিনিময়ে তাদের জোড় মিলিয়ে দিয়ে থাকে। নারী পুরুষের জোড় মিলিয়ে দেবার এই জঘন্য কারবার এমন সীমা ছাড়িয়ে যায় যে মাঝে মাঝে কর্তৃপক্ষও তাতে হস্তক্ষেপ করবার প্রয়োজন মনে করে এবং এই সব কদর্য কাজের কারবারীদের শাসিয়ে থাকে। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে লিপজিগের স্থানীয় সরকার এ সব কারবার যে বেআইনী তার প্রতি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ

করে এবং যারা সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে তাদের শাস্তি দেবার জন্য পুলিসকে নির্দেশ দেয়। তবে রাষ্ট্রশক্তি তো যথারীতি এসব কেলেঙ্কারীর বিরুদ্ধে খুব গুরুত্ব দিয়ে বিশেষ কিছু করে না, তারা শুধু সুযোগ বুঝে "শৃঙ্খলা ও নীতি"র রক্ষক হয়ে ওঠে।

এই সব পবিত্র বিবাহ অনুষ্ঠানে গীর্জা ও রাষ্ট্রের ভূমিকা অতি জঘন্য। রাজকর্মচারীরা আর গীর্জার যাজকরা যতই বুঝুক কত কদর্য কৌশলের মধ্য দিয়ে তাদের সামনে বিবাহের পাত্র পাত্রীকে উপস্থিত করা হয়েছে, যতই দেখা যাক যে পাত্র পাত্রীর মধ্যে বয়সে, মানসিক ও শারীরিক গঠনে, কোনো বিষয়েই কোনো মিল নেই হয়তো পাত্রীর বয়স কুড়ি আর পাত্রের বয়স সত্তর, অথবা তার উল্টোটা, হয়তো পাত্রী তরুণী, সুন্দরী, বেশ প্রাণবন্ত, আর পাত্র হয়তো বুড়ো জরাজীর্ণ শুষ্ক এর কোনো কিছুতেই রাষ্ট্রের বা চার্চের প্রতিনিধিদের কিছু এসে যায় না। তাদের কাজ হলো শুধু পাত্রপাত্রীকে আশীর্বাদ করা। আর গীর্জার যাজককে যে পরিমাণ অর্থ দেওয়া যাবে, তার আশীর্বাদও ততই বেশি গুরুগম্ভীর পবিত্র হবে।

কিন্তু তার পরে দেখা যায় যে এ রকম বিবাহের ফল খুব খারাপ হয়েছে, যা কিনা আগেই বোঝা গিয়েছিল। আর এ সব ক্ষেত্রে নারীদের দুর্দশাই বেশি হয়ে থাকে। কিন্তু তখন যদি কেউ বিবাহ বিচ্ছেদ করতে চায়, তাহলে যে রাষ্ট্র-শক্তি বা গীর্জার যাজকরা বিবাহ বন্ধন করে দেবার সময় তার গুণাগুণ কিছুই বিচার করেনি, তারাই সবচেয়ে গুরুতরভাবে আপত্তি করতে থাকে। রাষ্ট্র বা গীর্জা কেউই কিন্তু পাত্রপাত্রীর বিবাহের পূর্বে এটা দেখার দরকার মনে করেনি যে সে বিবাহ অস্বাভাবিক এবং ফলত অনৈতিক। বিবাহের পর কারও নৈতিক জীবনের ব্যাপারটাকে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য উপযুক্ত কারণ বলে ধরাই হয় না, এমন সব সাক্ষী প্রমাণ উপস্থিত করতে বলা হয় যে তাতে কোনো না কোনো পক্ষকে লোকচক্ষে নিচে নামিয়ে হেনস্তা করা হয়। ক্যাথলিক চার্চের বিবাহ বিচ্ছেদের নিয়ম খুবই কড়াকড়ি। শুধু পোপের হাতেই তার ক্ষমতা আছে। এমনকি স্বামী স্ত্রী পৃথকভাবে খাওয়া শোয়ার স্বাধীনতার জন্যও বহু কষ্টে এদের চার্চের অনুমতি নিতে হয়। এইভাবে সমগ্র ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসী অধিবাসীদেরই কড়াকড়ি নিয়মের মধ্যে থাকতে হয়।

এইভাবেই দুটো মানুষকে বেঁধে ফেলা হয়ে থাকে। একজন অপরজনের দাসে পরিণত হয় এবং দাম্পত্য জীবনের কর্তব্য পালন করতে বাধ্য হয়, হয়তো তাকে এমন কঠিন আলিঙ্গন সোহাগ হজম করতে হয় যা কিনা সে মারপিট বকুনির চেয়েও অনেক বেশি ঘৃণা করে।

এখন আমি জিজ্ঞাস করি যে এই ধরনের বিবাহ যার সংখ্যা প্রচুর—কি

বেশ্যাবৃত্তির চেয়েও খারাপ না? একজন বেশ্যারও অধিকার আছে তার লজ্জাজনক কারবার বন্ধ করার। আর যদি সে কোনো বেশ্যালয়ের অধিবাসী না হয়, তবে তার অধিকার আছে যে মানুষকে সে পছন্দ করে না তাকে প্রত্যাখ্যান করার। কিন্তু একজন স্ত্রী তার স্বামীর হাতে বিক্রীত হয়ে যায়। তখন তার স্বামীর প্রতি ঘৃণা অভক্তির শত কারণ থাকলেও তাকে তার স্বামীর আলিঙ্গন সহ্য করতেই হয়।

অন্য রকমের বিবাহ, যেখানে টাকাটাই প্রধান উদ্দেশ্য নয়, তার পরিস্থিতি কিছুটা ভাল। সেখানে নিজেদের মধ্যে মিল না থাকলেও বাইরের কেলেঙ্কারীর ভয়ে বা আর্থিক ক্ষতির ভয়ে বা সন্তানের দিকে তাকিয়ে স্বামী স্ত্রী পরস্পরের সঙ্গে মানিয়ে চলে। অবশ্য মা বাপের মধ্যে প্রকাশ্যে শত্রুতা বা ঝগড়া বিবাদ না হলেও তাদের দাম্পত্য সম্বন্ধ যদি নিস্পৃহ, প্রেমবর্জিত হয়, তাহলে সন্তানদেরই ক্ষতি হয় সবচেয়ে বেশি। বিবাহবিচ্ছেদের ঘটনাগুলি থেকে দেখা যায় পুরুষরাই ভাঙনটা ধরায় বেশি, আর তারা অন্যত্র গিয়ে নিজেদের চাহিদা উশুল করে। স্ত্রীদের বেলায় বিবাহের গন্ডি থেকে বেরোনো অনেক বেশি কষ্টকর। কারণ প্রথমত গ্রহণকারী হিসাবে তার ফল হয় মারাত্মক এবং দ্বিতীয়ত তার দিক থেকে সামান্যতম ত্রুটিবিচ্যুতিও মারাত্মক অপরাধ বলে গণ্য করা হয় যা কিনা তার স্বামী বা সমাজ কেউই ক্ষমা করবে না। স্বামীর দিক থেকে মিথ্যাচার ও অত্যাচার অত্যন্ত চরম অবস্থায় না পৌঁছলে স্ত্রীরা কখনো বিবাহবিচ্ছেদের কথা বলে না। তার সোজা কারণ হল এই যে স্ত্রীকে স্বামীর উপর নির্ভর করতে হয়। স্ত্রী হল অর্থনৈতিক ভাবে পরাধীন, আর স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হলে তার কোনো মর্যাদাও থাকে না। তা সত্ত্বেও যে বহুসংখ্যক নারী বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য আবেদন করে থাকে তার থেকেই বোঝা যায় যে নারীদের বিবাহিত জীবন কতদূর দুর্বিষহ হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ফরাসীতে বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদনকারীদের মধ্যে শতকরা ৮৮ জনই ছিল নারী।* প্রতি বৎসরই যে বিবাহবিচ্ছেদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে তার থেকেই অবস্থার গুরুত্ব বোঝা যাবে। ১৮৭৮ সালে অষ্ট্রিয়ার জজ ফ্রাঙ্কফার্টার জাইটুং (Frankfurter Zeitung) পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে উল্লেখ

* ফ্রান্সে বিবাহ বিচ্ছেদের দরখাস্তের হিসাব নিম্নরূপ:

সাল	নারীদের কাছ থেকে	পুরুষদের কাছ থেকে	প্রতি বৎসর
১৮৫৬-১৮৬১ গড়ে	১৭২৯	১৮৪	,,
১৮৬১-১৮৬৬ ,,	২১৩৫	২৬০	,,
১৮৬৬-১৮৭১ ,,	২৫৯১	৩৩০	,,

Bridel: Puissance Marital (Marital Power)

করেছিলেন ঃ "ব্যাভিচারের কাজটা হল জানালার কাঁচ ভাঙার মতই একটা সাধারণ জিনিস." একথা মোটেই অতিরঞ্জিত নয়।

ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থার যেমন অনিশ্চয়তা, সবার সংগে সবার প্রতিযোগিতায় ঠেলাঠেলি করে একটা নিরাপদ আর্থিক সংগতি লাভের পথে যেমন ক্রমবর্ধমান অসুবিধা দেখা যাচ্ছে, তাতে মনে হয় না যে বর্তমান সমাজব্যবস্থায় এই বিয়েব ব্যবসাটা বন্ধ হবে বা কিছুটা কমবে। অপরপক্ষে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা এবং সম্পত্তির ব্যাপারের সংগে বিয়ের ব্যাপারটা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থেকে সব জিনিসটাকেই আরো অধঃপতনের দিকে নিয়ে যেতে বাধ্য।

যখন একদিক থেকে বিয়ের ব্যাপারে দুর্নীতি বেড়েই চলেছে, আর অন্য দিক থেকে অনেক মেয়েব, যখন একেবারেই বিয়ের সুযোগ নাই, তখন "নারীর স্থান হল গৃহে, স্ত্রী এবং মা হিসেবে তার কর্তব্য সাধন করতে হবে"—এ ধরনের কথাবার্তা শুধু ভাবনা চিন্তাহীন বাচালতা মাত্র। আবার বিবাহ ব্যবস্থার মধ্যে নানা দুর্নীতির জন্যই আবার অবৈধ যৌন সম্পর্ক, পতিতাবৃত্তি এবং সর্ব রকমের দোষ বেড়ে উঠতে থাকে।*

ধনিক শ্রেণীর মধ্যে অনেক সময়ই দেখা যায় যে স্ত্রীর অবস্থা সেই গ্রীক যুগের মতো। সে শুধু পুরুষের জন্য বৈধ সন্তানের জন্ম দেয়, ঘর সংসার দেখাশোনা করে, আর পুরুষের সেবা যত্ন করে। আর স্বামী তার যৌন কামনা চরিতার্থ করবার জন্য রক্ষিতাদের কাছে আর বেশ্যাদের কাছে যায়, যারা কিনা বড় বড় শহরের 'শোভাবর্ধন' করে থাকে। আবার অস্বাভাবিক বিবাহের দরুন খুন করা, পাগল বলে মিথ্যে অপবাদ দেওয়া প্রভৃতি নানা রকমের অপরাধ বাড়তে থাকে। কলেরা মহামারীর সময় আবার স্বামী হত্যা বা স্ত্রী হত্যার সংখ্যা বেশী ঘন ঘন হতে দেখা যায়। কারণ কলেরা ও বিষক্রিয়ার লক্ষণগুলি

* ডক্টর কার্ল বুগার (Karl Bucher) তাঁর Die Erauenfrage in Mittelalter (The Woman's Question in the Middle Ages) পুস্তকে বিবাহিত ও পারিবারিক জীবনে বিচ্ছেদের বিষয়ে অভিযোগ কবেছেন; তিনি কলকারখানায় ক্রমশঃ অধিক সংখ্যক নারীদের নিয়োগের বিরুদ্ধে বলেছেন, এবং দাবি করেছেন যে নারীদের তাদের "যোগ্য স্থানে", অর্থাৎ ঘর সংসারে "ফিরে আসতে" হবে, অর্থনৈতিক দিক থেকে কেবলমাত্র সেখানেই নারীদের "মূল্য আছে"। আধুনিক নারীদের আগ্রহকে তাঁর পল্লবগ্রাহিতা বলে মনে হয়, এবং অবশেষে তিনি এই আশা প্রকাশ করেছেন যে "তারা শীঘ্রই সঠিক পথে ফিরে আসবে", যদিও তিনি সঠিক পথটা যে কি তা নির্দেশ করতে পারেননি। মধ্যবিত্ত সুলভ গণতান্ত্রিক চিন্তার কথা বলতে গেলে এ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। এই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখলে আমাদের আধুনিক প্রগতিকেই ভুলভাবে বিচার করা হবে, সভ্যতার বিচারে মস্তবড় ভুল হবে। কিন্তু সভ্যতায় ক্ষেত্রে তেমন ভুল হয় না। তার একটি অন্তর্নিহিত প্রণালী আছে; এবং ঐতিহাসিকদের দায়িত্ব হল সেই প্রণালীটি আবিষ্কার করা এবং তার দ্বারা কিভাবে প্রচলিত ক্ষতিকর বিষয়গুলিকে দূর করা যায় এবং কিভাবেই বা প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় তা দেখানো।

প্রায় এক রকম। তাই বিষ খাইয়ে কলেরা হয়েছে বলে চালিয়ে দিলে তা পরীক্ষা করে দেখা মুস্কিল। যেহেতু মহামারীর ভয়ে কেউ সামনে এগোতে চায় না, ছোঁয়াচে রোগ বলে মৃত্যু দেহও তাড়াতাড়ি সৎকার করে ফেলার দরকার হয়।

যে শ্রেণীর লোকদের মধ্যে রক্ষিতা পুষবার মতো আর্থিক সঙ্গতি নাই, তারা বাইরে বাইরে নৃত্য গীতের আসরে, হোটেলে, বেশ্যালয়ে ফুর্তি করে বেড়ায়। সর্বত্রই বেশ্যাবৃত্তি বেড়ে চলেছে।

আমরা দেখেছি যে, যে সব উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ বেশী হয়ে থাকে, তাদের মধ্যেই দেখা যায় টাকার খাতিরের বিয়ে। প্রাচুর্য, কর্মহীনতা, ব্যাভিচার, অশ্লীল গান বাজনা নাটক নভেল চলচ্চিত্র ইত্যাদির প্রচলনে তাদের মানসিকতাও ঐ রকম নেমে যায়। সব চেয়ে নিচের তলার মধ্যেও আবার অনুরূপ জিনিসগুলি কাজ করে থাকে। এ কথা সত্যি যে এদের মধ্যে পুরুষ বা নারী কেউই সম্পত্তির জন্য বিয়ে করে না। তাদের মধ্যে সাধারণত পুরুষের পছন্দেই বিয়ে হয়। পুরুষ ভেবে দেখে যে তার স্ত্রী তার সঙ্গে সঙ্গে রোজগার করতে পারবে কি না, অথবা তাদের ছেলেমেয়েরা তাড়াতাড়ি রোজগার করে সংসারের সুরাহা করতে পারবে কি না। একথা দুঃখের হলেও একেবারে সত্যি যে শ্রমিকের বিবাহিত জীবনকেও তছনছ করে দেবার মতো অনেক ঘটনা ঘটে থাকে। পরিবার বড় হলে ছেলেপিলের মা তার রোজগারের কাজ করে না। এদিকে ব্যবসা বাণিজ্যে স্ফীতি, নতুন যন্ত্রপাতির আমদানী, কলকারখানায় কাজের নতুন নতুন কায়দা কানুন, যুদ্ধ, লোকসানি বাণিজ্য চুক্তি, পরোক্ষ কর—এই সবের ফলে শ্রমিকের মজুরি কাটা যায়, বা তাকে ছাঁটাই করে দেওয়া হয়। তখন সেই ঘা খাওয়া শ্রমিকের জীবন তিক্ত বিরক্ত হয়ে উঠে। বাড়ি এসে সে তার ঝাল ঝাড়ে, কারণ সেখানে তার ঘাড়ের উপর রয়েছে স্ত্রী ছেলেমেয়েদের প্রতিদিনের প্রয়োজন মেটাবার দায়। অথচ তার সে সঙ্গতি নাই। অবশেষে সেই হতাশ শ্রমিক তাড়ি মদের মধ্যে শান্তি পেতে যায়। তার শেষ কপর্দক পর্যন্ত খরচ হয়ে যায়। ঝগড়া ঝাঁটি চরমে উঠে আর আমরা দেখতে পাই যে তার দাম্পত্য জীবন ধ্বংস হয়ে যায়, ধ্বংস হয়ে যায় তার পরিবার।

অন্য একটা চিত্র দেখা যাক। স্বামী স্ত্রী একসঙ্গে কাজ করতে গেল। তাদের ছোট্ট ছোট্ট শিশুরা পড়ে রইল তাদের চেয়ে একটু বড় শিশুদের জিম্মায়—যাদের নিজেদেরই দেখাশোনা করার ও লেখাপড়া শেখানোর দরকার। যদি মা বাপ বাড়ি ফিরেও আসে, তারা রাত্রে ফিরে আসে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে। যা পায় গোগ্রাসে গিলে ফেলে কোনো মতে আহার সেরে নেয়। বাড়ি ফিরে এসে তারা কোনো আরাম পায় না। বাড়ি বলতে অস্বাস্থ্যকর, ছোট্ট ঝুপড়ি। আলো নেই, বাতাস নেই, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবার কোনো

ব্যবস্থাও নেই। স্ত্রী ফিরে এসেই চোখে আর পথ দেখতে পায় না। সাত তাড়াতাড়ি কাজে লেগে যায় কোনোমতে সংসারের কাজ একটু গুছিয়ে নিতে। বাচ্চাগুলো কান্নাকাটি হৈ চৈ করতে থাকে। যত তাড়াতাড়ি পারে তাদের বিছানায় শুইয়ে দেয়। গভীর রাত পর্যন্ত জেগে বসে মা তাদের জামা কাপড় সেলাই করে, জোড়া তালি দেয়। তার কোনো বিশ্রাম আনন্দ ফুর্তির কথা ওে উঠেই না। স্বামীও অশিক্ষিত অজ্ঞ। স্ত্রী ততোধিক অজ্ঞ। তারা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে কথা কাটাকাটি ঝগড়াঝাঁটি শুরু করে দেয়। স্বামী তখন আমোদ ফুর্তির জন্য হাঁটা দেয় সরাইখানায়। সেখানে গিয়ে সে মদ খায়। শেষ কপর্দক পর্যন্ত খরচ করে। কখনো বা জুয়ো খেলার পাল্লায় পড়ে। বড় লোকদের মধ্যেও অনেকেই জুয়োর পাল্লায় পড়ে, আর অনেক কিছুই তারা খোয়ায়। এদিকে শ্রমিকের স্ত্রী ঘরের মধ্যে গজ গজ করতে থাকে। তাকে তো একটা ভারবাহী জন্তুর মতো খেটেই যেতে হয়। তার জন্য কোনো বিশ্রাম বা ফুর্তি নেই। তার স্বামী পুরুষ হয়ে জন্মেছে বলেই যা কিছু সুবিধে পায়, তা কাজে লাগায়। তাদের মধ্যে বিবাদ চরমে পেঁছায়। অথবা স্ত্রীরও যদি বিবেক কিছু কম থাকে, সেও যদি আমোদ ফুর্তি করতে যায়, তাহলে সংসারের দুরবস্থা চরমে পেঁছায়। সত্যই, আমরাই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দুনিয়ায় বাস করছি!

এ সব জিনিসই সর্বহারাদের বিবাহিত জীবনকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। তার সুসময় এলেও বিপদ। তখন তাকে ছুটির দিনে বা রবিবার অতিরিক্ত খাটতে হয়। ফলে তার পরিবারের জন্য যেটুকু সময় দিতে পারত তাও পারে না। হাজার হাজার শ্রমিককে তার বাসস্থান থেকে কর্মস্থলে যেতে হলে অন্ততঃ একঘণ্টা হেঁটে যেতে হয়। বহুক্ষেত্রেই তারা বাড়িতে খেতে আসার সময়ও পায় না। সকালে যখন সে শ্রমিক কাজে যায় তখন তার ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে থাকে আবার অনেক রাতে যখন বাড়ি ফেরে তখনো তারা ঘুমিয়ে পড়ে। অনেক শ্রমিক, বিশেষ করে বড় বড় শহরের রাজমিস্ত্রীরা, কর্মস্থল দূরে বলে সারা সপ্তাহই বাড়ির বাইরে থাকে। কেবল রবিবার রবিবার বাড় আসে, এবং এই অবস্থায়ই তাদের পারিবারিক জীবন চলে। তদুপরি নারীশ্রমিক ও শিশুশ্রমিকদের সংখ্যা তো বেড়েই চলেছে, বিশেষ করে সুতাকলে হাজার হাজার তাঁত ও মাকু চালাবার কাজে তাদের সবচেয়ে সস্তায় রাখা হয়ে থাকে। সেখানে কিন্তু আবার নারী ও শিশুদের পুরুষদের চেয়ে বেশি করে নিয়োগ করা হয়। দেখা যায় হয়তো স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা কারখানায় কাজে গেল, আর বাড়ির পুরুষ বেকার হয়ে ঘরে বসে থাকল ও ঘরের কাজ করল। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বরের শেষের দিকে কলমার-এ সুতাকল ও তার আনুসঙ্গিক কারখানায়

৮১০৯ শ্রমিক নিয়োগ করা হয়েছিল। তার মধ্যে নারী ৩৫০৯ জন, পুরুষ ৩৪১৬ জন, ও শিশু ১১৮৪ জন। অর্থাৎ নারী ও শিশু মিলে মোট ৪৬৯৩, আর পুরুষ ৩৪১৬ জন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সুতাকলে ৪,৭৯,৫১৫ জন শ্রমিকের মধ্যে ২৫,৮,৬৬৭ জন বা শতকরা ৫৪ ভাগ ছিল নারী, ৩৮,৫৫৮ জন বা শতকরা ৮ জন ছিল ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়সের ছেলে মেয়ে এবং ১৮,৬৬,৯০০ বা শতকরা ১৪ জন ছিল ১৩ বছরের কম বয়সের ছেলে মেয়ে, আর কেবলমাত্র ১১৫,৩৯৪ জন বা শতকরা ২৩ জন ছিল পুরুষ শ্রমিক। এদের পারিবারিক জীবনই বা কি ধরনের হতে পারে?

আমাদের খ্রীষ্টান রাষ্ট্রের খ্রীষ্টানত্ব আসলে কাজের বেলায় না লেগে অকাজেই বেশি লেগে থাকে। খ্রীষ্টান রাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্টান বুর্জোয়াদের মতই কাজ করে। আর যারা জানে না যে খ্রীষ্টান রাষ্ট্র হল খ্রীষ্টান বুর্জোয়াদের কর্মচারী বিশেষ তারা এতে মোটেই অবাক হবে না এরা যে শুধু নারীদের কর্মে নিয়োগের বিষয়ে উচিত মতো আইনকানুন করে না তাই নয়, এরা এমনকি এদের নিজেদের চাকুরেদের বেলাও স্বাভাবিক কাজের সময় বেঁধে দেওয়ার বা রবিবারের ছুটির ব্যবস্থাও করে না। তাতে তাদের পারিবারিক জীবন ব্যাহত হয়ে থাকে। পোস্ট আপিস, রেলওয়ে ও জেলখানার কর্মীদের প্রায়ই অধিক সময় খাটতে হয়, মাইনের বেলায় হয় ঠিক উল্টোটা। কিন্তু আজকাল সর্বত্রই এ জিনিস চলে আসছে, আর অধিকাংশ লোক এটাকেই স্বভাবিক বলে ধরে নেয়।

আবার বাসস্থানের ব্যাপারে দেখা যায় যে বাড়ি ভাড়া অত্যধিক হওয়ার দরুন স্বল্প আয়ের ও নিম্ন আয়ের চাকুরেরা খুবই অল্প জায়গার মধ্যে থাকতে বাধ্য হয়। অনেক সময় যুবক-যুবতীদের একসঙ্গেই থাকতে হয়। স্বল্প জায়গায় বুড়ো যুব সব বয়সের মানুষ ঠাসাঠাসি করে থাকে, নারী পুরুষ আলাদা জায়গায় থাকবার বা ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা করে সভ্যভাবে থাকবার কোনো উপায় নেই। আর যে শিশুরা কারখানায় কাজ করে তাদের উপরই বা কি প্রভাব পড়ে? নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তাদের শারীরিক ও নৈতিক জীবনের খুবই ক্ষতি হয়ে থাকে। নারীরা যতই বেশি সংখ্যায় রোজগারের কাজে যেতে থাকে, বিশেষ করে তাদের সন্তান সম্ভাবনার সময় এবং সন্তান হবার পর, যখন শিশুরা মায়ের বুকের দুধ খায়, তখন মায়েরা কাজে গেলে শিশুদের খুবই ক্ষতি হয়, অন্তঃসত্ত্বা নারী কারখানায় কাজ করবার সময় দুর্ঘটনায় পড়লে তার নিজের এবং তার গর্ভের শিশুর পক্ষে খুবই বিপজ্জনক হয়, ফলে গর্ভের সন্তান নষ্ট হয়ে যেতে পারে, সময়ের আগেই হয়ে যেতে পারে, বা মরা শিশুও জন্মাতে পারে। সন্তান হবার পর যত তাড়াতাড়ি পারে মাকে কাজে ফিরে যেতে হয়, নইলে হয়তো প্রতিযোগীদের মধ্যে অন্য কেউ তার কাজটা নিয়ে নেবে। তার

অনিবার্য ফল এই হয়ে থাকে যে শিশুদের অযত্ন হয়, খাওয়া দাওয়া ঠিক হয় না, ধীরে ধীরে অনাহার শুরু হয়ে যায়। আফিম খাইয়ে শিশুদের শান্ত করে রাখা হয়। তার ফলেই হয় অসংখ্য মৃত্যু, একটানা ব্যাধি, অপুষ্ট শরীর— জাতির অধঃপতন হতে থাকে। অসংখ্য ক্ষেত্রে বাপ মায়ের কোনো স্নেহ ছাড়াই শিশুরা বড় হয়ে থাকে, আর মা বাপরাও সন্তানদের ভালবাসা যে কি জিনিস তা জানতে পারে না। এই ভাবেই সর্বহারারা জন্মায়, জীবন ধারণ করে, আর মরে। আর খ্রীষ্টান রাষ্ট্র ও খ্রীষ্টান সমাজ কি না এত নিষ্ঠুরতা, নীতিহীনতা দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়।

পূর্বে আমেরিকার দাসযুদ্ধের সময় ইংরাজদের সুতাকলগুলিতে বহু নারী শ্রমিকের কাজ চলে যায়। ডাক্তাররা তখন একটা উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার করে দেখালেন যে সে সময় যদিও জনসংখ্যা অত্যন্ত বেশি হ্রাস হয়েছে তবুও শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। তার কারণ বোঝা সহজ। যখন সুসময় ছিল তার চেয়ে এই সময় শিশুদের দেখাশোনার, খাওয়ানোর যত্ন হয়েছে বেশি। আরো কয়েক বৎসর পর পূর্ব আমেরিকায় নিউইয়র্ক ও ম্যাসাচুসেট্ অতি-সরবরাহ হয়েছিল তখনো কি এই জিনিসই দেখা গিয়েছে! কাজ না থাকার দরুন নারীরা তখন ঘরে থাকতে বাধ্য হয় শিশুদের দেখাশোনা করবার জন্য সময় দিতে পারে।

গৃহশিল্পের ক্ষেত্রেও পারিবারিক ও নৈতিক অবস্থা এর চেয়ে এক তিলও উন্নত নয়, যদিও রোমান্টিক তাত্ত্বিকরা গৃহশিল্প সম্বন্ধে খুব উচ্ছ্বসিত চিত্র এঁকে থাকে। সেখানে স্বামী স্ত্রী উভয়েই সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাজের মধ্যে আটকা পড়ে থাকে, আর তাদের সন্তানরাও অতি শৈশব থেকে সেই কাজের জন্য তৈরী হতে থাকে। মা বাপ ছেলে মেয়ে যুবক যুবতী সবাই অতি ছোট ধুলোময়লা আবর্জনায় ভরা, অস্বাস্থ্যকর, নোংরা আলোবাতাসবর্জিত জায়গায় ঠাসাঠাসি করে থাকে। তাদের শোবার বসবার জায়গা আর কারখানা বলতে ঐ একই জায়গা। তাকে আলোবাতাসহীন গুহাই বলা চলে, তার মধ্যে থাকে এক-রাশ লোক। সংক্ষেপে বলতে গেলে তাদের চেয়ে একটু ভাল অবস্থায় যারা থাকে তারাই ওদের এমন পশুর মতন দিন যাপনের অবস্থা দেখলে শিউরে উঠবে।

দিনে দিনে জীবন সংগ্রাম এত তীব্র হয়ে উঠছে যে মানুষ আগে যা কখনো ভাবতে পারত না, তেমন কাজ করে নিজেদের হেয় করে ফেলছে। যেমন, ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে পুলিসের খাতায় নাম লেখা পতিতাদের মধ্যে অন্ততঃ ২০৩ জন ছিল দিন মজুর ও মিস্ত্রীর স্ত্রী। আর পুলিসের চোখের আড়ালে যে কত বিবাহিতা নারী এই চরম অপমানজনক জঘন্য ব্যবসার কাজ করে থাকে তার ঠিক নাই।

আমরা অভিজ্ঞতা থেকেই দেখতে পাই যে কোনো একটি বছরেই শস্যের দাম

বাড়লে বিবাহ ও জন্মসংখ্যা হ্রাস পায়। আর বহু বছর ধরে যদি মানুষের দুরবস্থা চলতে থাকে, বিশেষ করে যা কিনা আমাদের বর্তমান সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, তাহলে তার ফল তো আরো খারাপ হবেই। জার্মান সাম্রাজ্যের মধ্যে বিবাহের হিসাব থেকে একথা খুব স্পষ্ট বোঝা যায়। ১৮৭২ সাল ছিল সেখানকার উন্নতির বছর। সে বছর মোট বিবাহের সংখ্যা ছিল ৪,২৩,৯০০। ১৮৭৯ সালে যখন আতঙ্ক চরমে পৌঁছল, তখন বিবাহের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩,৩৫,১৩৩। বিবাহের সংখ্যা শতকরা ২৫ ভাগ কমে গিয়েছিল, আর যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় হিসাব করি তবে শতকরা ৩৩ ভাগ কমে গিয়েছিল। ১৮৭৬-৭৯ মন্দার বছরগুলির মধ্যে প্রাশিয়াতে বিবাহের সংখ্যা প্রতিবছর কমতে থাকল।

১৮৭৬ সালে বিবাহের সংখ্যা :				২,২৪,৭৭৩
১৮৭৭	,,	,,	,,	২,১০,৩৫৭
১৮৭৮	,,	,,	,,	২,০৭,৭৫৪
১৮৭৯	,,	,,	,,	২,০৬,৭৫২

শিশুদের সংখ্যাও অনেক কমে যায়। শিশুদের মানুষ করে তুলবার মতো সংস্থান না থাকার দরুন, তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারবে না এই আশঙ্কার দরুন সমস্ত শ্রেণীর নারীরাই এমন সব কাজ করে যা তাদের প্রকৃতির বিরুদ্ধে, এমন কি আইনেরও বিরুদ্ধে তারা সন্তান নিরোধ করতে নানা রকম উপায় অবলম্বন করত এবং প্রাণহত্যাও করে। একথা মনে করা ভুল হবে যে এসব কাজ শুধু ছ্যাবলা বেপরোয়া মেয়েরাই করে থাকে, বরং খুবই সচেতন নারীরা পর্যন্ত এ রকম বিপজ্জনক কৃত্রিম উপায়ে ভ্রূণহত্যার পথ বেছে নেয়, কারণ তা না হলে তাদের স্বামীদের যৌন কামনা পরিতৃপ্ত করতে পারে না। নিজেদের যৌন প্রেরণা জোর করে দমন করতে হয়। অথবা তাদের এ ভয়ও থাকে যে স্বামীরা যদি স্ত্রীদের সঙ্গ না পায় তবে তারা ফুর্তি করতে বাইরে চলে যাবে—যা কিনা হামেশাই হয়ে থাকে। অন্যদিকে বিশেষ করে উচ্চশ্রেণীর মধ্যে এমন অনেক মহিলা আছে যারা এসব অপরাধ করতে পিছপা হয় না। তারা নিজেদের "দোষ" ঢাকবার জন্য মোটা টাকার ডাক্তার ও ধাত্রীদের সাহায্য পেয়ে থাকে, অথবা তারা গর্ভধারণ করার, সন্তান প্রসব করার, তাদের মানুষ করার ঝামেলা পোহাতে চায় না বলেও করে, আবার সন্তান হলে তাদের দেহসৌষ্ঠব নষ্ট হয়ে যাবে, তাদের স্বামীদের বা অপর পুরুষদের মনোহরণ করতে পারবে না সেই ভয়েও করে। ১৮৭৮ সালের বসন্তকালে নিউ ইয়র্কের একটা উদাহরণ দেখা যাক। সেখানে এক মহিলা আত্মহত্যা করল। তার এক মস্ত বড় বিলাস বহুল বাড়ি ছিল।

সেখানে সে পুলিস ও আদালতের চোখের সামনে একপুরুষেরও অধিককাল ধরে তার নির্লজ্জ ব্যবসা চালিয়েছে। অবশেষে নিয়তি তাকে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিল। বিলাসবহুল জীবন যাপন করেও সে প্রায় দেড় মিলিয়ন ডলার (১৫ লক্ষ টাকা) সম্পত্তি রেখে গিয়েছিল। তার মক্কেলরা সব ছিল নিউ ইয়র্কের সব-চেয়ে ধনী লোকদের দল।

দৈনিক পত্রিকাগুলিতে ঘন ঘন বিজ্ঞাপন দেখে বোঝা যায় যে বিবাহিত ও অবিবাহিত নারীদের এসব বিষয়ে সাহায্য করবার জন্য অনেক প্রতিষ্ঠান তৈরি হচ্ছে।

নিজেদের অবস্থা ও মানুষ করবার সংগতির চেয়ে বেশি ছেলেপুলে হবার আতংকে সর্বশ্রেণীর মধ্যে জন্মনিরোধের হিড়িক এত বেড়ে গেছে যে তা একটা সাধারণ বিপদের সীমায় পৌঁছে গেছে।

একথা সুবিদিত যে ফরাসী সমাজের সর্বস্তরের মধ্যে দুই-সন্তান-নীতি প্রচলিত আছে। পৃথিবীর অন্য কোনো সভ্য দেশেই ফরাসী দেশের মতো বিবাহের সংখ্যা এত অধিক নয়। শিশুদের গড়পড়তা সংখ্যাও এত কম নয়, বা জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতিও এত মন্থর নয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপারে ফরাসী দেশ এমনকি রাশিয়ার থেকেও পিছিয়ে আছে। ফরাসীর উচ্চ এবং মধ্য শ্রেণীর বুর্জোয়ারা এবং সম্পন্ন চাষীরা এই পথ নিয়েছে, আর ফরাসী শ্রমজীবীরা তাদের অনুসরণ করে।

ট্রানসিলভানিয়ার স্যাকসন কলোনীতে ঠিক একই জিনিস দেখা যায়। ট্রান-সিলভানিয়ার জার্মানরা তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা বজায় রাখার উপায় হিসাবেই বিরাট সম্পত্তির অধিকারী থাকতে চায়, তাদের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সেই সম্পত্তি যাতে অযথা নানা ভাগে বিভক্ত না হয়ে যায় তার চেষ্টা করে। তাই তারা চেষ্টা করে যাতে তাদের "বৈধ" সন্তানের সংখ্যা কম থাকে। অপরদিকে, পুরুষরা স্ত্রী ছাড়া অন্য নারীর সংসর্গে তাদের যৌন কামনা চরিতার্থ করতে অভ্যস্ত। তার থেকেই জাতিবিজ্ঞানের একটা অদ্ভুত জিনিস হিসাবে কটাচুল যাযাবরের দল আর জার্মানদের মতন রুমানিয়ানদের দেখা যায়। কখনো কখনো এদের স্বভাবের মধ্যে কঠিন পরিশ্রম, মিতব্যয় প্রভৃতি এমন কতকগুলি গুণ দেখা যায় যা কোনোমতেই তাদের নিজেদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য নয়। ধন্য ওদের এই নীতি! এর জন্যই ট্রানসভালের স্যাকসন জনসংখ্যা এখন পর্যন্ত মাত্র ২,০০,০০০, যদিও ওরা অনেকেই ১২শ শতাব্দী থেকে এই অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করেছে। আর ফরাসীর বেলায় দেখা যায় যে সেখানে যৌনজীবনের উপর শোষণ করবার মতো কোনো বিদেশী শক্তি নাই। সেখানে নবজাত শিশুহত্যা, শিশুকে পরিত্যাগ করে যাওয়ার দৃষ্টান্ত বেড়েই চলেছে। আর তার পিছনে রয়েছে ফরাসী আইনের

ফাঁকগুলি যা মদত যোগায়। সেখানে পিতৃপরিচয়* জানতে চাওয়াটা বেআইনী, কিন্তু মাতৃপরিচয় জানতে চাওয়াটা আইন সম্মত।

পরিত্যক্ত নারীরা তাদের সন্তানদের জন্য যাতে ভরণপোষণের দাবি নিয়ে শিশুর পিতার কাছে না আসতে পারে ফরাসী বুর্জোয়ারা তা আইন করে ঠেকিয়ে রাখে, আর এযে কতদূর নিষ্ঠুর কাজ তাও তারা বেশ জানে। তাই তারা এ অবস্থার একটু সুরাহা করবার জন্য পরিত্যক্ত শিশুদের জন্য অনাথ আশ্রম করে দেয়। আর আমরা এও জানি যে আমাদের নিরপেক্ষ নীতিবোধ অনুযায়ী অবৈধ সন্তানদের প্রতি কোনো অপত্য স্নেহ থাকার নিয়ম নাই, অপত্য স্নেহ শুধু বৈধ "উত্তরাধিকারীদের" প্রতিই থাকতে পারে। অনাথ আশ্রমগুলিতে নবজাতক শিশুদের তাদের মায়েদের কাছ থেকেও ছিনিয়ে নিয়ে আসা যায়। তারা এ দুনিয়াতে পিতৃমাতৃহীন অনাথ হয়েই আসে। বুর্জোয়ারা তাদের অবৈধ সন্তানদের রাষ্ট্রের খরচে, দেশের সন্তান হিসেবে মানুষ করে। কিবা চমৎকার প্রতিষ্ঠান! তবুও, এসব আশ্রম থাকা সত্ত্বেও, সেখানে অযত্নে দলে দলে শিশুরা মারা যায়। ফ্রান্সে শিশুহত্যা ও ভ্রূণহত্যা জনসংখ্যার তুলনায় অত্যধিক বেড়ে যাচ্ছে।

১৮৩৩ সাল থেকে ১৮৮০ সালের মধ্যে ৮৫৬৩টি শিশুহত্যার মামলা ফরাসী জুরির সামনে বিচারের জন্য তোলা হয়েছিল। ১৮৩১ সালে ছিল ৪৭১টি এবং ১৮৮০ সালে ছিল ৯৮০টি। ঐ একই সময়ের মধ্যে ভ্রূণহত্যার জন্য ১০৩২ জন নারীকে সাজা দেওয়া হয়েছিল। ১৮৩১ সালে ৪১ জনেরও বেশি, ১৮৮০ সালে ১০০ জনেরও বেশি নারীকে সাজা দেওয়া হয়। অবশ্য যত ভ্রূণহত্যা হয়ে থাকে তার অতি অল্প শতাংশই আইনের বিচারের সামনে আসে, কারণ নেহাত অসুস্থ হয়ে না পড়লে বা মৃত্যু না ঘটলে প্রকাশ্য বিচারের সামনে আসে না। শতকরা ৭৫টি ভ্রূণহত্যা হয় গ্রামাঞ্চলে এবং শতকরা ৬৭টি হয় শহরাঞ্চলে। শহরের নারীরা জন্মনিরোধ করবার অনেক সুযোগ সুবিধা পেতে পারে। তাই সেখান ভ্রূণ-হত্যার সংখ্যা ও শিশুহত্যার সংখ্যা কম। আর গ্রামাঞ্চলের বেলায় ঠিক তার উল্টো হয়ে থাকে।

আজকালকার দিনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিবাহের চিত্র হল এই। এই চিত্র কবি কল্পনার থেকে অনেক তফাৎ। কিন্তু এই চিত্রই প্রকৃত সত্য।

কিন্তু এ চিত্র অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি আমি আর কয়েকটি বিষয় উল্লেখ না করি।

নারী পুরুষের মানসিক শক্তির বিষয়ে যত মতবিরোধই থাকুক না কেন—যে

---

* অনুচ্ছেদ ৩৪০, সিভিল কোডে লেখা আছে: পিতার পরিচয় জানতে চাওয়া আইনত: নিষিদ্ধ এবং অনুচ্ছেদ ৩৪১-এ লেখা আছে: মাতার পরিচয় জানতে চাওয়া আইন সম্মত। ৩৪০ অনুচ্ছেদটি তুলে দেবার জন্য এ পর্যন্ত সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে।

বিষয়ে পরে আবার উল্লেখ করা যাবে—এ কথা সবাই স্বীকার করবে যে বর্তমানে গড়পড়তা হিসাবে নারীরা পুরুষদের চেয়ে পিছিয়ে আছে। একথা ঠিক যে ব্যালজ্যাক, যাঁকে কিনা কোনোমতেই নারীদরদী বলা যায় না, জোরের সঙ্গে বলেছেন: "পুরুষদের মতো শিক্ষা পেলে নারীরা তাদের গুণাবলীকে চমৎকারভাবে বিকশিত করে স্বামীদের এবং নিজেদের জীবন সুখী করে তুলতে পারে।" আর গ্যেটে, যিনি কিনা তাঁর সময়ের সুপণ্ডিত বিচারক ছিলেন, তিনি তাঁর "কনফেশনস অব বিউটিফুল সোল" (Wilhelm Mesiters Lehrjahre) গ্রন্থে তীব্র ব্যাঙ্গের সঙ্গে মন্তব্য করেছেন: "লোকে শিক্ষিত নারীদের বিদ্রূপ করে থাকে, এমন কি যে নারীরা বেশ জানে বোঝে তাদের অপছন্দও করে। তার কারণ বোধ হয় এই যে মেয়েদের বেশি জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞ পুরুষদের লজ্জার মধ্যে ফেললে সৌষ্ঠব নষ্ট হয়।" কিন্তু এসব বক্তব্য থেকে একথা অস্বীকার করা যায় না যে বর্তমানে পুরুষদের চেয়ে নারীরা পিছিয়ে আছে। পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে তফাৎ আছে তা অস্বীকার করা যায় না, আর সে তফাৎ থাকবেই। কারণ পুরুষরা হল নারীদের প্রভু। প্রভুরা তাদের যেমন তৈরি করেছে, নারীরা তেমনিই হয়েছে। সাধারণভাবে শিক্ষার ব্যাপারে নারীদের সর্বহারাদের চেয়েও অবহেলা করা হয়। তাদের জন্য যা কিছু শিক্ষার উন্নতি করা হয় তাও প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য। আমরা যে যুগে বাস করছি সে সময়ে পরিবারের মধ্যে ও বাইরে ভাবনা চিন্তার আদান প্রদানের প্রয়োজনের কথা সবাই স্বীকার করে। পেছিয়ে থাকা নারীর সঙ্গে সেই আদান প্রদান সম্ভব হয় না বলে স্বামীরই অসুবিধা হয় সবচেয়ে বেশি।

পুরুষদের যে শিক্ষা দেওয়া হয় তার দ্বারা তাদের বোধশক্তি বাড়ে, চিন্তাশক্তি ধারালো হয়, জ্ঞান বাড়ে, তারা বৈজ্ঞানিক তথ্য ও পদ্ধতি জানতে পারে, সংক্ষেপে বলতে গেলে, তাদের মানসিক কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। আর নারীদের যদিও বা কোনো শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে তাদের এমন শিক্ষা দেওয়া হয় যাতে তাদের বাইরের অনুভূতির দিকটা ও সপ্রতিভ ভাবটা বাড়তে পারে। ফলে তারা খুব ভাবপ্রবণ, নার্ভাস হয়ে পড়ে। তাদের কল্পনাশক্তি বাড়ার ফলে গান বাজনা, হাল্কা কাব্যসাহিত্য, শিল্পকলার সৃষ্টি করতে পারে। এ জিনিস খুব ক্ষতিকর, এর থেকেই বোঝা যায় যে নারীদের শিক্ষা কতটা হবে এবং কি ধরনের হবে তা যারা ঠিক করে তাদের মনের মধ্যে নারীদের চরিত্র সম্বন্ধে এবং তাদের চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ জীবন সম্বন্ধে বদ্ধমূল ধারণা রয়েছে। আমাদের মেয়েদের জন্য যা প্রয়োজন তা তাদের অনুভূতি, কল্পনা ও উপর উপর শিল্পসাহিত্যের জ্ঞানের চর্চা নয়। এ সবের সঙ্গে তাদের পরিচয়ের ভালমন্দ দেখা হয়ে গেছে। স্ত্রীশিক্ষার মাধ্যমে শুধু তাদের অনুভূতিকে বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে। উপর

উপর অনুভূতির চর্চা না করে যাতে আমাদের নারীদের বুদ্ধি ও যুক্তিশক্তি বাড়ে, ভীরুতা ও স্নায়বিক দুর্বলতার বদলে শারীরিক সাহস ও স্নায়ুর জোর বাড়ে, দুনিয়া সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান হয়, দুনিয়ার মানুষ সম্বন্ধে ও প্রকৃতির শক্তি সম্বন্ধে কিছু জানতে পারে যদি এ রকম শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে নারী পুরুষ উভয়ের পক্ষেই ভাল হয়।

সাধারণভাবে নারীদের হৃদয়বৃত্তি ও কল্পনাশক্তির অত্যধিক চর্চা করা হয় এবং অপরদিকে তাদের যুক্তি দিয়ে বুঝবার শক্তির চর্চাকে চেপে রাখা হয় বা অবহেলা করা হয়, আর এই অত্যধিক হৃদয় দৌর্বল্য থাকার দরুনই তারা নানা কুসংস্কার ও প্রতারণার ফাঁদে পড়ে। নারীরাই সর্বরকম ধর্মীয় কুসংস্কার ও হাতুড়ে বৈদ্যদের শিকার হয়ে থাকে, আর স্বেচ্ছায় সব রকমের প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতের যন্ত্র হয়ে কাজ করে। স্বল্পদৃষ্টি সম্পন্ন সংকীর্ণমনা পুরুষরা এজন্য দুঃখ করে থাকে, কিন্তু যে কারণে নারীরা এরকম হয় তা দূর করবার জন্য কিছুই করে না, কারণ তারা নিজেরাও সংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

নারীদের মধ্যে অধিকাংশই উক্ত ধরনের হয়ে থাকে। ফলে তারা দুনিয়াটাকে পুরুষদের থেকে পৃথক দৃষ্টি দিয়ে দেখে। অতঃপর নারী পুরুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব চিরদিন লেগেই থাকে।

বর্তমান যুগে প্রত্যেকটি মানুষের পক্ষেই বাইরের জনসাধারণের কাজের মধ্যে অংশ গ্রহণ করার খুবই প্রয়োজন, যদিও অনেকেই সে কথা অনুধাবন করে না। ক্রমশঃই অধিক সংখ্যক মানুষ বুঝতে পারছে যে তাদের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে বাইরের জনপ্রতিষ্ঠানগুলির গভীর সংযোগ রয়েছে। লোকে ক্রমশই বুঝতে পারছে যে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের ভালমন্দ ব্যক্তিগত গুণাবলী ও কার্যকলাপের চেয়ে সাধারণ জনগণের অবস্থা ও সংগঠনের উপর অনেক বেশি নির্ভর করে। বাইরের পরিবেশ খারাপ হলে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে যায়। ব্যক্তিগত অবস্থাও খারাপ হয়ে যায়। অন্যদিকে জীবন সংগ্রাম তীব্রতর হচ্ছে। বাইরে এবং ঘরে দুদিকের দায়িত্ব ক্রমশঃ ক্রমশঃ বাড়তে থাকলে পুরুষ বাইরের কাজে বেশি সময় দিতে থাকে। স্ত্রীর জন্য বেশি সময় দিতে পারে না। কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষার ত্রুটির জন্য স্ত্রী তার স্বামীর বাইরের কাজটাকে নিছক বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া, টাকা ওড়ানো, স্বাস্থ্য নষ্ট করা বলে মনে করে, যার ফলে স্ত্রীকেই ঝামেলায় পড়তে হয়। এইভাবে গৃহবিবাদ শুরু হয়। স্বামীকে বলা হয় বাইরের কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে ঘরের দিকে মন দিতে। তা সে মেনে নিতে পারে না। তার বাইরের কাজও যে তার নিজের ও পরিবারের জন্য প্রয়োজন তা বোঝে। সে যদি তার স্ত্রীকে সেকথা বুঝিয়ে সুঝিয়ে মানিয়ে নিতে পারে, তবে তো সে তার বিপদের পাহাড় উত্তীর্ণ হয়ে গেল। কিন্তু সে রকম খুব কমই হয়ে

থাকে। পুরুষ সাধারণত মনে করে যে তার স্ত্রী তার ব্যাপার কিছু বুঝবে না, তা নিয়ে তার মাথা ঘামাবারও দরকার নাই। স্ত্রীকে সে সব বোঝাবার জন্য সে চেষ্টাও করে না। স্ত্রী যখন স্বামী তাকে এত অবহেলা করছে কেন মনে ভেবে অনুযোগ করতে যায় তখন স্বামী গতানুগতিকভাবে জবাব দেয় ঃ "ওসব তুমি বুঝবে না"। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষদের দোষে নারীদের অজ্ঞতা আরো বাড়ে। আর স্ত্রী যদি বুঝতে পারে যে স্বামী তাকে এড়াবার জন্য কৌশল অবলম্বন করেছে তবে তো পারিবারিক কলহ আরো বেড়ে যায়। স্বামীর আনন্দফূর্তির প্রয়োজন যেমনই হোক তা তার বাড়িতে আর হতে পারে না।

নারী পুরুষের শিক্ষা দীক্ষা ও মতামতের এই পার্থক্যগুলি তাদের বিবাহের সময় কেউ ভেবেও দেখে না। অল্প বয়সের আবেগের মধ্যেও সেগুলি খুব বেশি ধরা পড়ে না। তাদের যেমন বয়স বাড়তে থাকে, তাদের যৌন আবেগ স্তিমিত হয়ে আসে, আর মানসিক ঐক্যের প্রয়োজন বেশি হয়, তখনই তাদের ভাবনা চিন্তার পার্থক্যগুলি সবচেয়ে পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে।

পুরুষ যদি তার নাগরিক কর্তব্যের কথা না বোঝে বা তার কাজ না করে, তার জীবিকার কাজ, ও বাইরের জগতের সংগে তার মেলামেশার মাধ্যমে সে বিভিন্ন ধরনের লোকের সংগে মেশবার ও বিভিন্ন মতামতের সংগে পরিচিত হবার হাজারো সুযোগ পেয়ে থাকে। আর তার ফলে অনায়াসেই তার মানসিক জগৎ প্রসারিত হতে পারে। এইভাবে সে নিজেকে অনবরত পরিবর্তিত করতে পারে। কিন্তু স্ত্রী তার ঘরকন্নার কাজের মধ্যে আটকে পড়ে থাকে, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সেখানেই তার সময় কাটে, তার মানসিক উৎকর্ষের জন্য কোন অবকাশই তার নেই। এমনিভাবেই সংসারের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে তাদের জীবনটা ছিন্নভিন্ন নিষ্পিষ্ট হয়ে যায়।

গারহার্ড ভন এ্যামিনটর (Samuel Lucas Elberfeld)-এর Randglossen zum Buche des Lebens (Marginal notes to the book of life) বইয়ে অধিকাংশ স্ত্রীদের জীবন যেভাবে কাটে তার একটি সুন্দর বর্ণনা আছে। অন্যান্য বিষয় ছাড়াও লেখক Fatal Gnat bites (মারাত্মক মশার কামড় অনুচ্ছেদে লিখেছেন ঃ

"অনেক নারীর জীবনেই স্বামী হারানোর দুঃখ আছে, স্নেহের সন্তানের অধঃপতনের দুঃখ আছে। নিদারুণ রোগযন্ত্রণা আছে। আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হওয়ার বেদনা আছে কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা-যা কিনা প্রত্যেক নারীর ক্ষেত্রেই খাটে তুচ্ছ ক্ষুদ্র ঘরকন্নায় প্রতিনিয়ত তাদের জীবনীশক্তি শুষে নেয়, তাদের হাড়-মাস কুরে কুরে খায়।…কত হাজার হাজার ঘরকন্নার কাজে আবদ্ধ মায়েরা তাদের জীবনীশক্তি নিঃশেষ করে দিয়েছে, তাদের জীবন যৌবন শুকিয়ে গেছে ঘরকন্নার

মধ্যে নিষ্পিষ্ট হয়ে হয়ে, তারা অস্থিচর্মসার, কঙ্কালে পরিণত হয়েছে। চিরকালের প্রয়োজন ঃ "আজ খাবার কি কি হবে"। সেই দৈনন্দিন ঘর ঝাঁট দাও, বাসন মাজো,—তিল তিল করে অনিবার্যভাবেই নারীদের শরীর মন ক্ষয় করে দেয়। রান্নাঘরের আগুনের জ্বালের মধ্যেই মর্মান্তিক দেনাপাওনার হিসাব করা হয়ে থাকে, সেখানেই খাবার জিনিসের সমস্যা, মূল্যবৃদ্ধি, প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাবের সমস্যা তীব্র হয়ে দেখা দেয়। রান্নাঘরের উনুনের অগ্নিশিখার বেদী-মূলেই বলি দেওয়া হয়ে থাকে তাদের যৌবনের রূপ রস আনন্দ। সেই বয়সের ভারে নুয়ে পড়া, জরাজীর্ণ, কোটরগত চক্ষু রাঁধুনীর মধ্যে তখন একদিনের সেই উদ্‌ভিন্নযৌবনা, দীপ্তিময়ী, প্রেমের অভিনয়ে মধুর, ফুলের মুকুট পরা নববধূকে আর চেনাই যায় না।

"প্রাচীনকালে ঘরসংসারকে পবিত্র জিনিস মনে করে সেখানে গৃহদেবতার প্রতিষ্ঠা করা হত। আমাদের ঘরসংসারও পবিত্র। সেখানে কর্তব্যরত জার্মান স্ত্রীরা সংসারকে আরামপ্রদ করে তুলবার জন্য, সকলের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা, দেখা-শোনার জন্য ধীরে ধীরে আত্মত্যাগ করে মৃত্যুবরণ করে থাকে"।

এই হল নারীদের জন্য বুর্জোয়াদের বিধিব্যবস্থা।

আর যাদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা কিছু ভাল, যারা কিছু স্বাধীনতা পেতে পারে, তাদের জন্য ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে ভুয়ো, একপেশে, বংশানুক্রমে নারীচরিত্রের বৈশিষ্ট সম্বন্ধে যে ধারণা চলে আসছে তারই উপর ভিত্তি করে কিছু কিছু শিক্ষার। তার ফল হয় সবচেয়ে ক্ষতিকর। সেই মেয়েরা কোনো জিনিসের ভিতরে প্রবেশ করে না, শুধু বাইরের শোভা, পোশাক পরিচ্ছদ, অলঙ্কার নিয়ে মাথা ঘামায়, বদরুচি আর উচ্ছৃংখল প্রবৃত্তির চর্চা করে থাকে। তারা তাদের নিজেদের শিশুদের শিক্ষার দিকেও ফিরে তাকায় না। তাদের তারা নার্স, ঝি চাকরদের উপর ফেলে রেখে দেয়, আর তারপর পাঠিয়ে দেয় বোর্ডিং স্কুলে।

আমরা দেখতে পাই যে নানা রকমের বহু কারণ থাকে যাতে বিবাহ সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়, কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই তা সম্পূর্ণ বাতিল হয়ে যায় না। এ রকম কত-শত উদাহরণ আছে তার হিসাব নিকাশ নাই, কারণ প্রত্যেক বিবাহিত দম্পতিই চায় তাদের ভিতরের ব্যাপারের উপর একটা আবরণ দিয়ে রাখতে। আর সাধারণ-ভাবে, বিশেষতঃ উচ্চশ্রেণীর মধ্যে এ ব্যাপারে তারা দারুণভাবে সফল হয়েও থাকে।

বর্তমান যুগে নারীর অবস্থা

বিবাহের ক্ষেত্রে অধিকতর বাধা বিঘ্ন—নারী পুরুষের আনুপাতিক হার—তার কারণ ও ফল

পূর্বে বর্ণিত পরিস্থিতির মধ্যে নারীদের চরিত্রে গুণগুলির সঙ্গে সঙ্গে অনেক দোষ দেখা দিয়েছে, আর সেগুলি বংশ পরম্পরায় ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। পুরুষরা নারীদের সেই দোষগুলির উপরই জোর দিয়ে থাকে, আর ভুলে যায় যে সেগুলিও পুরুষরাই গড়ে তুলেছে। যেমন বলা যায় মেয়েদের বক বক করা, গালগল্প করার স্বভাব, তুচ্ছ বাজে জিনিস নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করে যাওয়া, শুধু বাইরের জিনিস, যেমন সাজ পোশাক করা, লোকের মন ভুলানোর চেষ্টা করা, অন্য মেয়েদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে ওঠা—এই সব দোষ তাদের স্বভাবে গড়ে উঠেছে।

সর্বত্রই নারীদের স্বভাবের মধ্যে কম বেশি এসব দোষ দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু এ দোষগুলি খুব অল্প বয়স থেকেই তাদের স্বভাবে দেখা যায়। তাই এগুলিকে জন্মগত ও শিক্ষাগত দোষ বলে ধরে নিতে হবে। কোনো মায়ের যদি নিজের শিক্ষা ভাল না হয়, তবে তার সন্তানদেরও ভাল শিক্ষা দিতে পারে না।

নারী পুরুষের মধ্যে বিশেষ দোষ গুণের মূল কারণ ও তার ক্রমবিকাশের কথা বুঝতে হলে প্রাণী জগতের বিভিন্ন বর্গের মধ্যেকার বৈশিষ্ট্যগুলি বুঝবার জন্য যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়ে থাকে, সেই পদ্ধতিই গ্রহণ করতে হবে। সেই পদ্ধতির আবিষ্কারকের নাম অনুযায়ী তাকে ডারউইনের পদ্ধতিই বলা হয়। এই পদ্ধতি বাস্তব অবস্থা, উত্তরাধিকার ও প্রতিপালনের উপর, অর্থাৎ যেভাবে সেই প্রণালীকে পালন করা হয় ও শিক্ষা দেওয়া হয় তার উপর ভিত্তি করেই হয়েছে।

প্রকৃতির অন্যান্য জীবের ক্ষেত্রে যে নিয়ম চলে থাকে, মানুষের বেলায় সেই নিয়মই চলে থাকে। মানুষ প্রকৃতির বাইরে নয়। শারীরিকভাবে মানুষ সব-চেয়ে উন্নত প্রাণী ছাড়া আর কিছুই নয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে এ কথাটা লোকে বোঝে না। হাজার হাজার বছর পূর্বে, যখন আধুনিক বিজ্ঞানের কিছুই ছিল না, তখনও কিন্তু লোকের ধ্যান ধারণা বেশ যুক্তিযুক্ত ছিল বলে দেখা যায়। তারা বাস্তবের সঙ্গে নিজেদের অভিজ্ঞতা মিলিয়ে নিত। অনেকেই গ্রীক নারী পুরুষদের মনোরম দেহসৌষ্ঠব ও শক্তির উচ্চ প্রশংসা করে থাকে। কিন্তু তারা

একথা ভুলে যায় যে সেখানকার নরনারীর দেহসৌষ্ঠব ও শক্তি কোনো অনুকূল আবহাওয়া বা সমুদ্র বেষ্টিত সুন্দর প্রকৃতির জন্য হয়নি, হয়েছে কারণ সেখানকার সমস্ত স্বাধীন নাগরিকদের জন্য রাষ্ট্র থেকে শারীরিক সৌন্দর্য, শক্তি, কর্মতৎপরতা ও তার সংগে সংগে মনের সম্প্রসারণ ও সূক্ষ্মতা অর্জনের জন্য শারীরিক ব্যায়াম, শিক্ষার* ব্যবস্থা ছিল। আর নারীদের বেলায় যদিও মানসিক উৎকর্ষের দিকটা অবহেলিত হত, শারীরিক শিক্ষার বেলায় তা হত না। যেমন, প্লেটো তাঁর "রিপাবলিক"-এ দাবি করেছেন যে নারীদের ও পুরুষদের মতো একই ভাবে মানুষ করতে হবে, এবং হুকুম দেন যে আদর্শ রাষ্ট্রের শাসকদের ডারউইনের প্রথামত খুব সতর্কভাবে নির্বাচিত করতে হবে। এর থেকে দেখা যায় যে তিনি মানুষের শারীরিক উৎকর্ষ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। এ্যারিস্টটল শিক্ষার নীতি বিষয়ে বলেছেন: "প্রথম প্রয়োজন শারীরিক শিক্ষার, তারপর, বোধশক্তির"। যেমন, স্পার্টাতে, যেখানে নারী পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই শারীরিক উৎকর্ষের দিকে সবচেয়ে জোর দেওয়া হয়েছে, ছেলেমেয়েরা বয়ঃসন্ধিকাল পর্যন্ত নগ্ন অবস্থাতেই থাকত এবং তাদের একসংগেই তাদের ব্যায়াম, খেলাধুলা, কুস্তি শেখানো হত।

নারী পুরুষদের নগ্ন চেহারা দেখা, স্বাভাবিক বিষয়কে স্বাভাবিক দৃষ্টি দিয়েই দেখা হত, তাতে আজকাল যেমন কৃত্রিম উপায়ে নারী পুরষদের মধ্যে বাল্যকাল থেকেই ব্যবধান সৃষ্টি করার ফলে যে যৌন উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, তা হত না। নারী পুরুষ উভয়ের শারীরিক অংগ প্রত্যংগ, তার ক্রিয়া কলাপ কিছুই কারও কাছে গোপন থাকত না। কোনো অস্বচ্ছতা ছিল না, স্বাভাবিক প্রকৃতি অকৃত্রিম ছিল। নারী পুরুষ উভয়ে উভয়ের সৌন্দর্য দেখে আনন্দিত হত। আর সেই স্বাভাবিক পথেই আমাদের মুক্তি পেতে হবে—নারী পুরুষদের মধ্যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্থাপন করতে হবে, আজকালকার আধ্যাত্মিক ধ্যানধারণাকে ছাড়তে হবে।

আজকাল অবশ্য নারীদের শিক্ষার বিষয়ে আমাদের চিন্তাধারা প্রাচীন গ্রীকদের চেয়ে অনেক তফাৎ। নারীদের যে শারীরিক শক্তি, সাহস, দৃঢ়তার প্রয়োজন আছে, এ ধারণাকে প্রচলিত রীতিনীতি বিরোধী ও নারীসুলভ নয় বলে মনে করা হয়ে থাকে। অথচ একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে ঐ গুণগুলি থাকলে নারীরা অনেক ছোট বড় ও অন্যান্য পীড়ন থেকে রক্ষা পেতে পারে। নারীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের পরিমাপও বোঝা যায়। সামাজিক

* যেমন, প্লেটো তাঁর "রিপাবলিক" এ বলেছেন যে নারীদেরও পুরুষদের মতো করেই পালন করতে হবে এবং হুকুম দিলেন যে আদর্শ রাষ্ট্রের শাসকদের ডারউইনের মতবাদ অনুযায়ী সযত্নে নিবাচিত করতে হবে; তার থেকে বোঝা যায় যে মানবজাতির বিকাশের ক্ষেত্রে সঠিক নির্বাচনের প্রয়োজন তিনি বুঝতেন। শিক্ষার নীতি হিসাবে এ্যারিস্টল বলেছেন; "প্রথম প্রয়োজন শারীরিক শিক্ষার, এবং তারপর বুদ্ধিবৃত্তির"।

জীবনে, বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বত্র ছেলে মেয়েদের জোর করে পৃথক করে রাখার পীড়াদায়ক ব্যবস্থার মূলে রয়েছে মানুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে খ্রীষ্টধর্মের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার গভীর প্রভাব।

নারীদের যদি শারীরিক ও মানসিক বিকল্প না হয়, আর তারা যদি নিজেদের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে তবে তাদের পক্ষে দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতার উর্ধ্বে ওঠা অসম্ভব। তার মনের দিগন্ত শুধু ক্ষুদ্র গৃহজীবনের ও আত্মীয় পরিজনের বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। তারই অবশ্যম্ভাবী ফল হল মেয়েদের মধ্যে বসে বসে আজেবাজে গালগল্প করা, পরনিন্দা চর্চা করা, কারণ তাদের মনের খোরাক চাই। আর এখন তাদের স্বামীরা তাদের গাল দেয়, এখন মেয়েদের এ অবস্থার জন্য মূলতঃ স্বামীরাই দায়ী।

যেহেতু বিবাহ হল নারীদের একটা মস্তবড় উপায়, যাকে তারা প্রাণপণ শক্তিতে আঁকড়ে ধরে, তাই স্বাভাবিকভাবেই তাদের চিন্তা ও আলাপ আলোচনার প্রধান বিষয়ই হয় প্রেম ও নরনারীর মিলন। তদুপরি তাহার তো জিহ্বা ছাড়া আর কোনো অস্ত্র নাই যে তারা তাদের শারীরিক অক্ষমতাও আইনত সামাজিক রীতিনীতি অনুসারে পুরুষের কাছে তাদের বশ্যতার বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারে। তাই আশ্চর্য হবার কিছু নাই যে তারা আত্মরক্ষার জন্য তাদের রসনাকেই যথাসম্ভব ব্যবহার করে থাকে। সেই একই কারণে সাজপোশাকে অন্যের চোখে প্রশংসা পাবার উদগ্র আকাঙ্ক্ষায় তারা একেবারে পাগল হয়ে যায় ও স্বামীদের ও পিতাদের একেবারে নাজেহাল করে ছাড়ে।

এর কারণ খুঁজতে বেশিদূর যেতে হবে না।

বর্তমান যুগে নারীরা প্রধানত পুরুষের ভোগের বস্তু। অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতার জন্য নারীদের বিবাহের জন্য চেষ্টা করতেই হয়। নারী তখন পুরুষের উপর নির্ভরশীল হয়ে যায়, বা নারী পুরুষের সম্পত্তিতে পরিণত হয়। আর সাধারণত পুরুষদের চেয়ে নারীদের সংখ্যা বেশি বলেও তাদের আরো অসুবিধায় পড়তে হয়। এ বিষয়ে আবার পরে আলোচনা করা যাবে। আবার অনেক সময় অনেক পুরুষ যে কোনো কারণেই হক অবিবাহিত থেকে যায়, যার ফলে নারী পুরুষের অনুপাতের তফাৎটা আরো বেড়ে যায়। আর মেয়েদের মধ্যেও সাজসজ্জা ইত্যাদি করে পুরুষের মন জয় করবার প্রতিযোগিতা বেড়ে যায়।

এই সব কুফল চলে আসছে শত শত বৎসর ধরে। বংশ পরম্পরায় ধরে চলে আসছে তারই স্বাভাবিক পরিণতি, আমাদের একথাও মনে রাখতে হবে যে নারীদের সংখ্যা বেশি হবার জন্য এখনকার মতো পূর্বের কোনো সময়ই স্বামী পাবার জন্য মেয়েদের মধ্যে এত তীব্র প্রতিযোগিতা ছিল না। নারীদের সংখ্যা

বেশি হবার কারণ কিছু কিছু পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে এবং আরো কিছু কিছু উল্লেখ করা দরকার। সর্বশেষে সামাজিক প্রয়োজন ছাড়াও জীবনের নিরাপত্তার জন্যও বিবাহ জিনিসটাকে যেমন একটা অনিবার্য উপায় হিসাবে ধরা হয় আজকাল, তেমন এর আগে আর কখনোই হয়নি।

পুরুষরা তাদের নিজেদের সুবিধা মতো এই ব্যবস্থাতে সন্তুষ্ট থাকে। তারা আত্মপ্রসাদ লাভ করে, তাদের অহংকার চরিতার্থ হয়। তাদের কর্তা ও প্রভুর ভূমিকা পালন করতে সুবিধা হয়। আর অন্যান্য সবক্ষেত্রের শাসক বা প্রভুদের মতো তারাও যুক্তির সীমা ছাড়িয়ে যায়। তাই এই হীনমন্য অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার অবস্থার সৃষ্টি করা নারীদের জন্য তাই আরো প্রয়োজন। শ্রমিকরা যেমন মধ্য শ্রেণীর কাছ থেকে কিছুই আশা করতে পারে না নারীরাও তেমনি পারে না পুরুষদের কাছ থেকে।

আমরা যদি ভেবে দেখি যে অন্যান্য ক্ষেত্রে, যেমন শিল্পের ক্ষেত্রে, একজন মালিকের সংগে আর একজনের প্রতিযোগিতা চলে, সেখানে কি জঘন্য, এমন কি কত বর্বরভাবে পাল্লা দেবার লড়াই চলে থাকে, কেমন করে পরস্পরের মধ্যে হিংসা দ্বেষ ও কেলেঙ্কারী ঘটে থাকে, তাহলে স্বামী লাভ করবার জন্য মেয়েদের মধ্যে যে ধরনের প্রতিযোগিতা চলে তাকে স্বাভাবিক বলেই মনে হবে। এই কারণেই পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের মধ্যে মতের মিল কম দেখা যায়। পুরুষদের মতামত নিয়ে, প্রতিদ্বন্দ্বী কালো মেয়ের রূপ নিয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে সহজেই ঝগড়া বেধে যায়। ঠিক এই কারণেই দেখা যায় যে এমন কি সম্পূর্ণ অপরিচিত দুজন মেয়ের পরস্পরের সংগে দেখা হলেও তারা পরস্পরকে শত্রু মনে করবে, এক পলকেই একজন আর একজনের বেশভূষা ইত্যাদির ত্রুটি বের করবে, ভাবখানা যেন এই রকমই যে একজন যেন আর একজনকে বলছে ঃ "তোমার চেয়ে আমার সাজসজ্জা অনেক সুন্দর, আর তোমার চেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতেও ভাল পারি।"

মেয়েদের যে ধরনের শিক্ষা দেওয়া হয় ও যে পরিবেশে রাখা হয় তাদের অন্যান্য গুণের চেয়ে অনুভূতির দিকটাই বেশি বেড়ে ওঠে। তার জন্যও তাদের যৌন আবেগ বেশি হয় আর তার অভিব্যক্তি দেখা যায় এক দিক থেকে বদ মেজাজের মধ্য দিয়ে অন্য দিক থেকে আবার চরম আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে।

কিন্তু আমরা এখনো বিবাহের ক্ষেত্রে বাধা নিষেধের আলোচনা শেষ করিনি। ক্ষতিকর শিক্ষা ও শরীর চর্চা এই উভয় দিক থেকেই মেয়েদের উপর কুপ্রভাব পড়ে। সব চিকিৎসকরাই এ বিষয়ে একমত যে মেয়েদের মা হবার জন্য যে ধরনের শিক্ষা দেওয়া হয়, তা কোনোমতেই ঠিক নয়। "সৈন্যদের অস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হয়, কারিগরদের যন্ত্রপাতি ব্যবহারে শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রত্যেকটা বিশেষ

কাজের জন্যই বিশেষ ধরনের শিক্ষার প্রয়োজন। এমন কি মঠাধ্যক্ষদেরও দীক্ষা দেওয়া হয়। শুধুমাত্র নারীদেরই তাদের মা হবার মতো এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য কোনো শিক্ষাই দেওয়া হয় না"* ("The Mission of our century. A study on the Womens Question")। যে মেয়েদের বিবাহের সুযোগ মেলে, তাদের মধ্যেও দশ ভাগের নয় ভাগ মাতৃত্বের দায়িত্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞই থাকে। আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করে দেখিয়েছি যে মায়েরা এমন কি বয়স্কা কন্যাদের সঙ্গেও যৌন সম্বন্ধীয় কোনো আলোচনা করে তাদের নিজেদের ও তাদের স্বামীদের প্রতি কর্তব্যের কথা বুঝিয়ে দিতে নারাজ হয়, মায়েদের এ দোষ ক্ষমার অযোগ্য। বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের জীবনে একটা নতুন অধ্যায় শুরু হয়। এই জীবন সম্বন্ধে উপন্যাস পড়ে পড়ে এক ধরনের কল্পনা তারা করে নেয়।** আর সেই সব উপন্যাস মোটেই উৎকৃষ্ট পর্যায়ের থাকে না, বা বাস্তব জীবনের সঙ্গে তার মিল থাকে না। ঘরকন্না সম্বন্ধে শিক্ষার অভাবের কথা উল্লেখ করা দরকার, যা কিনা এখন পর্যন্ত বাদ দেওয়া চলবে না। অবশ্য পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে সব কারণে আগের চেয়ে মেয়েদের উপর ঘরকন্নার চাপ কিছুটা কমেছে। এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, বহু সংখ্যক মেয়েই, তাদের নিজেদের দোষে নয়—সামাজিক অবস্থার ফলেই স্ত্রী মা বা গৃহিনী হবার কোনো যোগ্যতা ছাড়াই সংসারে প্রবেশ করে। যার ফলে স্বভাবতই সংসারে ঝগড়া বিবাদ বাধে।

আবার নারীদের শারীরিক অপরিপূর্ণতার জন্যও অনেক সময় বিবাহ নাকচ হয়ে যায়। অনুপযুক্ত শিক্ষা, দৈন্যদশাগ্রস্থ সামাজিক অবস্থা (খাদ্য, বাসস্থান, কাজ) থেকে দুর্বল, রক্তশূন্য, স্নায়বিক দুর্বলতাগ্রস্থ মেয়েরা বিবাহিত জীবনের

* Die Misson unseres Jahrhunderts. Eine Studie Zur Frauenfrage. Von Irma von Troll-Borostyani. Pressburg and Leipzig, ("The Mission of our Century. A Study on the Women's Question"). একখানি প্রাঞ্জল শক্তিশালী পুস্তক, যার মধ্যে মোটামুটিভাবে সামগ্রীক সংস্কারের দাবি করা হয়েছে।

** In Les Femmes qui votent et les Femmes qui tuent. (Women who vote And Women who kill) এ্যালেকজেণ্ডার ডুমার 'কমস্' (fils) এ উল্লেখ আছে যে কোনো একজন উচ্চপদস্থ রোমান ক্যাথলিক পাদ্রী তাঁর কাছে মন্তব্য করেছিলেন যে তাঁর প্রাক্তন ছাত্রীদের মধ্যে শতকরা অন্তত ৮০ জন বিবাহের একমাস পরেই এসে বিবাহ করে ভুল করেছে বলে তাদের হতাশা ও দুঃখ প্রকাশ করেছে। মনে হয় কথাটা ঠিকই। ভল্টায়ারের সমকালীন ফরাসী বুর্জোয়ারা তাদের কন্যাদের মঠের শিক্ষা দেওয়াটাই ঠিক মনে করত, কারণ তাদের তত্ত্ব ছিল যে মেয়েরা যত বেশি অজ্ঞ থাকবে, ততই তাদের চালাতে সুবিধা হবে। মতপার্থক্য দেখা দিলেই স্বভাবতই হতাশা আসবে। লেবলে (Laboulaye) তাঁর পাঠকদের সুস্পষ্ট উপদেশ দিয়েছেন সাধারণভাবে মেয়েদের অজ্ঞ রেখে দিতে হবে, কারণ "পুরুষের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়ে গেলেই তার আধিপত্য শেষ হয়ে যাবে"।

কর্তব্য পালনে অনুপযুক্ত হয়ে থাকে। ফলে তাদের যৌন জীবনও স্বাভাবিক হতে পারে না। স্বামীও একজন সুস্থ, প্রফুল্ল, মা হবার যোগ্য, সর্ববিষয়ে উপযুক্ত জীবন সঙ্গিনীর বদলে পায় একজন নার্ভাস, খিঁটখিঁটে, চিররুগ্ন স্ত্রী। এ বিষয়ে উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নাই। প্রত্যেক পাঠকই (পাঠক বলতে অবশ্য নারী পুরুষ উভয়কেই বলছি) তার নিজের চেনা জানা চারিপাশ থেকে এই চিত্র নিজেরা আরো পূর্ণ করতে পারবে।

অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে, বেশিরভাগ বিবাহিত নারীই, বিশেষ করে শহরাঞ্চলের নারীরা কম বেশি অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে থাকে, স্বামী-স্ত্রীর জীবন অসুখী থাকে। তখন এই সমাজ ব্যবস্থা পুরুষদের সুযোগ করে দেয় বিবাহিত জীবনের বাইরে সেটা পুষিয়ে নেবার! তাতে স্ত্রীদের মেজাজ্ ভাল হবার বা সুখ পাবার কোনো কারণই থাকে না। কখনো কখনো দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছয়, তখন তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু শত রকমের বাধা বিঘ্ন থাকায় তা হতে পারেনা।

এইভাবেই আমরা দেখতে পাই যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বহু রকম কারণেই স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধে দুটি নরনারীর মধ্যে পারস্পারিক ও শ্রদ্ধার ভিত্তিতে প্রকৃত মিলন—কাণ্ট (KANT) যাকে বলেছেন একটা সামগ্রীক মানবিক সত্তার মিলন তা হতে পারে না।

সুতরাং যখন এমন কি বড় বড় মনীষীরাও ভেবে থাকেন যে বিবাহ ও পারিবারিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে তারা নারীমুক্তির ব্যাপারটা সমাধান করে ফেলেছেন, তখনও আমাদের সন্দেহের অবকাশ থাকে। এ বিষয়ে আবার আলোচনা করা হবে। আমাদের বর্তমান সামাজিক অবস্থার জন্যেই দাম্পত্য জীবন ও পারিবারিক জীবনে ক্রমশ অবনতি ঘটছে।

কিন্তু এ সব কিছু সত্ত্বেও দেখা যায় যে প্রত্যেকটি মেয়ের জন্যই যে বিবাহের ব্যবস্থা রয়েছে তা নয়। বিখ্যাত দার্শনিক স্কপেনহর-এর (Schopenhauer) কথাই ধরুন। নারীদের সম্বন্ধে তাঁর উক্তি যে শুধু অশালীন তাই নয়, অশ্লীলও বটে। যেমন, তিনি বলেছেন: "নারীদের দিয়ে কোনো বড় কাজ হবে না। তাদের চরিত্র সক্রিয় নয়, নিষ্ক্রিয়। সন্তানের জন্ম দিতে, সন্তান পালন করে ও স্বামীদের অধীনে থেকেই নারীরা তাদের জীবনের ঋণ পরিশোধ করবে। তাদের ইচ্ছামতো মত প্রকাশ করতে দেওয়া হবে না। পুরুষের চেয়ে নারীদের জীবনে ঘটনাও কম ঘটবে আর ছোট-খাট বিষয় নিয়েই তারা থাকবে। শিশুদের লালন পালন করা, শিক্ষা দেওয়া নারীদের কাজ, কারণ নারীদের নিজেদেরই শিশুসুলভ মানসিক অবস্থা থেকে যায়—তারা থাকে শিশু ও পুরুষদের একটা মাঝামাঝি অবস্থায়। পুরুষরাই একমাত্র ঠিক ঠিক মানুষ।…মেয়েদের ঘরকন্নার কাজ করা

ও বাধ্য হয়ে চলা শেখানো দরকার… …নারীরাই হবে সম্পূর্ণ অকেজো বিপরীত পক্ষের লোক।"

আমার মনে হয় যে, যে শ্বপেনহর নারীদের উপর এই বিচার করেছেন তিনি নিজে একজন দার্শনিক নন, তিনি নিজেই একজন বিপরীত পক্ষের লোক। এ ধরনের যুক্তি লোকে একজন শত্রুর কাছ থেকেই আশা করে, একজন জ্ঞানী ব্যক্তির কাছ থেকে নয়, তদুপরি স্কপেনহর নিজে বিবাহিত ছিলেন না এবং অন্ততঃ একজন নারীকেও তিনি তাঁর মতো কাজ করাতে পারেননি। তাঁর যুক্তিহীনতাটাই বেশি বোঝা গেল।

অনেক নারী বিবাহ করে না, কারণ তাদের বিবাহের সুযোগ হয় না। সমাজের রীতিনীতি অনুযায়ী নারীরা নিজেদের থেকে প্রেম নিবেদন করতে বা স্বামী নির্বাচন করতে পারে না, পুরুষরা কখন তাদের বিয়ে করতে চাইবে সেই অপেক্ষায় থাকতে হয়। আর যদি পুরুষরা বিয়ে না করে তবে আর তাদের জীবনে সুযোগ মিলল না, অন্য বহু সংখ্যক হতভাগ্য নারীদের মতো তারও কর্মহীন, স্বামীহীন, দুঃখের জীবন কাটাতে হবে, কখনো বা সমাজের সামনে হাস্যাস্পদও হতে হবে। নারী পুরুষের মধ্যে এই তারতম্যের কারণ খুব কম লোকই জানে বা সম্যক উপলব্ধি করতে পারে। বেশির ভাগ লোকই চট্ করে বলে দেবে: "মেয়েরা অনেক বেশি জন্মেছে।" অনেকে আবার এই সিদ্ধান্তে আসবে যে বিবাহই যদি নারীদের জীবনে একমাত্র উদ্দেশ্য হয় তবে বহু বিবাহের প্রচলন হওয়া দরকার। কিন্তু যারা জোর দিয়ে বলে থাকে যে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের জন্মহার বেশি তারা সঠিক খবর জানে না। যারা যারা ঘোমটাকে অস্বাভাবিক মনে করে, আর প্রত্যেক নারীর জন্য কিভাবে বিবাহের ব্যবস্থা করা যাবে তাও ভেবে পায় না, তারা মনে করে, আমরা চাই বা না চাই, বহু বিবাহ চালু করতেই হবে। তারা আসল ব্যাপারটা বোঝে না। আমাদের বর্তমান নৈতিকতার কথা ছেড়ে দিলেও, যা কিনা বহু বিবাহ বরদাস্ত করে না। বহু-বিবাহ নারীদের পক্ষে অপমানজনক। একথা সত্য যে তাতে স্কপেনহরের পক্ষে নারীদের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষের সঙ্গে বলতে বাধা হয়নি যে: "সমগ্র নারীজাতির পক্ষেই বহু বিবাহ মঙ্গলের জন্যই।" তা সত্ত্বেও প্রকৃতির নিয়মেই বহু বিবাহ রোধ করা হবে।

অনেক পুরুষ বিবাহ করে না, কারণ তারা স্ত্রীদের ভরণপোষণ চালাতে পারে না। সেই কারণেই আরো অনেক বেশি সংখ্যক পুরুষ দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে পারে না। যে অল্প সংখ্যক লোক একাধিক বিয়ে করে চালাতে পারে তাদের কথা ধরার মধ্যেই নয়। আর তাদের তো দুই বা ততোধিক স্ত্রী আছেই। একজন বৈধ স্ত্রী আর অন্যেরা অবৈধ। যাদের ধন সম্পদ আছে তাদের ভোগ লালসার

পথে আইন বা নৈতিকতার বাধাই তারা মানে না। পূর্ব দেশে যেখানে আইনে এবং সামাজিক নিয়মে হাজার হাজার বছর ধরে বহু বিবাহ চালু আছে, সেখানেও খুব কম লোকেরই একাধিক স্ত্রী আছে। আমরা প্রায়ই তুর্কীর হারেমের অপ-প্রভাবের কথা শুনতে পাই এবং তার কুফল সমগ্র জাতি ও জনগণের উপর পড়ে। কিন্তু লোকে ভুলে যায় যে পুরুষদের মধ্যে অত্যন্ত ক্ষুদ্র অংশই এই হারেম রাখতে পারে, আর এই ক্ষুদ্র অংশ হল শাসকশ্রেণীর মধ্যে এবং সেখানকার ব্যাপক জনগণ ইউরোপের লোকের মতই এক বিবাহই করে। আলজিয়ার্স শহরে ১৮৭৯ সালের পূর্বে ১৮,২৮২ বিবাহিত পুরুষের নাম রেজিষ্ট্রি করা হয়। তাদের মধ্যে অন্তত ১৭,৩১৯ পুরুষের একটি করে স্ত্রী ছিল, ৮৮৮ পুরুষের দুটি করে স্ত্রী ছিল এবং মাত্র ৭৫ জন পুরুষের দুইয়ের অধিক স্ত্রী ছিল।

একথা ধরে নেওয়া বিশেষ ভুল হবে না যে তুর্কী সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্তান্তিনোপলের হিসাব নিলেও এ রকমই দাঁড়াবে! তুর্কী গ্রামাঞ্চলের অধি-বাসীদের মধ্যে এক বিবাহের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী। তুর্কীর বেলায় যেমন আমাদের বেলায়ও তেমনি, আর্থিক অবস্থার জন্য পুরুষরা একটির বেশী বিবাহ করতে পারে না। কিন্তু যদি ধরে নেওয়া যায় যে সমস্ত পুরুষেরই একাধিক স্ত্রীর খরচ বহন করা সম্ভব, তাহলেও বহুবিবাহ অসম্ভব হবে কারণ নারীদের সংখ্যা অত বেশী নেই। সাধারণ অবস্থায় দেখা যায় যে নারী পুরুষের সংখ্যা সর্বত্রই প্রায় সমান সমান বলে এক বিবাহই স্বাভাবিক। এই বিষয়টা প্রমাণ করা প্রয়োজন।

নীচের সংখ্যাতত্ত্ব থেকে দেখা যাবে যে নারী পুরুষের সংখ্যার মধ্যে তারতম্য বিশেষ নেই এবং নারীদের সংখ্যাধিক্য তো নেই-ই। নীচে মোট জনসংখ্যার মধ্যে নারী ও পুরুষের সংখ্যা ও তাহার তারতম্য পরের পৃষ্ঠায় দেখানো হইল।

সুতরাং আমরা দেখতে পাই যে উক্ত রাজ্যগুলির মোট জনসংখ্যা হল ২৪৮,৪৮৪,৫২৪ জন। নারীদের সংখ্যা মোটামুটি ২০,০০,০০০ জন অধিক। শতকরা হিসাবে প্রতি ১০০ শত জন পুরুষে ১১০·২২ জন নারী। নারী-পুরুষের সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য খুবই কম। আবার এই লোক গণনার সময় যারা সমুদ্রে গিয়েছিল তারা বাদ পড়ে গেছে। সে হিসাব ধরলে নারী পুরুষের সংখ্যার পার্থক্য আরো কমে যাবে। কেবল মাত্র ইংল্যাণ্ড ও ইটালীতে তাদের গোণা হয়েছে, কিন্তু অন্যান্য দেশেও তাদের সংখ্যা অনেক বেশি, যেমন যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানীতে। তদুপরি বিভিন্ন দেশের উপনিবেশগুলিতে তাদের যে সৈন্যরা ছিল তারাও এই তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। এই সৈন্যদের ও সমুদ্রে ভ্রমণরত জন-সংখ্যার হিসাব যোগ করলে বেশ কয়েক শ' হাজার হবে। অবশেষে আমাদের এ-কথাও মনে রাখতে হবে যে ইউরোপের দেশগুলি থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে

সাল	দেশ	মোট	পুরুষ	নারী	পুরুষের সংখ্যাধিক্য	নারীর সংখ্যাধিক্য
১৮৭৫	জার্মান সাম্রাজ্য	৪২,৭৫২,৫৫৪	২১,০০৫,৪৬১	২১,৭৪৭,০৯৩	—	৭৪১,৬৩২
১৮৭২	ফ্রান্স	৩৬,১০২,৯২১	১৭,৯৮২,৫১১	১৭,১২০,৪১০	—	১৩৭,৮৯৯
১৮৭১	ইটালী	২৬,৮০১,১৫৪	১৩,৪৭২,২৬২	১৩,৩২৮,৮৯২	১৪৩,৩৭০	—
১৮৬৯	অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরী	৩৫,৯০৪,৪৩৫	১৭,৭২৭,১৭৫	১৮,১৬৭,২৬০	—	৪৩০,০৯৫
১৮৭১	গ্রেট বৃটেন ও আয়ারল্যান্ড	৩১,৮৪৫,৩৭৯	১৫,৫৬৫,১৩২	১৬,২৬১,২৪৭	—	৬৭৭,১১৫
১৮৭০	যুক্তরাষ্ট্র	৩৮,৫৫৮,৩৭১	১৯,৪৯৩,৫৬৫	১৯,০৬৪,৮০৬	৪২৮,৭৫৯	—
১৮৭০	সুইজারল্যান্ড	২,৬৭০,৩৪৫	১,৩০৫,৬৭০	১,৩৬৪,৬´৫	—	৫৯,০০৫
১৮৬১	নেদারল্যান্ড	৩,৩০৯,১২৮	১,৬২৯,০৩৫	১,৬৮০,০৯৩	—	৫১,০৫৮
১১৬৬	বেলজিয়াম	৪,৮২৭,৮৩৩	২,৪১৯,৬৩৯	২,৪০৮,১৯৪	১১,৪৪৫	—
১৮৬০	স্পেন	১৫,৬৭৩,৪৮১	৭,৭৬৫,৫০৮	৭,৯০৭,৯৭৩	—	১৪২,৪৬৫
১৮৬৪	পর্তুগাল	৪,১৮৮,৪১০	২,০০৫,৫৪০	২,১৮২,৮৭০	—	১৭৭,৩৩০
	সুইডেন ও নরওয়ে	৫,৮৫০,৫০৩	২,৮৮০,৩৩৯	২,৯৮০,১৬৪	—	৯৯,৮২৫
		২৪৮,৪৯৪,৫১৪	১২৩,২৮০,৮৩৭	১২৫,২১৩,৬৭৭	৫৮৩,৫৭৪	২,৫৩৬,৪২৪

যাদের দেশান্তরে পাঠানো হয়ে থাকে তারা প্রধানত পুরুষই। যুক্তরাষ্ট্রে পুরুষ-দের সংখ্যাধিক্য থেকেই তা বোঝা যায়।

আর কয়েকটি সংখ্যাতত্ত্ব থেকে একথা পরিষ্কার বোঝা যাবে। ১৮৭৮ সালে ভিক্টোরিয়া উপনিবেশে মোট জনসংখ্যা ছিল ৮৭৮,৩৭০ জন। নারীদের চেয়ে পুরুষদের সংখ্যা ১০০,০০০ জন বেশি ছিল। অর্থাৎ পুরুষদের চেয়ে নারীদের সংখ্যা শতকরা ২০ ভাগ কম ছিল। ১৮৭৭ সালের শেষে কুইনসল্যান্ডের জন-সংখ্যা ছিল ২০৩,০৮৪ জন। ১২৬,৯০০ জন অধিবাসী ছিল পুরুষ। আর ৭৬,১০০ জন নারী। পুরুষদের সংখ্যার অনুপাত ছিল অনেক বেশি। নিউজি-ল্যান্ডের উপনিবেশের জনসংখ্যা ছিল ৪১৪,১৭১ জন। এর মধ্যে কিন্তু স্থানীয় অধিবাসী বা ৪,৩০০ জন চীনাকে ধরা হয়নি। তার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ছিল ২৩০,৮৯৮ এবং নারীদের সংখ্যা ১৮৩,৩৭৩ জন। ভারতের জনসংখ্যার মধ্যে নারীদের চেয়ে পুরুষদের সংখ্যা ৬,০০০,০০০ জনেরও অধিক বেশি। এই সব সংখ্যার হিসাব থেকে বোঝা যায় যে যদি সারা পৃথিবীর জনসংখ্যার হিসাব নেওয়া যায় তবে নারীদের সংখ্যা বেশি হবে না, পুরুষদের সংখ্যাই বেশি হবে। তাছাড়া আরো যে অনেক দিক থেকে পুরুষদের সংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে, সে বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব।

বিভিন্ন দেশের নারী পুরুষের সংখ্যার অনুপাত কি রকম তা দেখা যাক। আমরা দেখতে পাই যে সব দেশে যুদ্ধ হয়েছে, বা অনেক লোক দেশ ত্যাগ করেছে, সে সব দেশে পুরুষদের সংখ্যা তুলনায় কম। অবশ্য যুদ্ধের চেয়ে দেশ ত্যাগের কারণেই পুরুষদের সংখ্যা বেশি কম দেখা যায়। জার্মান গোষ্ঠীভুক্ত দেশ-গুলিতে, জার্মানী, সুইজারল্যান্ড, অষ্ট্রিয়া, ইংলন্ডে এই পার্থক্য সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। বেলজিয়াম ইটালীর মতো মিশ্রিত জনসংখ্যা বা কেলটিক জনসংখ্যার দেশগুলির পুরুষদের সংখ্যা বেশি। ফ্রান্সে যেখানে দেশবাসীর সংখ্যা খুবই কম —১৮৭০-৭১-এর যুদ্ধের পর থেকে জনসংখ্যা অনিয়মিতভাবে বেড়েছে কমেছে। ১৮৬৬ সালে ফ্রান্সে পুরুষদের চেয়ে নারীদের সংখ্যা মাত্র ২৬,০০০ জন বেশি ছিল। কিন্তু ১৮৮২ সালে সেই সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩৭,৮৯৯ জন। স্পেন ও পর্তুগালে নারীদের সংখ্যা বেশি বেশি হবার কারণ এই যে এই দুই দেশেরই বড় বড় উপনিবেশে পুরুষরা অনেকে চলে যায় এবং সেখানে প্রায়ই অভ্যন্তরীণ গোলযোগ লেগেই থাকে, সামাজিক অবস্থাও বিপজ্জনক হয়ে পড়ে।

অপর পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা ভিন্ন দেখা যায়। বাইরে থেকে বহু সংখ্যক পুরুষদের অনুপ্রবেশের জন্য সেখানে পুরুষদের সংখ্যা এত বেশি যে ইউরোপের ঘাটতি পর্যন্ত পূরণ হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে আমরা যদি উত্তমাশা অন্তরীপ, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে বসবাসকারী ইউরোপীয়দের হিসাব

জানতে পারি, তাহলে হয়তো দেখতে পাব যে নারীদের সংখ্যার চেয়ে পুরুষদের সংখ্যা বেশি এবং প্রত্যেকটি পুরুষ যদি বিবাহ করে, তবে কোনো নারীই অবিবাহিত থাকবে না। আবার হয়তো এ প্রশ্নও আসবে যে পুরুষদের বহু বিবাহের বদলে নারীদের বহু বিবাহ করা দরকার কি না।

জন্ম সংখ্যার হিসাব দেখলেও এ কথা প্রমাণিত হয়। সমস্ত দেশের শিশু-দের জন্মসংখ্যার হিসাবে দেখা যায় যে প্রতি ১০০ কন্যা সন্তানের তুলনায় পুত্র সন্তান জন্মেছে ১০৫ বা ১০৭ জন। আরো দেখা গেছে যে জন্মের পর এক বৎসরের মধ্যে যেসব শিশুদের মৃত্যু হয়ে থাকে তাদের মধ্যে পুত্র সন্তানের সংখ্যা বেশি, আর মাতৃগর্ভে থেকেই যেসব মৃত শিশুর জন্ম হয় তাদের মধ্যে প্রতি ১০০ শত কন্যার তুলনায় পুত্রের সংখ্যা ১৩৮ জন।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের শিশুকন্যাদের হিসাব দেখা যায়। এই সংখ্যাতত্ত্ব অনুযায়ী ২৭,৭২০ জন পুরুষ এবং ২৭,১৩৮ জন কন্যা সন্তান পৃথিবীতে জন্মেছিল। কিন্তু মৃত্যুসংখ্যার হিসাবে দেখা যায় (বিভিন্ন বয়সের হিসাব ছাড়াই) ২৪,৫০৮ পুত্র এবং ২২,৮৫৫ জন কন্যার মৃত্যু হয়েছে। সুতরাং মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের জন্ম সংখ্যা ৫৮২ জন বেশি। এবং মৃত্যু সংখ্যা ১,৬৫১ জন বেশি। ক্ষয়রোগে মৃত্যু সংখ্যার ক্ষেত্রেও নারী ও পুরুষদের সংখ্যার উল্লেখযোগ্য তফাৎ দেখা যায়—প্যারিসে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে এই রোগে ৪,৭৮৮ জন পুরুষ এবং ৩,৮১৫ জন নারীর মৃত্যু হয়েছে। পুরুষদের মধ্যে এত অধিক মৃত্যু সংখ্যার কারণ হিসাবে দেখা যায় যে গ্রামের চেয়েও শহরগুলিতে তারা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর খারাপ অবস্থার মধ্যে বাস করে। (Quetelet) কোয়েটলেট-এর হিসাব অনুযায়ী ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়সের মধ্যে যত নারীর মৃত্যু হয় তার চেয়ে .৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে অধিক সংখ্যক পুরুষের মৃত্যু হয়ে থাকে। এর আরও একটি কারণ এই যে কর্মক্ষেত্রে পুরুষদের অনেক বিপদের সম্মুখীন হতে হয় (যেমন কারখানায়, বন্দরে, রেলে)।

মাতৃগর্ভ থেকেই যে সব শিশু মৃত অবস্থাতেই জন্মে তাদের মধ্যে ছেলেদের সংখ্যা বেশি হবার কারণ হিসাবে দেখা যায় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছেলেদের মাথাগুলি বড় হয়। তাতে জন্মের সময় অসুবিধা হয় এবং একথা মনে করা যেতে পারে যে তারা মায়েদের* দুর্বল শরীরের শক্তি বেশি টেনে নেয় বলে তাদের গর্ভে ধারণ করা মায়েদের পক্ষে কষ্ট কর হয়ে পড়ে।

* উল্লেখ করা যেতে পারে যে বর্বর বা আধা-বর্বর জাতিগুলির নারীরা অনেকা অনায়াসেই সন্তান প্রসব করে থাকে এবং প্রসবের পর খুব তাড়াতাড়িই আবার নিজেদে কাজে যোগ দিতে পারে। নিচের তলার কঠোর পরিশ্রমী নারীদের মধ্যে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের গরিব নারীদের মধ্যেও ঠিক ঐ জিনিসই দেখা যায়। তারাও উচ্চ শ্রেণী নারীদের চেয়ে অনেক সহজে সন্তান প্রসব করে থাকে।

মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের জন্মের সংখ্যা অধিক হবার কারণ হিসাবে লোকে বলে থাকে যে, মায়েদের চেয়ে পিতাদের বয়স ও সামর্থ বেশি থাকে বলে সন্তান জন্মাবার বেলায় তার প্রভাব পড়ে। বলে থাকে যে স্ত্রীর চেয়ে স্বামীর বয়স যত বেশি হবে ততই পুত্র সন্তানের সংখ্যা তত বেশি হবে। অবশ্য বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা হলে চলবে না। এই ধারণা অনুযায়ী পুত্র বা কন্যা সন্তানের জন্মের উপর মা বাপের প্রকৃতির প্রভাব পড়ে। উপরের তথ্য থেকে আমরা অন্ততঃ একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে নারীরা যদি শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে সুস্পষ্ট ও শিক্ষিত হয় তবে মাতৃগর্ভ থেকে মৃত সন্তানের সংখ্যা ও পুত্র সন্তানের মৃত্যু সংখ্যা কমে যেতে পারে। আর সম্ভবত নারীদের শারীরিক ও মানসিক শক্তির বিকাশ হতে পারলে এবং উপযুক্ত বয়সের স্বামী নির্বাচিত করতে পারলে স্বাস্থ্যকর সামাজিক পরিবেশের মধ্যে হয়ত বা যে পুত্র সন্তান বা কন্যা সন্তান জন্মাবে তার ওপর মানুষের হাতও থাকতে পারে।

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়াতে ১৪ বৎসর বয়সের ছেলেদের সংখ্যা ছিল ৩,৭২২,৭৭৬ জন আর ঐ একই বয়সের মেয়েদের সংখ্যা ছিল ৩,৬৮৮,৯৮৫ জন। সুতরাং ছেলেদের সংখ্যা ৩৩,৭৯১ জন বেশি ছিল। তবুও সমগ্র জনসংখ্যার মোট হিসাবে দেখা যায় যে পুরুষদের চেয়ে নারীদের সংখ্যা ছিল ৩১৩,৩৮৩ জন বেশি। সুতরাং পরবর্তী সময়ে নারী ও পুরুষের সংখ্যার মধ্যে বেশ তারতম্য দাঁড়িয়ে যায় আর তার কারণ হিসাবে প্রধানতঃ যুদ্ধ, দেশ ত্যাগকে ধরা যায়, যা কিনা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। ১৮৬৪,১৮৬৬,১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের যুদ্ধের পরই জার্মানী থেকে দেশান্তরে চলে যাওয়ার হিড়িক পড়ে গেল, তাদের মধ্যের বেশির ভাগই* ছিল যারা মিলিটারীতে যোগ দেয়নি এবং পুরানো মজুত বাহিনীর সভ্য যারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বেঁচে এসেছে এবং দ্বিতীয়বার জান বলি দিতে যেতে চায় না। সুতরাং দেশ থেকে সবচেয়ে স্বাস্থ্যবান ও শক্তিশালী পুরুষদের মধ্যে অনেকেই বিদেশে চলে গেল আর তার ফলেই বহু সহস্র জার্মান নারী বিবাহ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হল।

সরকারী হিসাব অনুযায়ী ১৮৭৬ সালে জার্মান সৈন্য বিভাগে কাজ করার জন্য ১,১৪৯,০৪২ জন সৈন্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে ৩৫,২৬- জনকে পাওয়া যায়নি, ১০৯,৯৫৯ জন কোনও কারণ না দেখিয়েই যোগ দেয়নি এবং তার জন্য কোনও কারণ দেখায়নি। ১৫,২৯৩ জনকে বে-আইনীভাবে দেশ ত্যাগ করবার জন্য সাজা দেওয়া হয়। আর ১৪,৯৩৪ জনের বিরুদ্ধে ঐ একই কারণে মামলা করা হল। এই সংখ্যাগুলোর বিষয়ে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু যে

* অর্থাৎ ৪২ বছরের কম বয়সের, সাধারণতঃ ৩২ বছরের কম বয়সের।

নারীরা এটা পড়বে তাঁরা বুঝবে যে সামরিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারগুলির সঙ্গে তাদের স্বার্থ কতখানি জড়িত। সামরিক বিভাগের কাজের সময় বাড়ানো হবে কি কমানো হবে, সৈন্য সংখ্যা বাড়ানো হবে কি কমানো হবে, দেশের অবস্থা শান্তিপূর্ণ থাকবে কি যুদ্ধবিগ্রহ চলবে, সৈন্যদের প্রতি মানবিক কি অমানবিক ব্যবহার করা হবে তার ফলে ত্যাগ ও আত্মহত্যার সংখ্যা বাড়ছে কি কমছে—এসব বিষয়ের সঙ্গে নারী এবং পুরুষ উভয়েরই স্বার্থ সমান ভাবে জড়িত। সামরিক শাসনের ফলে পুরুষদের চেয়ে নারীদের অনেক বেশি ভুগতে হয়। পুরুষরা আবার এ ভেবেও সান্তনা পায় যে উপরোক্ত কারণগুলির জন্য তাদের সংখ্যা কমতে থাকলে বেতন বেড়ে যাবে।*

কিন্তু নারীরাই বেশি বিপদে পড়ে। তারা তাদের স্বাভাবিক জীবন যাপন করবার সুযোগ পায় না এবং সৈন্য সংখ্যার অতিরিক্ত বৃদ্ধি যুদ্ধের সন্ত্রাসের জন্য তাদের দুর্ভোগ অনেক বেশি হয়।

মোটের উপর আইন-কানুনের ভার পুরুষদের হাতে থাকলেও তারা সে বিষয়ে বিশেষ কিছু জ্ঞান বা অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দেয়নি। এখনও পর্যন্ত অধিকাংশ মানুষ মুষ্টিমেয় মানুষের হাতেই নিজেদের ভাগ্য ছেড়ে দিয়েছে। আর সেই মুষ্টিমেয় মানুষ নিজেদের ক্ষমতা অপব্যবহার করেছে। মেয়েদের রাজনীতি করার বিরুদ্ধে যে বলা হয়ে থাকে তার জবাবেই একথা বলা যায়।

কলকারখানায় ব্যাপকভাবে যন্ত্রপাতির ব্যবহার চলছে কিন্তু দুর্ঘটন ঠেকাবার ব্যবস্থা নেই তাই দুর্ঘটনার সংখ্যাও বাড়ছে। নারীদের সংখ্যা কমে যাবার এটাও একটা কারণ। একথা ঠিক যে নারীরাও শিল্পগুলির প্রত্যেকটি শাখাতে কাজে নিয়োজিত হচ্ছে এবং তার ফলে দুর্ঘটনাতেও পড়ছে। ১৮৬৯ সালের প্রাশিয়ার সরকারী হিসাব অনুযায়ী মোট ৪৭৬৯টি দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যার মধ্যে ৪২৪৫ জন পুরুষ এবং ৫২৪ জন নারী ছিল। নারীদের সংখ্যা পুরুষদের সংখ্যার শতকরা সাড়ে বারো জনেরও কম। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে দুর্ঘটনায়

* একথা যে কত অসম্ভব তা এর ফল দেখলেই বোঝা যাবে। যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যায় যে স্থায়ী সৈন্যবাহিনী যত বড় হবে, আর যত ঘন ঘন যুদ্ধ হবে, ততই সে অনুপাতে মজুরি বাড়তে থাকবে, তবে দেখা যাবে যে যাঁরা এই মতবাদের কথা বলছেন তাঁরা এটা দেখছেন না যে বছর বছর শতসহস্র মানুষের ভরণ পোষণ করতে, যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি বহন করতে কতখানি ত্যাগ স্বীকার করতে হচ্ছে, আর কি বিপুল খরচ হচ্ছে। তাদের মতে যে দেশে স্থায়ী সৈন্যবাহিনী নেই, বা খুব অল্পই আছে, সেখানকার মজুরি হবে সবচেয়ে কম, যেমন সুইজারল্যাণ্ড, ইংলণ্ড এবং আমেরিকা। কিন্তু আমরা দেখতে পাই ঘটনা ঠিক তার উল্টো। যদি বহুসংখ্যক স্থায়ী সৈন্য থাকলে প্রতিযোগিতা কমে যেত আর মজুরি বৃদ্ধি হতে পারত, তবে তো রাষ্ট্রের পক্ষে সরকারী আমলার সংখ্যা বাড়ালেও উপকার হতে পারত। কিন্তু একথা স্পষ্টই বোঝা যায় যে নিষ্ফল কাজে নিযুক্ত সৈন্যবাহিনী বা আমলাদের ভার বিস্তু বহন করতে হয় উৎপাদনশীল কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদেরই।

মৃত্যুর সংখ্যা ছিল মোট ৬১৪১ জন এবং আহতের সংখ্যা ছিল ৭০৭৯ জন। এর মধ্যে ৫৭৪৮ জন পুরুষ এবং ৬৬৩ জন নারীর মৃত্যু হয়। সুতরাং নারীদের সংখ্যা ছিল পুরুষদের সংখ্যার শতকরা বারোজনের কিছু বেশি। আহতদের মধ্যে ৬৬৯৩ জন পুরুষ এবং ৩৬৬ জন ছিল নারী অর্থাৎ শতকরা প্রায় সাড়ে পাঁচ জন। সংখ্যা তত্ত্ব থেকে এও প্রমাণিত হয়েছে যে ২৪ বৎসর থেকে ৩৬ বৎসরের মধ্যে সন্তান প্রসবের সময় এবং নানারকম স্ত্রীরোগে বহুসংখ্যক নারীর মৃত্যু হয়ে থাকে। কিন্তু ৪৪ বৎসরের উপর মৃত্যুর সংখ্যা পুরুষদের মধ্যেই বেশি।

শিল্পাঞ্চলের থেকে সমুদ্রতীরের অধিবাসীদের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা বেশি। যদিও সংখ্যা তত্ত্ব দিয়ে এ প্রমাণ করা সম্ভব নয় কিন্তু এ সত্য এ থেকে প্রমাণিত হয় যে সমুদ্রতীরের অধিবাসীদের মধ্যে বহুসংখ্যক বিধবা নারী আছে যাদের স্বামীরা বিপদ সংকুল সমুদ্রের মধ্যে জীবিকার সন্ধানে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে কিন্তু দেশান্তরে যাবার সংখ্যা ছাড়া অন্য আর সব প্রতিকূল অবস্থা মিলেও নারী ও পুরুষের সংখ্যার তারতম্য দেখাবার পক্ষে যথেষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে না। উপরন্তু ঐসব কারণগুলি নিবারণ করবারও যথেষ্ট সুযোগ আছে। যখনই পুরুষদের পক্ষে সামাজিক অবস্থার উন্নতি হবে তারা সব জিনিসটা ভালভাবে বুঝতে পারবে, মানব জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়বে। শিশু মৃত্যুর সংখ্যা কমে যাবে, কলকারখানা এবং খনির বিপদগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এবং নাবিকদের কাজের ক্ষেত্রে সমুদ্রের বিপদগুলির বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বর্তমানে এইসব ক্ষেত্রে বিপদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই নেই। ইংলন্ডের মিঃ প্লিমসল (Mr Plimsoll) সঠিক প্রমাণ দ্বারা দেখিয়েছেন যে ইংলন্ডে বহু সংখ্যক জাহাজের ব্যাপারীরাও অত্যধিক মুনাফার লোভে মোটা মোটা টাকায় ইনসিওর করা অকেজো জাহাজগুলোকে নাবিকদের সমেত সমুদ্রে ছেড়ে দিয়ে থাকে। কোনো কোনো জার্মান মালিকদের যে বিবেক নেই তা দেখা যায় তদুপরি জাহাজগুলি দুর্ঘটনার মুখে পড়লে তার থেকে উদ্ধার কার্যের জন্যও সুব্যবস্থা নাই, কারণ সেগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের হাতে থাকে। বছর বছর এই সব দুর্ঘটনার হাত থেকে শত সহস্র জীবনকে রক্ষা করবার বিষয়ে রাষ্ট্রব্যবস্থা একেবারেই উদাসীন। অবশ্য বিদেশের সমুদ্র উপকূলের দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়া খুবই কঠিন। যে সমাজের সমস্ত মানুষের উন্নতির জন্য কাজ করা হবে, সে সমাজে সমুদ্রপথের দুর্ঘটনা নিবারণের জন্য যথাসাধ্য করা হবে। কিন্তু বর্তমান সমাজের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অন্যরকম। এখানে ব্যক্তিগত মুনাফার জন্য মানুষের জীবন বলি দেওয়া হয়। সমাজের আমূল সংস্কার হলে বরাবরের জন্য সৈন্য বাহিনীও থাকবে না,

উৎপাদনের ক্ষেত্রে গোলযোগেরও অবসান হবে, আর তার ফলে যে দেশ ছেড়ে লোককে চলে যেতে হয় তাও বন্ধ হবে।

আরো অনেক কারণ আছে যে জন্য বিবাহের সংখ্যা সীমাবদ্ধ থেকে যায়। রাষ্ট্র ব্যবস্থাই বহু সংখ্যক পুরুষকে অবিবাহিত থাকতে বাধ্য করে। রোমান ক্যাথলিক ধর্মযাজকরা যে কৌমার্য থাকার বিধি জোর করে মানুষের উপর আরোপ করে দুর্নীতির পথ করে দেয়, তার বিরুদ্ধে মানুষ তীব্র নিন্দা করে থাকে। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক সৈন্যদের যে অবিবাহিত থাকতে বাধ্য করা হয়, তার বিরুদ্ধে মানুষ মুখ খোলে না। উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বেলায় যে শুধু ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষদের কাছ থেকে বিবাহের জন্য অনুমতিই নিতে হয় তা নয়, তারা সব সময় ইচ্ছামতো পাত্রী নির্বাচন করতে পারে না, কারণ এমন নিয়ম আছে যে তাদের স্ত্রীদের কিছু কিছু সম্পত্তি থাকতে হবে। এর থেকে বিবাহ বিষয়ে রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা যায়। অধস্তন কর্মচারীদেরও একই নিয়ম মেনে চলতে হয়। তাদেরও বিবাহের জন্য অনুমতি নিতে হয়। আর সেই অনুমতি কর্তৃপক্ষ অনিচ্ছা সত্ত্বেও এবং খুব অল্প সংখ্যার বেলায় দিয়ে থাকে। অধিকাংশ সাধারণ সৈন্যদের বেলায় বিবাহের প্রশ্ন ওঠে না, তাদের বিবাহ করতে দেওয়া হয় না।

যুবকদের ২৪-২৫ বছর বয়সের পূর্বে বিবাহ কবা যে উচিত নয় এ বিষয়ে সকলেই একমত। আইনত ২৫ বৎসর বয়স হলে বিবাহের অধিকার দেওয়া হয়। তার কারণ তার আগে খুব কম লোকই স্ত্রী এবং পরিবারের ভরণপোষণ করতে সমর্থ হয়। অবশ্য রাজ পরিবারের বড় বড় লোকদের বেলায় তারতম্য করা হয়ে থাকে। তাদের তো আর বহু কষ্টের মধ্য দিয়ে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে হয় না। তাদের বেলায় ১৮।১৯ বছরের ছেলেদের এবং ১৫।১৬ বছরের মেয়েদের বিবাহ করতে দেওয়া হয়। বাস্তবিক পক্ষে রাজরাজড়ার ছেলেদের বেলায় ১৮ বৎসর বয়সেই তাদের উত্তরাধিকারের ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং মনে করা হয় যে তারা তখন থেকেই বহু জনবহুল বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করার উপযোগী হয়ে যায়। কিন্তু সাধারণ মানুষের বেলায় ২১ বৎসরের পূর্বে সম্পত্তি উত্তরাধিকারের ক্ষমতা দেওয়া হয় না।

বিবাহের বয়স সম্বন্ধে লোকের এই মতামত থেকে বোঝা যায় যে তারা মানুষের সামাজিক পদমর্যাদা অনুযায়ীই বয়স নির্ধারণ করে থাকে—তার শারীরিক বা মানসিক বিকাশের স্তর অনুযায়ী করে না। কিন্তু মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি কোন বিশেষ সামাজিক অবস্থা বা ধ্যান ধারণা বা বদ্ধমূল সংস্কারের বাধা মানে না, বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি

বিকশিত হয় এবং প্রকৃতির নিয়মেই সেগুলি চরিতার্থ করবার জন্য শারীরিক মানসিক কষ্ট সহ্য করেও প্রবল আবেগের সঙ্গে এগিয়ে যায়।

জলবায়ু এবং জীবন ধারণের ধরন অনুযায়ী যৌন জীবনের বিকাশের স্তরে তারতম্য দেখা যায়। গরম দেশের মেয়েরা ১০।১১ বছর বয়সেই বয়ঃসন্ধি হয়ে থাকে এবং তারা ছেলে কোলে করে মা হয়ে বসে, আর ২৫।৩০ বছরেই ঝরে যায়। উত্তরাঞ্চলের জলবায়ুতে চোদ্দ বা ষোল বছর বয়সে কখনও বা তারও পরে মেয়েদের বয়ঃসন্ধি হয়ে থাকে। তারপর আবার শহর ও গ্রামের মেয়েদের বেলায়ও তফাৎ দেখা যায়। কৃষকের ঘরের সুস্থ সবল উম্মুক্ত আবহাওয়ায় খেটে খাওয়া মেয়েরা শহরের দুর্বল, নার্ভাস, ক্ষীণাঙ্গী বড় ঘরের মেয়েদের চেয়ে গড়ে এক বৎসর পরে বয়ঃসন্ধি প্রাপ্ত হয়। তাদের শরীর স্বাভাবিক নিয়মেই বেড়ে ওঠে। শহরের ঐ সব মেয়েরা নানা রোগে ভোগে, ডাক্তাররাও হতাশ হয়ে যায়, তাদের স্বাভাবিক জীবনের পথেও নানারকম রীতিনীতি কুসংস্কার বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময়ই ডাক্তাররা বলে থাকেন যে বিয়ে থা করে স্বাভাবিক জীবন যাপন করলে তবেই এইসব অসুস্থ ক্ষীণাঙ্গী খিটখিটে কেতাদুরস্থ শহুরে মেয়েদের জীবনে পরিবর্তন আসতে পারে। কিন্তু তা হবে কেমন করে? পথে যে অনেক বাধা। আর কোন পুরুষ যদি এইরকম কঙ্কালসার মেয়েকে, যে কিনা হয়ত প্রথমবার মা হতেই অক্কা পেয়ে যাবে তাকে বিয়ে করতে দ্বিধা করে, তাকেও নিন্দা করা যায় না।

এই সব কিছু থেকেই দেখা যাচ্ছে যে শারীরিক মানসিক উন্নতির জন্য সম্পূর্ণ নূতন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন, যে শিক্ষা ব্যবস্থায় জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেবে আর **সমাজ ব্যবস্থার আমূল সংস্কার** না হলে তা সম্ভব নয়।

ব্যক্তি মানুষ আর সামাজিক মানুষের মধ্যে এই যে দ্বন্দ্ব, এ দ্বন্দ্ব এখন সমাজের পূর্বের যে কোন সময় থেকে তীব্রতর হয়েছে, আর তার থেকে অনেক কুফল দেখা দেয়। এর থেকে যে কত ব্যাধি সৃষ্টি হয় তা বলা নিষ্প্রয়োজন আর নারীরাই হয় তার বড় শিকার ; তার কারণ হল নারীরা যেভাবে যৌন জীবন যাপন করে ও তাদের স্বাভাবিক যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার পথে যত রকমের বাধা থাকে। মানুষের জীবনের স্বাভাবিক প্রয়োজন ও সামাজিক বিধি নিষেধের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব থেকে দুর্নীতি দেখা দেয়, গোপন অপরাধ প্রবণতার আধিক্য দেখা দেয়, আর তাতে অনেক ক্ষতি হয়। যুগের পর যুগ ধরে বিশেষ করে নারীরা গোপনে ও আইনের চোখে ধুলো দিয়ে যৌন প্রেরণা চরিতার্থ করে আসছে। প্রায় বাড়িতেই যে সব পত্র পত্রিকা পড়া হয়ে থাকে, তার মধ্যে খুব সুচতুর ভাবে এ সব ব্যাপারে কাজে লাগে এমন অনেক জিনিসের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে।

আর এগুলি সাধারণত মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্তদের জন্যই দেওয়া হয়ে থাকে, কারণ অত দামী দামী জিনিস গরিব মানুষদের নাগালের বাইরে। এইসব নির্লজ্জ বিজ্ঞাপনের পাশাপাশি খোলাখুলি ভাবেই আরও একটা ব্যবসা চলতে থাকে। নারীপুরুষ উভয়েই তা সমর্থন করে। তা হল অশ্লীল ছবি, বিশেষ ধারাবাহিক ফটোগ্রাফ এবং গদ্য-পদ্য সাহিত্য এবং ঐ ধরনের গদ্য-পদ্য সাহিত্য, যেগুলির শিরোনামাই এমন করে দেওয়া হয় যাতে মানুষের যৌন কামনার উদ্রেক হয়, যার জন্যে পুলিস সরকারী উকিলের দরকার হয়ে পড়ে কিন্তু পুলিস ও সরকারী উকিল এদিকে সোস্যাল ডেমোক্রেসীর অবস্থার থেকে উদ্ভূত যে সব বিপদ সভ্যতা, নৈতিকতা, বিবাহ ও পারিবারিক জীবনকে বিপন্ন করে তোলে তা নিয়েই ব্যতিব্যস্ত থাকে। আমাদের উপন্যাস সাহিত্যের বড় একটা অংশের মধ্যেও এই উগ্রতা দেখা যায়। এই অবস্থার মধ্যে যৌনপ্রবণতা উচ্ছৃংখলতা যে একটা অস্বাস্থ্যকর ও ক্ষতিকর হয়ে উঠবে এবং একটা ব্যাপক সামাজিক ব্যাধির সৃষ্টি করবে সেটাই স্বাভাবিক। অভিজাত শ্রেণীর নারীরা ভোগবিলাস আমোদ-প্রমোদ কাব্য সংগীতের মাদকতার মধ্যে ডুবে থাকে। তাদের শিক্ষা দীক্ষাগুলিও তাদের স্নায়বিক দুর্বলতা ও স্পর্শকাতরতাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। সব দিক থেকেই তাদের যৌন প্রেরণাকেই অত্যধিক বাড়িয়ে তোলা হয়ে থাকে আর তার ফলেই উচ্ছৃংখলতা দেখা দেবেই।

গরিব নারীরা অনেক রকমের ক্লান্তিকর বসা কাজ করে থাকে। তাতে তাদের নিম্নাঙ্গে রক্ত চলাচলের উপর প্রভাব পড়ে, আর এক নাগাড়ে বসে থাকার চাপে যৌন উত্তেজনা বাড়ে। এর মধ্যে সেলাই কলের কাজ অন্যতম। স্নায়ুর উপর ও যৌনজীবনের উপরে এর প্রভাব এত তীব্র যে দশ বারো ঘন্টা করে কাজ করলে কয়েক বছরের মধ্যেই খুব ভালো স্বাস্থ্যও ভেঙে যাবেই। খুব গরমের মধ্যে বহুক্ষণ কাজ করলেও যৌন উত্তেজনা বাড়ে, যেমন চিনি পরিষ্কার করা, ধোয়া ক্যালিকো ছাপা, ঘিঞ্জির মধ্যে রাত্রে কাজ করা, গ্যাসের আলোয় ঘরের মধ্যে কাজ করা—যেখানে নারী পুরুষ উভয়েই কাজ করে থাকে।

এই ভাবেই আমরা দেখতে পাই যে আমাদের সময়কার দোষ ত্রুটিগুলোর পিছনে অনেক রকমের পরিস্থিতি কাজ করছে। কিন্তু এই দোষগুলির মূলে রয়েছে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা এবং কোন নীতিবাক্য বা উপর উপর কোন ব্যবস্থা দিয়ে এর সংস্কার করা সম্ভব নয়।

বৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করা দরকার। সুস্থ জীবন ধারা চাই সর্বসাধারণের জন্য। সুস্থ জীবন ধারা, সুস্থ কাজ, সুস্থ শিক্ষা ব্যবস্থা এবং স্বাভাবিক প্রবৃত্তির স্বাভাবিক পরিতৃপ্তি। আর কোন সহজ পথ নেই।

নারীদের অনেক বাধা নিষেধ আছে যা পুরুষদের বেলায় নেই। পুরুষই

হল প্রভু। সমাজ একমাত্র তাকেই ভালবাসবার বা পাত্রী নির্বাচন করবার অধিকার দিয়েছে। নারীদের ভরণ পোষণের জন্য বিবাহ করতে হয়। সংখ্যায়ও তারা বেশি এবং সমাজের রীতিনীতিও যেমন তাতে মেয়েদের মতামত দেবার অধিকার নেই। পুরুষের মতামতের জন্য তাদের অপেক্ষা করে থাকতে হয় আর বরাতে যা আছে তা মেনে নিতে হয়। প্রথম সুযোগেই ভরণ পোষণের জন্য মেয়েদের বিবাহ করতে হয়, না হলে আইবুড়ো মেয়েদের বরাতে অনেক দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনা জুটে থাকে। তারপর তারা তাদের সংগী সাথী মেয়েদের দিকে তাচ্ছিল্য করে তাকায় যারা কিনা আত্মসম্মান রক্ষা করে প্রথম সুযোগেই পতিতা বৃত্তি গ্রহণের মতো বিবাহিত জীবনের কাছে আত্মসমর্পণ করেনি এবং একাকী জীবনের কণ্টকিত পথকে বেছে নিয়েছে

কিন্তু কোন পুরুষ যদি প্রেম করে বিয়ে করতে চায় তার সামাজিক পরিস্থিতি তার বাধা হয়ে দাঁড়ায়। প্রথমে তাকে নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে 'আমার কি স্ত্রী এবং পরিবারের ভরণ পোষণের ক্ষমতা আছে, সংসারের চাপে আমার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট হয়ে যাবে না তো ?' তার উদ্দেশ্য যত নির্মল হবে সে যদি শুধু ভালবেসেই পাত্রী নির্বাচন করতে যায় ততই তাকে এ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। আর বর্তমান অবস্থায় তাদের রোজগারের যা অবস্থা তাতে এ প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া অনেকের পক্ষে সম্ভব নয়, তাই তারা অবিবাহিতই থাকতে চায়। যাদের বিবেক একটু কম তাদের আবার অন্য বাধা আসে। মধ্যবিত্ত ঘরের হাজার হাজার যুবকদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে স্ত্রীর কিছু সম্পত্তি না থাকলে তারা পুরোপুরি খরচ চালাতে পারে না। প্রথম ক্ষেত্রে পুরুষরা সংসারের খরচ চালাতে পারবে না মনে করে আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মেয়েদের যোগ্য শিক্ষাদীক্ষা না থাকার দরুন ধরেই নেওয়া হয় যে স্বামী-দের কাছে তারা দাবি করবেই আর স্বামীদের তা মেটাবার ক্ষমতা নেই। শিক্ষিত ভাল মেয়েরা সে ধরনের নয়। তবে সাধারণত যে ভাবে লোকে পাত্রী খুঁজে থাকে তাদের মধ্যে ভাল মেয়েদের দেখা বেশি পাওয়া যায় না। বিবাহের জন্য যাদের হামেশাই দেখা মেলে তারা বাইরের আকর্ষণ দিয়ে স্বামী পাকড়াবার তালে থাকে এবং নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থা ও ব্যক্তিগত দোষ ত্রুটিগুলি কৃত্রিম জাঁকজমকের আড়ালে ঢেকে রাখতে চেষ্টা করে। এই সব মেয়েদের যতই বিয়ের বয়স হতে থাকে ততই তারা তাদের শিকারকে ফাঁদে ফেলার জন্যে ব্যাগ্র হয়ে পড়ে। এই ধরনের মেয়েরা বিয়ের আগে যে রকম সাজ পোশাক, গহনাগাঁটি ও বিলাস আমোদ-প্রমোদে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে বিয়ের পরেও তা ছাড়তে চায় না। সুতরাং পুরুষরাও অনেকে বিবাহ থেকে দূরে সরে থাকে ও তাদের আমোদ-প্রমোদ স্বাধীনতাকে বজায় রাখে। গরিব ও মধ্যবিত্তদের মধ্যে অনেক সময়ে মেয়েদের

নিজেদের জীবিকা ও সংসার চালাবার জন্য দোকানে কারখানায় কাজ করতে হয়। যার জন্য তারা গৃহ কর্মগুলি শিখে উঠবার সময় পায় না এবং অনেক সময়ে তাদের বিয়েও হয় না। অনেক ক্ষেত্রেই রোজগারের জন্য বাড়ির বাইরে থাকতে হয় বলে মায়েরা কন্যাদের সংসারী জীবনের শিক্ষা দেবার জন্য সময় পান না।

যে কোন কারণেই বিবাহ করতে পারেনি এরকম পুরুষের সংখ্যা ভীষণ ভাবে বেড়ে চলেছে। ১৮৭৫ সালের আদম সুমারী অনুযায়ী কুড়ি থেকে ৮০ বছর বয়সের জনসংখ্যার মধ্যে প্রতি ১০০০ পুরুষে ১০৫৪ জন ছিল নারী। এর মধ্যে অন্ততঃ শতকরা দশজন পুরুষ ছিল অবিবাহিত। সুতরাং প্রতি ১০০ জন নারীর মধ্যে মাত্র ৮৪ জন নারীর পক্ষে বিবাহের সম্ভাবনা ছিল। কোন কোন স্থলে এই অনুপাত আরও বেশি দেখা গেছে। উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে অবিবাহিত পুরুষের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। তার কারণ প্রথমতঃ তাদের মধ্যে বিবাহের খরচ অত্যন্ত বেশি এবং দ্বিতীয়তঃ বিয়ের প্রয়োজনটা তারা অন্যত্র অনেকখানি পুষিয়ে নেয়। যে সব শহরে পেনসনভোগী কর্মচারীরা ও সরকারী কর্মচারীরা বাস করে সেখানে অবিবাহিত মেয়েদের সংখ্যা অনেক বেশি দেখা যায়। এসব শহরে অবিবাহিত মেয়েদের সংখ্যা শতকরা ৩০ থেকে ৪০ এর মধ্যে দেখা যায়। এইসব বড় ঘরের মেয়েরা শিক্ষিত ও রুচি সম্পন্ন হয়ে থাকে। সমমর্যাদার পাত্র ছাড়া তাদের বিবাহ হতে পারে না এবং সম্পত্তি না থাকলেও বিবাহ হতে পারে না। বিশেষ করে বাঁধা উপার্জনের পরিবারগুলির মধ্যে এই অবস্থা দেখা যায় যে তাদের সামাজিক মর্যাদা আছে অথচ আর্থিক সংগতি নেই। এইসব ঘরের মেয়েদের অবস্থা বড়ই মর্মান্তিক। তারা বাইরে উপার্জন করে যে নিজেদের অবস্থার উন্নতি করবে সামাজিক বাধার জন্য সে উপায়ও থাকে না। বিশেষতঃ এইসব মেয়েদের জন্যই অভিজাত ঘরের মহিলাদের পৃষ্ঠপোষকতায় "সূচী শিল্প উন্নয়নের নারী সমিতি" (Women societies for promotion of Needlework) চেষ্টা করছে।

মেয়েদের সাহায্য করবার জন্য এও এক ধরনের কাজ। ঠিক যেমন শালজ (SCHULZE) করেছিলেন শ্রমজীবী পুরুষদের জন্য। এর থেকে সাহায্য হয় খুবই সামান্য। ব্যাপকভাবে হওয়া সম্ভব নয়। সংগে সংগে এটাও দেখা দরকার যে অভিজাত শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতাও ক্ষতিকর। তার একটা নৈতিক চাপ আছে। সমাজের আমূল পরিবর্তনের পথে বাধা সৃষ্টি করে। এই রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা এবং এই আইন কানুনই স্থায়ী হয়ে থাকবে এই ধরনের মনোভাব জাগায়। এর দ্বারা শ্রমজীবী মানুষদের পক্ষে অভিজাত শ্রেণীর কতৃত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে এবং মেয়েদের পক্ষে আরও

বেশি কঠিন হয়ে পড়ে। এই কারণেই এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে কোন বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায় না এবং ঐ একই কারণে প্রকৃত নারী মুক্তির ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানগুলির কোন তাৎপর্য নেই।

উপরোক্ত কারণগুলির জন্য কত মেয়েকে যে অবিবাহিত থাকতে হয় তার হিসাব করা কঠিন। তবুও তার কিছুটা হিসাব দেখা যাক। ১৮৭০ সাল নাগাদ স্কটল্যাণ্ডে কুড়ি বৎসর বয়সের উপর অবিবাহিত নারীদের সংখ্যা ছিল সমস্ত নারীদের সংখ্যার ৪৩ %। আর পুরুষদের সংখ্যার তুলনায় নারীদের সংখ্যা ছিল শতকরা ১১০ জন। ইংল্যাণ্ডে (ওয়েলস বাদে) ২০ বৎসর থেকে ৮০ বৎসর বয়সের মধ্যে নারীদের সংখ্যা ছিল পুরুষদের সংখ্যার চেয়ে ১,৪৭৪,২২৮ জন এবং ৪০ বৎসরের উর্ধ্বে অবিবাহিত নারীর সংখ্যা ছিল ৩৫৯,৯৬৯ জন। শতকরা ৪২ জন নারী অবিবাহিত ছিল। এই বিষয়টির গভীরে না গিয়েই অনেকে বলে থাকেন মেয়েদের স্বাধীনতা এবং সমান অধিকারের দিকে না গিয়ে বিবাহ ও পারিবারিক জীবনের দিকে যাওয়া উচিত। এত নারীকে যে অবিবাহিত থাকতে হয় তা যে তাদের নিজেদেরই সদ্ ইচ্ছার অভাবেই তা নয়। আর বিবাহিত জীবনের সুখের কথা তো আগেই আলোচনা করে দেখানো হয়েছে যে তার পরিণতি অনেক সময়ই কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

আর যারা আমাদের সামাজিক অবস্থারই শিকার তাদের অদৃষ্টে কি জোটে ? প্রকৃতি তার প্রতিশোধ নেয়। নরনারী উভয়েরই চেহারা ও চরিত্রে তার ছাপ পড়ে। সর্বত্রই এই অবিবাহিত নারী পুরুষেরা সাধারণ মানুষের থেকে তফাৎ হয়। সহজাত প্রবৃত্তি দমন করবার কুফল তাদের উপর পড়ে। বলা হয়ে থাকে যে উচ্চস্তরের মেধাবী মানুষ, যেমন প্যাসকাল (Pascal) নিউটন, রুশো তাদের শেষ জীবনে কঠিন মানসিক ব্যাধিতে ভুগেছিলেন। তার থেকেই মেয়েদের নানারকম মানসিক ব্যাধি মৃগীরোগ ইত্যাদি হয়। স্বামীর সাথে ভালবাসা না থাকলেও দাম্পত্য জীবনে মেয়েরা অসুখী হয়, অনেক সময় তাদের স্নায়ুরোগ হয় এমনকি তারা বন্ধ্যাও হয়ে থাকে।

এই হল আমাদের আধুনিক বিবাহ ও তার ফলাফলের ছবি। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার সংগেই এই বিবাহ ব্যবস্থা জড়ানো রয়েছে এবং তার সংগেই এর উত্থান পতন। বর্তমান সমাজ কাঠামোর মধ্যে এই বিবাহ ব্যবস্থার পরিবর্তন করা সম্ভব নয়, তার সমস্ত চেষ্টাই চরম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে থাকে। বুর্জোয়া দুনিয়া বিবাহ বিধির সন্তোষজনক পরিবর্তন করতে অসমর্থ আর অবিবাহিতদের জন্যও কোন সন্তোষজনক পরিবর্তন করতে অসমর্থ।

বর্তমান যুগে নারীর অবস্থা

গণিকাবৃত্তি—বুর্জোয়া দুনিয়ার একটি প্রয়োজনীয় বিধান

বুর্জোয়া দুনিয়ায় মানুষের যৌন জীবনের অর্ধেকটা হল বিবাহের মধ্যে, আর বাকি অর্ধেকটা থাকে গণিকা বৃত্তির মধ্যে। একটাই পদকের সামনের দিকটা হল বিবাহ, আর পিছনের দিকটা গণিকাবৃত্তি। কোনো পুরুষ যখন বিবাহিত জীবনে পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারে না, সে তখন বেশ্যালয়ে যায়। আবার কোনো পুরুষ যখন যে কোনো কারণে অবিবাহিত থেকে যায়, তখনো সে বেশ্যালয়ে যায়। সমাজের বিধিব্যবস্থা এমনই করা হয়েছে যে কোনো পুরুষ স্বেচ্ছায় বা অবস্থা বিপাকে অবিবাহিত থাকলে, অথবা বিবাহিত জীবনে সুখী হতে না পারলে তার যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার পথ খোলা থাকে, কিন্তু নারীদের বেলায় সে সব পথ বন্ধ।

সব দেশেই সব সময় বেশ্যাদের ভোগ করা কেবলমাত্র পুরুষদেরই স্বাভাবিক অধিকার বলে ধরে নেওয়া হয়। আবার ঠিক তার বিপরীতভাবে অতি সতর্কতার সঙ্গে তারা বেশ্যালয়ের বাইরের নারীদের উপর নজর রাখে। পুরুষরা একথা ভাবে না যে তাদের মতো নারীদেরও যৌন প্রবৃত্তি প্রবল থাকে, আর সময় বিশেষে (ঋতুকালীন অবস্থায়) সে প্রবৃত্তি আরো প্রবল হয়। পুরুষ প্রভুর স্থানে থেকে নারীকে জোর করে তার প্রবলতম প্রবৃত্তিকে দমন করে রাখতে বাধ্য করে, আর নারীর সতীত্বকে বিবাহ ও সামাজিক মর্যাদার পূর্বসর্ত করে রাখে। পুরুষ ও নারীর মধ্যে স্বাভাবিক যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার বিষয়ে এই যে সম্পূর্ণ বিপরীত বিধি চলে আসছে, পুরুষের কাছে নারীর বশ্যতার এর চেয়ে চরম ও বিরক্তিকর উদাহরণ আর নাই।

পরিস্থিতি অবিবাহিত পুরুষদের অনুকূলে। প্রকৃতির নিয়মে নারীকেই সন্তান ধারণ করতে হয়, পুরুষ শুধু ভোগ করে, কোনো দায়দায়িত্ব তার বহন করতে হয় না। পুরুষদের জগতের একটা বড় অংশই তাই সুবিধার সুযোগে অবাধ যৌন উচ্ছৃংখলতা চালিয়ে আসছে, আইনসংগত স্বাভাবিক পথে যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার শত রকমের বাধা বিপত্তি থাকার দরুন বে-আইনী গোপন পথে পা বাড়াতে হয়।

পুলিস, স্থায়ী সৈন্যবাহিনী, গীর্জা, ধনিক শ্রেণী ইত্যাদি ইত্যাদির মতো

গণিকাবৃত্তিও সমাজের একটি প্রয়োজনীয় বৃত্তি হয়ে পড়ে। এ কোন অতিরঞ্জিত কথা নয়, এ কথা জোর করে বলা যায় ও প্রমাণ করা যায়।

প্রাচীন সমাজ গণিকাবৃত্তিকে কিভাবে দেখত তা আগেই বর্ণনা করা হয়েছে। তখন গণিকাবৃত্তিকে অপরিহার্য মনে করা হত এবং গ্রীস ও রোমে রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকেই গণিকালয়গুলি নিয়ন্ত্রিত হত। এ বিষয়ে মধ্যযুগের খ্রীষ্টধর্মের মতামতও উদ্ধৃত করা হয়েছে, এমনকি সেন্ট আগাষ্টিনও, যাঁর নাম খ্রীষ্টধর্মের স্তম্ভ পলের পরেই আসে, যদিও তিনি নিজে একজন কৃচ্ছ্রসাধনার প্রবক্তা ছিলেন, তিনিও এ কথা তারস্বরে না বলে পারেননি ঃ "বেশ্যালয়গুলি তুলে দিলে উচ্ছৃঙ্খলতায় সারা রাষ্ট্র উচ্ছন্নে যাবে।" মিলানের "প্রভিনসিয়াল স্পিরিচুয়্যাল কাউন্সিল" ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ঐ একই মতামত প্রকাশ করে।

আধুনিক জগৎ কি বলে শোনা যাক। ডক্টর F. S. Hugel (ডক্টর এফ এস. হিউগেল) তাঁর হিষ্ট্রি, স্ট্যাটিসটিক এন্ড রেগুলেশন অফ প্রসটিটিউসন ইন ভিয়েনা (History, Statistics and Regulation of Prostitution of Vienna) পুস্তকে লিখেছেন, "সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ গণিকাবৃত্তির উপর মনোরম আবরণ বিছিয়ে দেওয়া হবে, কিন্তু দুনিয়া থেকে কোনদিন এর উচ্ছেদ করা যাবে না।" যারা বুর্জোয়া দুনিয়ার বাইরে দৃষ্টি প্রসারিত করতে পারে না এবং সমাজের অভ্যন্তরে যে পরিবর্তন সংগঠিত হয়ে সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় আসার কথা বুঝতে পারে না, তারা সকলেই ডক্টর হিউগেলের সঙ্গে একমত হবে।

এই কারণেই হামবুর্গের নিকটবর্তী রাউ হাস-এর (Rauhe Haus) বিখ্যাত গোঁড়া পরিচালক ডক্টর উইচার্ন (Dr Wichern) লাইঅয়েসের (Lyous) ডক্টর পালটনের, এডিনবরার ডক্টর উইলিয়াম ট্রেট (William Tret) এবং প্যারিসের ডক্টর পারেন্ট ডাচেটালেট (Dr. Parent Duchatelet) (গণিকাবৃত্তি ও যৌন-ব্যাধির উপর অনুসন্ধান কাজের জন্য বিখ্যাত) একমত হয়ে ঘোষণা করেন "গণিকাবৃত্তি দূর করা অসম্ভব কারণ এ হল আমাদের সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংগ এবং তারা সকলেই দাবি করেন যে রাষ্ট্র থেকে গণিকাবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। এঁদের কারো মাথায় একথা আসেনি যে, যে সমাজব্যবস্থায় গণিকাবৃত্তির প্রয়োজন সেই সমাজব্যবস্থাকেই আমাদের পালটাতে হবে। অর্থনীতি বিষয়ে তাঁদের অজ্ঞতা এবং তাদের বদ্ধমূল সংস্কারের দরুন সমাজব্যবস্থা পালটানোর ব্যাপারটা তাদের কাছে অসম্ভব বলে মনে হয়। ভিয়েনার মেডিকেল সাপ্তাহিক (Viennese medical weekly paper) The wiener Medicioische wochenschrift ১৮৬৩, নং, ৩৫এ বলা হয়েছে, "এত বিরাট সংখ্যক পুরুষ যারা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অকৃতদার থেকে যাচ্ছে তারা নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল

আহরণ করা ছাড়া নিজেদের স্বাভাবিক যৌন প্রয়োজন মেটাবে কি করে ?" এবং লেখক তার থেকে এই সিদ্ধান্তে এলেন যে যেহেতু গণিকাবৃত্তির প্রয়োজন আছে তার টিকে থাকবার এবং শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাবার এবং রাষ্ট্রের সহায়তা পাবার অধিকার আছে। ডাঃ হিউগেন তাঁর উপরোক্ত রচনায় ঠিক এই মতামতই ঘোষণা করেছেন।

লিপজিগ-এর পুলিস সার্জন ডঃ জে কুন (Kuhn) তাঁর "prostitution in the Nineteenth century from the stand point of the sanitary police" পুস্তকে লিখেছেন গণিকা বৃত্তি ক্ষতিকর হলেও তাকে সহ্য না করে উপায় নেই। এ হল ক্ষতিকর তবু অবধারিত। কারণ গণিকাবৃত্তি নারীদের ব্যাভি-চারী হবার হাত থেকে রক্ষা করে, (যে বিষয়ে অপরাধ করবার অধিকার একমাত্র পুরুষদেরই আছে) নিষ্ঠাবতী রাখে, (অবশ্য নিষ্ঠার কথাটা শুধু নারীদের বেলায় আসে, পুরুষদের বেলায় প্রয়োজন হয় না) আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করে সুতরাং পতনের হাত থেকে রক্ষা করে। ডঃ কুনের এই কয়েকটি কথার মধ্য থেকে পুরুষদের চরম আত্মম্ভরিতার নগ্নরূপ প্রকাশ হয়ে পড়েছে। এই হল একজন পুলিস সার্জেনের কথা যে কিনা পুরুষদের অবাঞ্ছিত ব্যাধি থেকে রক্ষা করার জন্য গণিকাদের উপর নজর রাখার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন।

আমার এ কথা কি ভুল যে বর্তমানে পুলিস, স্থায়ী সৈন্য বাহিনী, গির্জা পুঁজিপতি ইত্যাদি ইত্যাদির মতো গণিকা বৃত্তিও একটি প্রয়োজনীয় সামাজিক বিধান ?

জার্মান সাম্রাজ্যের মতো ফ্রান্সে রাষ্ট্র থেকে গণিকাবৃত্তির ব্যাপারটা মঞ্জুর করা, সংগঠিত করা বা নিয়ন্ত্রিত করা হয় না কিন্তু গণিকা বৃত্তিটা থেকে যায়। ফেডারেল কাউন্সিল আইন করে সরকারী গণিকালয়গুলি তুলে দিয়েছে। তার ফলে এই মর্মে রাইগস্ট্যাগের কাছে অসংখ্য দরখাস্ত এসেছে যে সেই গণিকালয়-গুলি আবার বসানো হোক তা না হলে চতুর্দিকে অবাধে ব্যাভিচার ছড়িয়ে পড়ছে এবং সিফিলিস রোগও ভয়াবহ ভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। রাইগস্ট্যাগ এই বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখার জন্য বেশ কয়েকজন ডাক্তারকে নিয়ে একটি কমিশন বসালেন। তাঁরা ঐ দরখাস্ত ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলের কাছে অনুমোদন করে পাঠালেন এবং এই সিদ্ধান্তে এলেন যে সরকারী গণিকালয়গুলি নিষিদ্ধ করায় সমাজের নৈতিক জীবন ও স্বাস্থ্যের উপর বিশেষ করে পারিবারিক জীবনের উপর তার মারাত্মক প্রভাব পড়েছে। এই প্রমাণগুলি যথেষ্ট। এর থেকে দেখা যায় যে আধুনিক সমাজে গণিকাবৃত্তি হল এমনি একটা দানবিক যার হাত থেকে রক্ষা পাবার উপায় নেই। এর বিপদ থেকে রক্ষা পাবার আর কোন পথ

নেই তাই বৃহত্তর সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য রাষ্ট্র থেকেই এর অনুমোদন ও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।

এইভাবেই যে সমাজ তার নৈতিকতা, ধর্ম, সভ্যতা ও কৃষ্টির জন্য গর্বিত সেই সমাজদেহের মধ্যেই ব্যাভিচারের বিষক্রিয়া চলতে থাকে। শুধু তাই নয় খ্রীষ্টান রাষ্ট্র সরকারী ঘোষণাতেই বলে যে বর্তমান বিবাহপ্রথার মধ্যে ত্রুটি আছে এবং তারই জন্যে পুরুষদের অধিকার আছে আইন নিষিদ্ধ পথে তাদের যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার। সেই একই রাষ্ট্র শুধু অবিবাহিত মেয়েদেরই পুরুষদের অবৈধ কামনার কাছে আত্মসমর্পণ করতে ও পতিতার জীবন যাপন করতে বলে। আর সরকারী কর্মচারীরা পুরুষদের গায়ে হাত দেয় না, শুধু নারীদের বেলাতেই কড়াকাড়ি নিয়ম করে থাকে।

রাষ্ট্র থেকেই নারীদের কাছ থেকে পুরুষদের রক্ষা করার এই যে ব্যবস্থা তার ফলেই নারী পুরুষের সম্বন্ধটাও উল্টো রকমের দেখা যায়। যেন পুরুষরাই দুর্বল আর নারীরাই শক্তিশালী পুরুষদের প্রলোভন দেখায় আর বেচারা অসহায় পুরুষরা প্রলুব্ধ হয়ে যায়। স্বর্গে ইভের দ্বারা এডামকে প্রলুব্ধ করার সেই কাহিনী ও খ্রীষ্ট ধর্মের নীতি বাক্য এখনও আমাদের ধ্যান-ধারণায় আইন কানুনের মধ্যে গেঁথে রয়েছে। নারী মায়াবিনী নরকের দ্বার। আশ্চর্য এই যে এমন অবস্থায় দুর্বলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পুরুষদের লজ্জা করে না।

সাধারণের মধ্যে এই ধারণা আছে যে পুরুষদের ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য রাষ্ট্র থেকেই গণিকাবৃত্তির ব্যাপারটা দেখাশুনা করা দরকার। এর থেকে লোকের বিশ্বাস হয় যে রাষ্ট্র থেকে দেখা শোনা করলেই বুঝি ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে আর তার ফলে গণিকাবৃত্তি আরও অনেক ছড়িয়ে যাবে। এর প্রমাণ স্বরূপ দেখা গেছে যে সরকারী খাতায় যে সব গণিকাদের নাম রেজিস্ট্রী করা নেই তাদের উপর পুলিস কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করলেই পুরুষরা নিজেদের খুব নিরাপদ মনে করে আর তখনই সিফিলিস রুগীর সংখ্যা প্রচুর বাড়তে থাকে।

কিন্তু অভিজ্ঞ লোকদের এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে গণিকালয়গুলির উপর পুলিস খবরদারী করলে বা গণিকাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিষয়ে তদারক করলেই তার সংক্রামক ব্যাধির থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না। প্রথমত এইসব ব্যাধিগুলি সহজে ধরা পড়ে না। দ্বিতীয়ত তার জন্য বারবার পরীক্ষা করে দেখা দরকার। গণিকাদের সংখ্যার তুলনায় এরজন্য যে খরচ বরাদ্দ আছে তাতে তা করা সম্ভব নয়। যখন এক ঘণ্টার মধ্যে পঞ্চাশ বা ষাটজন গণিকাকে পরীক্ষা করতে হয় তখন সেটা একটা প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয় আর সপ্তাহে

একবার কি দুবার তা করলেও যথেষ্ট হয় না। সর্বোপরি পুরুষরা একজন নারীর থেকে আর এক জন নারীর মধ্যে সংক্রামক রোগ ছড়ায়। সুতরাং শুধু গণিকাদের পরীক্ষা করার কোন মানেই হয় না। একজন গণিকাকে ডাক্তারী করে নীরোগ বলার সঙ্গে সঙ্গেই এক ঘণ্টার মধ্যেই যে কোন পুরুষের কাছ থেকে তার মধ্যে সংক্রামক ব্যাধি প্রবেশ করতে পারে আবার সেও অন্য পুরুষদের মধ্যে তা ছড়িয়ে দিতে পারে। সুতরাং রাষ্ট্রের গণিকাবৃত্তির উপর তদারকি ব্যবস্থাটা একটা ভুয়ো জিনিস। পুরুষ ডাক্তারদের দ্বারা পরীক্ষার ব্যবস্থাটাও একেবারে অশালীন। গণিকারাও সরকারী খবরদারী থেকে রেহাই পাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে থাকে। পুলিসের খবরদারীর আরও একটা কুফল এই যে কোন গণিকারই আর স্বাভাবিক সৎ জীবনে ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকে না। পুলিসের হাতে পড়লে কয়েক বছরের মধ্যেই তার চরম সর্বনাশ ঘটে থাকে।

গণিকাদের উপর ডাক্তারীর বিষয়ে পুলিসের খবরদারীর ফল যে কি ইংলণ্ডে তার জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৮৮৬ খ্রীঃ সেখানে এই মর্মে একটি আইন পাশ হয়েছিল যে যেখানে নৌবাহিনী বা সৈন্যবাহিনী আছে সেখানে গণিকাদের ডাক্তারী পরীক্ষা করতে হবে। এই আইন কার্যকরী হবার আগে ১৮৬০ সাল থেকে ১৮৬৬ সালের মধ্যে সিফিলিস রোগীর সংখ্যা শতকরা ৩২.৬৮ থেকে শতকরা ২৪.৭৩ অংশ কমে গিয়েছিল। এই আইন কার্যকরী হবার ছয় বছর পর্যন্ত ১৮৭২ সালে এই সংখ্যা ছিল শতকরা ২৪.২৬, অর্থাৎ ১.২ শতাংশ অর্থাৎ ১৮৬৬ সাল থেকে ১.২ শতাংশ কম, আর এই ছয় বছরের গড় সংখ্যা ছিল ১৮৬৬ সাল থেকে ১.১৬ শতাংশ বেশি।

এই বিষয়ে অনুসন্ধান করবার জন্য ১৮৭৩ সালে একটি কমিশন গঠিত হয়। তারা সবাই একমত হয়ে এই সিদ্ধান্তে আসে যে, যেসব গণিকারা সেনাবাহিনী বা নৌবাহিনীর সঙ্গে মিশছে তাদের মেডিকেল পরীক্ষা করে কোনই সুফল পাওয়া যাচ্ছে না সুতরাং তারা এই সব পরীক্ষা ব্যবস্থা তুলে দেবার সুপারিশ করেন।

কিন্তু যে সব গণিকারা সৈন্যদের সংগে মিশত তাদের বেলায় এই আইনের ফল অন্য রকম দেখা যায়। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতি একহাজার গণিকাদের মধ্যে ১২১ জন ব্যাধিগ্রস্থ ছিল। এই আইন পাশ হবার দুবছর পর ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ঐ সংখ্যা দাঁড়ায় ২০২ জন। তারপর ক্রমশ তাদের সংখ্যা কমতে থাকে। কিন্তু আবার ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তাদের সংখ্যা ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৬ জন বেশি ছিল। এই আইনের ফলে গণিকাদের মধ্যে মৃত্যু সংখ্যা ভয়াবহ ভাবে বেড়ে যায়। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এই মৃত্যু সংখ্যার অনুপাত ছিল প্রতি ১০০০ হাজারে ৯.৮ জন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২৩ জন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের

পূর্বে ইংরাজ সরকার সমস্ত শহরগুলিকে যখন এই আইনের আওতায় আনার চেষ্টা করে তখন ইংলন্ডের নারীদের মধ্যে প্রচন্ড প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। তারা এটা তখন সমগ্র নারী সমাজের অপমান বলে মনে করে। তারা বলে যে এর দ্বারা তাদের পুলিসদের খবরদারী থেকে মুক্ত নাগরিক স্বাধীনতার হস্তক্ষেপ করা হবে এবং পুলিসরা ইচ্ছামতন তাদের হীন যে কোন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার জন্যে যে কোন নারীকে অপমান করবার সুযোগ গ্রহণ করবে ; অন্যদিকে পুরুষদের বেপরোয়া স্বেচ্ছাচার আইনের প্রশ্রয়ই পেতে থাকবে। যদিও পতিতা নারীদের পক্ষে কথা বলার জন্য অনেক সংকীর্ণ মন মানুষই তাদের ভুল বুঝেছে তবুও ইংলন্ডের নারীরা এই অপমান জনক আইনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এই বিষয়ে লেখালেখি হয়েছে। পার্লামেন্টে আইনটি আসে এবং অবশেষে এই আইনের আওতাকে বাড়ানোর বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। জার্মান পুলিসরা সর্বত্রই আধিপত্য খাটিয়ে থাকে। লিপজিক, বার্লিন এবং অন্যান্য জায়গা থেকে যে সব খবর পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় তারা এই আইনের অপব্যবহার করে থাকে কিন্তু তার বিরুদ্ধে কোন বলিষ্ঠ প্রতিবাদ শোনা যায় না। (From Guilloume Schack) ফ্রম গুলাম শ্যেক ঠিকই বলেছেন যে "যদি রাষ্ট্র থেকেই ঘোষণা করা হয় দুর্নীতি একটা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আর কাঁচা বয়সের ছেলেদের যদি আমোদ প্রমোদের মতো কর্তৃপক্ষ থেকেই ছাপ দিয়ে নারীদের তুলে দেওয়া হয় তবে আমরা আমাদের ছেলেদের কেনই বা ন্যায়নীতির প্রতি শ্রদ্ধা করতে শিখিয়ে থাকবো।"

সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্থ পুরুষরা অসংখ্য নারীদের মধ্যে সেই ব্যাধি ছড়িয়ে দিয়ে থাকে। কিন্তু তার জন্য পুরুষদের কোন দুর্ভোগ ভুগতে হয় না। আর মেডিকেল পরীক্ষা সময়মতো না করালে নারীদের অনেক দুর্ভোগ ভুগতে হয়। গ্যারিসন শহর বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি জায়গায় বহুসংখ্যক সুস্থসবল পুরুষ আছে। সেইসব জায়গাগুলিতে ব্যাপকভাবে গণিকাবৃত্তি ছড়িয়ে পড়েছে। আর তার সর্বনাশা ফল দেশের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। বন্দরের শহরগুলিরও ঐ একই অবস্থা। "তোমার পাপ তোমার সন্তান সন্ততিদের উপর বংশানুক্রমে তৃতীয় এবং চতুর্থ বংশধরদের উপর বর্তাবে"। বাইবেলের এই বাণী যৌন ব্যাধিগ্রস্থ মানুষদের বেলায় সম্পূর্ণ খাটে। সিফিলিস রোগের বিষ কিছুতেই নষ্ট হতে চায় না। এই ব্যাধির বিষ প্রাথমিক স্তরে শরীরে প্রবেশ করার অনেক বৎসর পর যখন মা বাপের মনে হয় যে রোগমুক্ত হয়ে গেছে তখনও দেখা গেছে যে স্ত্রী বা নবজাতক শিশুদের* মধ্যে আবার সেই রোগ নতুন করে দেখা

* ১৮৭৫ সালে ইংলণ্ডের হাসপাতালগুলির রোগীদের মধ্যে শতকরা ১৪ জনই ছিল বংশগতভাবে প্রাপ্ত উপদংশ রোগাক্রান্ত, ১৯০ জন মারাত্মক রোগাক্রান্তর মধ্যে লণ্ডনে

দিয়েছে। মা বাপের অপরাধে অনেক শিশুকে অন্ধ হয়ে জন্মাতে দেখা গেছে। মায়ের শরীরের ব্যাধি শিশুর শরীরে প্রবেশ করে। এই জন্য অনেক সময় শিশুদের মানসিক দুর্বলতা দেখা যায়। সিফিলিস রোগের সামান্য বিষের থেকে অতি ভয়ংকর ফল ফলতে থাকে।

এদিকে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যতলোক অবিবাহিত থাকে সেই তুলনায় যৌন দুর্নীতিও বেড়ে যায়। এই সব অবৈধ যৌন দুর্নীতির জন্য আবার এক ধরনের ব্যবসাদাররাও প্রচুর লাভ করে থাকে। তারা খদ্দেরের পকেটের অবস্থা বুঝে প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করে থাকে। প্রকাশ্য গণিকালয়গুলির গোপন খবরাখবর যদি বেরিয়ে পড়ে তাহলে দেখা যাবে যে সেইসব জায়গার গণিকাদের যাদের বেশির ভাগই আসে সমাজের অত্যন্ত নিম্নস্তর থেকে, তাদের শিক্ষাদীক্ষার বালাই থাকে না। এমনকি হয়ত নিজের নামটাও লিখতে পারে না, কিন্তু তাদের মন ভোলাবার ক্ষমতা আছে—তাদের সমাজের নেতৃস্থানীয় বিদ্বান বুদ্ধিজীবিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। সেখানে দেখা যাবে যে এই গণিকালয়গুলিতে একাধারে কেবিনেট মন্ত্রীরা, সরকারী অফিসাররা, প্রিভি কাউন্সিলের সদস্যরা, পার্লামেন্টের সদস্যরা, জজরা ইত্যাদির সঙ্গে প্রবেশ করছে অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা, ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতিনিধিরা সবাই, এইসব লোকেরা দিনের বেলায় সমাজের কাছে গুরুগম্ভীর, সমাজের ও পরিবারের মাথা, ন্যায় নীতির বিশেষজ্ঞরূপে দেখা দেয়। তারা খ্রীষ্টান দান ধ্যানের মুরুব্বি। গণিকাবৃত্তি দমনের প্রবক্তা। সমাজে এমনই মজার ব্যাপার চলছে যে সবাই সবাইকে ধোঁকা দিয়ে চলতে চায়, বাইরে একরকম, ব্যক্তিগত জীবনে একরকম। সাধারণের মধ্যে ন্যায় নীতি ধর্ম নৈতিকতা সবই এইভাবে বজায় রাখা হয়। আর দৈবজ্ঞদের সংখ্যাও দিন দিন বাড়তে থাকে।

যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য নারী সরবরাহ চাহিদার চেয়েও বেড়ে চলে। আমাদের সমাজের দুরবস্থা, সামাজিক পরিস্থিতি, প্রয়োজন, প্রলোভন, ভোগবিলাসের লালসা—এ সবের জন্যই সর্বস্তরের লোকের মধ্য থেকেই চাহিদা দেখা যায়। *হ্যানসওয়াচেন হুসেন*-এর (Hans Wachen husen)* একটি উপন্যাসের মধ্যে জার্মান সাম্রাজ্যের রাজধানীর অবস্থাটার চমৎকার বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেছেন ঃ "আমার বই-এ যে নারীরা গণিকাবৃত্তির শিকার হয় প্রধানতঃ তাদের বিষয়েই বলা হয়েছে, সমাজের

এই রোগে একজনের মৃত্যু হয়েছে; ইংলণ্ডে তার অনুপাত ছিল ১ : ১০৯। ফরাসী অনাথশ্রমে, ১ : ১৬০'৫।

* Was die Strasse ver:chlingt (What the Street Swallows). *Socia* novel in 3 Vols. A. Hoffmann & Co. Berlin.

অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে পড়ে তাদের যৌন জীবনের যেমন করে অধঃপতন ঘটে, মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে তাদের নিজেদের দোষেই—শিক্ষাদীক্ষার প্রতি অবহেলা, ভোগবিলাসের কামনা, বাজারের বাজে জিনিস সরবরাহের জন্য যে অধঃপতন ঘটে সেই বিষয়েই বলা হয়েছে। এই বই-এ দৈনন্দিন জীবনে উদগ্র যৌনকামনার জন্যই তরুণদের মধ্যে যে নৈরাশ্য ও বেপরোয়া ভাব দেখা দেয় সেই বিষয়ে বলা হয়েছে। সরকারী উকিল যেভাবে অপরাধীর দোষগুলি সংক্ষেপে বলে যায়, আমি সেইভাবেই বলে গিয়েছি। সুতরাং উপন্যাসকে যদি বলা হয় কাল্পনিক, বাস্তবের বিপরীত ও বাস্তবের দোষগুণ থেকে মুক্ত, তাহলে সে অর্থে এই বইখানিকে মোটেই উপন্যাস বলা চলে না, কারণ এর মধ্যে আছে জীবনের অকৃত্রিম সত্যের বর্ণনা।" বার্লিনের অবস্থা এখন অন্য যে কোনো বড় শহর থেকে ভালও না, মন্দও না। প্রাচীন বেবিলন, সাবেকী গ্রীক, সেণ্ট পিটার্সবার্গ ক্যাথলিক লণ্ডন অথবা প্রাণবন্ত ভিয়েনা—কোন্ জায়গাটার যে এগুলির সংগে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্য তা বলা কঠিন। একই সামাজিক অবস্থায় একই পরিণতি হয়ে থাকে। "গণিকাবৃত্তির নিজস্ব লিখিত ও অলিখিত কানুন আছে, সঙ্গতি আছে, দরিদ্রতম কুটির থেকে জমকাল প্রাসাদ পর্যন্ত এর বহুবিধ অবলম্বন আছে, নিম্নতম স্তর থেকে শুরু করে উচ্চস্তরের শিক্ষিত মার্জিত অংশ থেকে নানা পর্যায়ের পতিতারা আসে। গণিকাবৃত্তির জন্য বিশেষ প্রমোদব্যবস্থা, মেলা-মেশার সাধারণ স্থান আছে, পুলিস আছে, হাসপাতাল, জেলখানা আছে এবং সাহিত্যও আছে"*

এই পরিস্থিতিতে নারী দেহ নিয়ে ব্যবসা প্রচণ্ডভাবে বেড়ে চলেছে। আমাদের সমস্ত সভ্যতা সৃষ্টির মধ্য দিয়েই এই ব্যবসা চমৎকার সংগঠনের দ্বারা, অত্যন্ত ব্যাপকভাবে, পুলিসের চোখ এড়িয়ে চলে থাকে। এই ব্যবসায় নারী পুরুষ উভয় পক্ষের এজেণ্ট ও দালালরা এমন ঠাণ্ডামাথায় চালিয়ে থাকে যেন তারা বাজারের যে কোনো পণ্যেরই লেনদেন করছে। তারা জন্ম সার্টিফিকেট, চালান, ব্যবসায়ের "সামগ্রীর" বর্ণনা অতি নিপুণভাবে করে খরিদ্দারের হাতে দেয়। অন্য সমস্ত পণ্যদ্রব্যের মতই ভালমন্দের উপর তার দরদাম নির্ভর করে। বিভিন্ন ধরনের গণিকাদের ভাগ ভাগ করে বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন দেশে তাদের রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী খরিদ্দারদের কাছে পাঠানো হয়। এই এজেণ্টরা পুলিসের হাত থেকে বাঁচার জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা করে থাকে। অনেক সময়ই আদালতের আমলাদের চোখ বন্ধ করবার জন্য মোটা মোটা টাকা খরচ করে থাকে। এ সব সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিশেষতঃ প্যারিসে তো বটেই।

* Dr. Elizabeth Blackwell : The moral Education of the youg in relation to sex.

এই নারী ব্যবসায়ে অর্ধেক জুনিয়ার নারীই জার্মানী থেকে চালান যায় বলে শোনা যায়। জার্মানদের ভবঘুরে জীবনের প্রতি আকর্ষণ নারীদের মধ্যেও ছড়িয়ে গেছে। আন্তর্জাতিক গণিকাবৃত্তির জন্য অন্য যে কোনো দেশ থেকে জার্মানী থেকেই নারীদের বেশি পাওয়া যায়। তারা তুর্কীর রক্ষিতালয়গুলি ভর্তি করে, তারা সাইবেরিয়ার অভ্যন্তর থেকে শুরু করে বম্বে, সিঙ্গাপুর, নিউ ইয়র্কের সাধারণ গণিকালয়গুলি ভর্তি করে। ডরু জোয়েষ্ট (W. Joest) নামক জনৈক লেখক তাঁর 'সাইবেরিয়ার মধ্য দিয়ে জাপান থেকে জার্মানী' (from Japan to Germany through Siberia) নামক ভ্রমণকাহিনীতে জার্মানীর মেয়ে ব্যবসা সম্বন্ধে লিখেছেন: "আমাদের নীতিবাগীশ জার্মানীতে লোকে উত্তেজিত হয়ে বলে থাকে পশ্চিম আফ্রিকার রাজকুমারদের দাস ব্যবসা চলিবার কথা, অথবা কিউবা বা ব্রেজিলের অবস্থার কথা, তাদের উচিৎ নিজেদের চোখের ঠুলি খুলে দেখা যে পৃথিবীর আর কোনো দেশেই এরকম নারী ব্যবসা চলে না, আর কোনো দেশ থেকেই এমন মনুষ্যদেহরূপী পণ্যসামগ্রী বিদেশে চালান যায় না। কোন্ পথে এই নারীদের চালান দেওয়া হয় তাও স্পষ্ট জানা যায়। তাদের হামবুর্গ থেকে দক্ষিণ আমেরিকায় পাঠানো হয়, বহিয়া এবং রিও ডি জানিয়ারো তাদের কোটা নিয়ে নেয়, কিন্তু বেশি সংখ্যক যায় মণ্টিভিডিও এবং বুইনোজ আয়ার্স। বাকি অল্প সংখ্যক চলে যায় ম্যাগেলান প্রণালী দিয়ে ভালপারাইসোয়। আর এক দলকে সোজাসুজি অথবা ইংলণ্ডের মধ্য দিয়ে উত্তর আমেরিকায় চালান দেওয়া হয়। কিন্তু সেখানে স্থানীয় গণিকাদের সঙ্গে তাদের প্রতিযোগিতা করতে হয়, তাই তাদের সেখান থেকে পাঠানো হয় নিউ অরলিনস্ এবং টেক্সাস অথবা পশ্চিম কালিফোর্নিয়ায়; সেখান থেকে সমুদ্র উপকূল দিয়ে তারা পানামা পর্যন্ত যায়। আর কিউবা, ওয়েষ্ট ইনডিস, মেক্সিকোর প্রাপ্য কোটা সরবরাহ করা হয় নিউ অরলিন্স্ থেকে। জার্মান নারীদের অন্য একটা দলকে "ভবঘুরে" নামের লেবেল দিয়ে রপ্তানি করা হয় আলপ্স্-এর মধ্য দিয়ে ইটালীতে এবং সেখান থেকে পাঠানো হয় আরো দক্ষিণে আলেকজেন্দ্রিয়া, সুয়েজ, বম্বে, কলকাতা এবং সিঙ্গাপুরে এবং এমনকি হংকং, সাংহাই, ওলন্দাজ ইণ্ডিয়ায়। ইষ্ট ইণ্ডিজ ও জাপানের বাজারে ভাল চলে না। কারণ হল্যাণ্ডের উপনিবেশগুলি থেকে তারা প্রচুর শ্বেতাঙ্গী নারী পেয়ে থাকে। আর জাপানে তাদের নিজের দেশের মেয়েরাই খুব সুন্দরী এবং সস্তাও বটে। তদুপরি সানফ্রানসিসকোর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বাজারে লাভও বেশি হয় না। রাশিয়ায় গণিকা সরবরাহ করা হয় পূর্ব এশিয়া, পোমারেনিয়া ও পোল্যাণ্ড থেকে। তারা প্রথম এসে ওঠে রিগাতে। সেখান থেকে সেন্ট পিটার্সবার্গ ও মস্কোর ব্যাপারীরা তাদের প্রয়োজন মতো বেছে বেছে গণিকাদের নিয়ে যায় এবং

সেখান থেকে বহুসংখ্যক গণিকাদের পাঠিয়ে দেয় নিমানিজ নওগারড-এ, উরালের মধ্য দিয়ে সাইবেরিয়ার অভ্যন্তর পর্যন্ত ইরবিট এবং ক্রেসটফস্কিতে। এই রকম ভাবেই রপ্তানি করা একটি জার্মান মেয়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল শিটাতে। এই প্রকাণ্ড ব্যবস্থা সম্পূর্ণ সংগঠিত ভাবে চলে। এই লেন-দেন দালাল ও ব্যাপারীদের মারফৎ হয়ে থাকে। বৈদেশিক দপ্তরগুলির মন্ত্রীরা যদি সব জার্মান কনসালদের কাছ থেকে রিপোর্ট দাবি করেন, তবে এ বিষয়ে অনেক তথ্য পেতে পারেন।"

অন্য দিক থেকেও এরকম অভিযোগ পাওয়া গেছে। ১৮৮২-১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান রাইগস্ট্যাগের অধিবেশনে এই জঘন্য ব্যবসা দমন ও রোধ করার জন্য হল্যাণ্ডের সঙ্গে একযোগে কাজ করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন করে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। কিন্তু সে প্রচেষ্টা সফল হবার পথে বহু বাধা।

এ ব্যবসার মধ্যে যে কত সংখ্যক গণিকা জড়িয়ে আছেন তার হিসেব নিকেশ পাওয়া সম্ভব নয়। যারা পুরোপুরিভাবেই গণিকাবৃত্তি গ্রহণ করেছে তাদের মোটামুটি হিসাব পুলিসে দিতে পারে কিন্তু তাদের চাইতেও অনেক বেশি সংখ্যক নারী আংশিক রোজগারের জন্য গণিকা বৃত্তি করে থাকেন তাদের হিসাব দেওয়াও পুলিসের পক্ষে সম্ভব নয়। যাই হোক যতদূর সংখ্যা জানা যায় তাই অত্যন্ত ভয়াবহ। বন ডেটিনজেন (Bon Dettingen) এর হিসাব অনুযায়ী ১৮৭০ সালে লণ্ডনে গণিকাদের সংখ্যা ছিল ৮০,০০০। প্যারিসে তালিকাভুক্ত গণিকাদের সংখ্যা ৪,০০০ কিন্তু শোনা যায় তাদের প্রকৃত সংখ্যা ৬০,০০০, কেউ বা বলেন ১০০,০০০। বার্লিনে বর্তমানে ২৮০০ গণিকা পুলিসের সরাসরি আওতার মধ্যে আছে কিন্তু বন ডেটিনজেনের হিসাবে দেখা যায় ১৮৭০ সালে ১৫,০৪৯ জন নারী গণিকাবৃত্তি করত বলে শোনা যায়। শুধু ১৮৭৬ সালেই পুলিসের আইন অমান্য করার জন্য ১৬,১৯৮ জন গ্রেপ্তার হয়েছিল। তাই তাদের মোট সংখ্যা ২৫,০০০,০০ জন ধরলে খুব একটা ভুল হবে না। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে হামবুর্গে ১৫ বৎসর বয়সের উর্দ্ধের নারীদের মধ্যে প্রতি ৯ জনের মধ্যে একজনই ছিল বেশ্যা। ঠিক তখনই লাইপজিগ-এ ৫৬৪ জন তালিকাভুক্ত গণিকা ছিল, আর গণিকাবৃত্তির উপর যে নারীরা সম্পূর্ণভাবে বা প্রধানত নির্ভর করত তাদের সংখ্যা ছিল ২,০০০। তারপর থেকে গণিকাদের সংখ্যা আরো অনেক বেড়ে গেছে। আমরা দেখতে পাই যে নারীদের মধ্যে একটা বিরাট বাহিনী বেশ্যাবৃত্তিকে জীবিকা অর্জনের উপায় হিসাবে নেয়, আর সেই রকমই বহু সংখ্যক নারী এই পথে এসে মৃত্যু ও ব্যাধির শিকার হয়।

প্রত্যেক দশকে দশকে গণিকাদের সংখ্যা বেড়ে যেতে থাকার আর একটা কারণ হল অর্থনৈতিক আতংক। শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রপাতির

উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মালিকদের মধ্যে ঝোঁক দেখা যায় পুরুষ শ্রমিকদের বদলে নারী শ্রমিক ও শিশু শ্রমিকদের নিয়োগ করার। যেমন দেখা যায় ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে যে সব প্রতিষ্ঠানগুলি কারখানা আইনের আওতায় পড়ে সেখানে নারী শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল ৩০৮,২৭৮ জন আর পুরুষ শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল ৪৬৭,২৬১ জন। কিন্তু ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন মোট শ্রমিকদের সংখ্যা দাঁড়াল ৮৫৭,৯৬৪ জন, তখন তার মধ্যে নারীদের সংখ্যা ছিল ৫২৫,১৫৪ জন, আর পুরুষদের সংখ্যা ছিল ৩৩২,৮১০ জন। সুতরাং ৭ বছরের মধ্যে নারী শ্রমিকদের সংখ্যা ২১৬,৮৭৬ জন বেড়ে গেছে, আর পুরুষ শ্রমিকদের সংখ্যা ১৩৪,৪৫১ জন কমে গেছে। আবার যখন আতঙ্ক দেখা দেয়, যা বুর্জোয়া আমলে দেখা দেবেই, তখন যে সব নারী শ্রমিকরা ছাঁটাই হয়ে যায়, তাদের অনেকেই গণিকাবৃত্তির আশ্রয় নেয়, আর একবার এর খপ্পরে পড়লে সেখানেই তাদের ভাগ্য সারা জীবনের মতো বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ শে আগস্ট কারখানা ইনস্‌পেক্টরের কাছে প্রধান কনস্টেবলের একটা চিঠিতে দেখা যায় যে উত্তর আমেরিকার দাস যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডে যখন তুলোর মন্দা হয়েছিল তখন সেখানকার বেশ্যাদের সংখ্যা বিগত ২৫ বছরের চেয়েও অনেক বেড়ে গিয়েছিল !*

যৌনব্যাধির সর্বনাশা ফলের কথা আলোচনা করলে দেখা যায় যে ১৮৫৭ থেকে ১৮৬৫-র মধ্যে ১২,০০০ জনের মৃত্যু হয়েছে, তার মধ্যে অন্ততঃ ৬২ শতাংশ ১২ বছরের নিচের শিশু, যারা কিনা তাদের পিতামাতার সংক্রামক ব্যাধির শিকার হয়েছে। ঐ সময়েই এস. হল্যাণ্ডের হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে ইংলণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডে প্রতি বৎসর ১,৬৫২,৬০০ জন যৌন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

প্যারিসের ডাক্তার প্যারেণ্ড—ডাচেটলেট (Parent Duchatelet), ৫০০০ গণিকার সম্বন্ধে বেশ একটা তথ্য দিয়ে দেখিয়েছেন যে কি কারণে নারীরা গণিকা বৃত্তিতে যায়। এই ৫০০০ হাজারের মধ্যে ১,৪৪০ জন গেছে অভাবের তাড়নায়, ১২৫০ জনের মা ও বাপ নাই, জীবিকারও কোন উপায় নাই, সুতরাং তারাই প্রথম এই পথে এসেছে। ৮০ জন নারী তাদের দরিদ্র বৃদ্ধ মা বাপকে খাওয়ানোর জন্য বেশ্যাবৃত্তি নিয়েছে। ১৪০০ জন আগে রক্ষিতা ছিল, তাদের প্রেমিকরা তাদের ত্যাগ করার পর এই পথে এসেছে। ৪০০ জন মেয়ে অফিসার ও সৈন্যদের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে এসেছে। ২৮০ জন মেয়ে অন্তঃসত্তা অবস্থায় তাদের প্রেমিকদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে বেশ্যাবৃত্তি নিয়েছে। এর থেকেই অবস্থাটা বেশ বোঝা যায়।

---

* Karl Mark : Das Kapital (Capital). Secona edition. p. 480.

নারী শ্রমিকরা অধিকাংশই যে অতি সামান্য মজুরি পায় তার থেকে তাদের কোনো মতেই চলে না, অনেকে তাই বেশ্যাবৃত্তির থেকে রোজগারটা পুষিয়ে নেয়। দর্জির কাজে, পোশাক তৈয়ারির কাজে, টুপি তৈয়ারির কাজে, বহু রকমের কারখানার কাজে নিযুক্ত শত সহস্র নারী শ্রমিকদের এই একই রকম অবস্থা। মালিক, অফিসার, ব্যবসাদার, জমিদার প্রভৃতি যারা নারী শ্রমিক বা দাসীদের কর্মে নিয়োগ করে তারাও প্রায়ই মনে করে থাকে যে তাদের যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য ঐ সব নারীদের ব্যবহার করবার তাদের অধিকারই আছে। মধ্যযুগের সামন্ত প্রভুদের ধরন ধারণ এখন অন্য এক রকম ভাবে রয়ে গেছে। আমাদের সমাজের ধনী অভিজাত শ্রেণীর পুরুষরা মনে করে যে সাধারণ গরিব মানুষদের মেয়েদের প্রলুব্ধ করবার এবং তারপর ছুঁড়ে ফেলে দেবার অধিকার তাদের আছে। আর মেয়েরা তাদের অভিজ্ঞতার অভাবে অতি সহজেই চিত্তাকর্ষক প্রলোভনের শিকার হয়ে থাকে। তার ফলে দেখা যায় নৈরাশ্য ও দুর্দশা এবং শেষ পর্যন্ত এই অপকর্ম। এই কারণেই মেয়েদের মধ্যে আত্মহত্যা ও শিশু-হত্যার হিড়িক দেখা যায়। শিশুহত্যার জন্য অসংখ্য মামলা থেকেই এর একটা অন্ধকার কিন্তু শিক্ষনীয় ছবি পাওয়া যায়। নারী প্রলোভনে পড়ে যায় এবং তারপর নিষ্ঠুরভাবে পরিত্যক্ত হয়। এখন সেই অসহায় নারী হতাশায়, লজ্জায় চরম পথ অবলম্বন করে। সে তার নিজের গর্ভের সন্তানকে হত্যা করে। তারপর তার বিচার হয়, সশ্রম কারাদন্ড হয় অথবা মৃত্যুদন্ড হয়। আর বেপরোয়া পুরুষ, যে কিনা আসল দোষী ছাড়া পেয়ে যায়। তারপর সম্ভবত শীঘ্রই সে একটা 'সম্ভ্রান্ত পরিবারের চমৎকার' কন্যাকে বিবাহ করে এবং একজন ধার্মিক সৎ এবং সম্মানিত ব্যক্তি বলে পরিচিত হয়ে থাকে। সমাজে গুণী জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে এরকম অনেকে আছে। আইনের ক্ষেত্রে যদি নারীরা তাদের বক্তব্য রাখতে পারত তাহলে সমাজে অনেক জিনিসই বদলে যেত।

এই বিষয়ে সবচেয়ে নিষ্ঠুর হচ্ছে ফরাসী আইন যেখানে ঐ সব শিশুদের পিতৃপরিচয় অনুসন্ধান করা বারণ এবং তার বদলে তারা ঐ শিশুদের জন্য অনাথ আশ্রম তৈরি করে দেয়। ১৭৯৩ খ্রীঃ ২৮শে জুন তারিখের ঘোষণায় বলা হয়েছে ঃ—"সরকার পরিত্যক্ত শিশুদের শারীরিক এবং নৈতিক শিক্ষার ভার নিচ্ছে। এখন থেকে তাদের নাম দেওয়া হবে শুধু অনাথ, তাছাড়া আর কোন নাম দেওরা হবে না"। পুরুষদের পক্ষে এটা সুবিধাজনক ব্যবস্থা যারা সমাজের ঘাড়ে দায়িত্বটা চাপিয়ে দিতে পারে এবং জনসমক্ষে এবং তাদের স্ত্রীদের কাছে নির্দোষ থাকতে পারে সুতরাং দেশের সর্বত্র অনাথ আশ্রম তৈরি হল। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে এই অনাথ এবং কুড়িয়ে পাওয়া শিশুদের সংখ্যা দাঁড়াল ১৩০,৯৪৫ এবং দেখা গেল যে তার মধ্যে প্রতি দশজনে একজন শিশু বৈধ সন্তান। কিন্তু

শিশুদের অনেকেই যত্নের অভাবে মারা গেল। শতকরা ৫০ জনের উপর এক বছরের মধ্যেই মারা গেল। শতকরা ৭৮ জন মারা গেল বারো বছরের মধ্যে আর বাকি মাত্র শতকরা বাইশ জন বারো বছরের পর বেঁচে রইল।

অস্ট্রিয়া এবং ইটালীতেও "মানবতার" সমাজ শিশু হত্যার* জন্য এইরকম প্রতিষ্ঠান তৈরি করল। এই রকম অনাথ আশ্রমের গায়ে লিখে দিতে বললেন এখানে শিশুদের হত্যা করা হয়। ইতিহাসের এমন কোন প্রমাণ নাই যে এই নিরীহ শিশুদের হত্যার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য, তাদের লালন পালন করে রক্ষা করবার জন্য পুরুষরা কিছু করেছে। প্রাশিয়ায় যেখানে এই ধরনের অনাথ আশ্রম নাই সেখানে ১৮৬০ নাগাদ শতকরা ১৮.২৩ জন বৈধ শিশু এবং ৩৪.১১ জন অবৈধ শিশু একবছরের মধ্যেই মারা যায়। অবৈধ শিশুদের মৃত্যু সংখ্যা বৈধ শিশুদের মৃত্যু সংখ্যার চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ কিন্তু তবুও ফরাসী অনাথ আশ্রমগুলি থেকে অনেক কম। প্যারিসে প্রতি একশত বৈধ সন্তানের জায়গায় ১৯৩ জন অবৈধ সন্তানের মৃত্যু হয়েছে এবং সারা দেশের সংখ্যা সেই তুলনায় ২১৫ জন। শিশুমৃত্যুর স্বাভাবিক কারণগুলি হল মায়েদের অন্তঃস্বত্বা অবস্থায় পুষ্টির অভাব, রুগ্ন শিশুর জন্ম এবং জন্মের পর যত্নের অভাব। অনেকেই বাজে চিকিৎসা ও কুসংস্কারের শিকার হয়। বৈধ শিশুদের তুলনায় দ্বিগুণ সংখ্যক অবৈধ শিশু মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয় তার কারণ গর্ভে থাকাকালীন মায়েরা ভ্রূণ হত্যার চেষ্টা করে। আর যে অবৈধ শিশুরা বেঁচে থাকে তারা তাদের প্রতি দুর্ব্যবহারের জন্য সমাজের উপর প্রতিশোধ নেয়—তাদের একটা বড় অংশ ভবিষ্যতে সমাজ বিরোধী চোর গুণ্ডায় অপরাধীতে পরিণত হয়।

আর একটা বিষয়ের উল্লেখ করা দরকার। যৌন প্রবৃত্তির অতিরিক্ত দমন বা অতিরিক্ত প্রশ্রয়ের কোনটাই ভালো নয়। তাতে অনেক শারীরিক মানসিক ক্ষতি হয়। খাওয়া পরা অন্যান্য প্রয়োজন মেটাবার মতো যৌন প্রবৃত্তির প্রয়োজন মেটাবার বেলাতেও স্বাভাবিক পথ অবলম্বন করাই ভালো। কিন্তু সংযম হল কঠিন কাজ, বিশেষ করে যুবকদের পক্ষে। সমাজের অভিজাত শ্রেণীর যুবকরাই বেশি উচ্ছৃংখল। উচ্চ শ্রেণীর মধ্যেই বহু সংখ্যক লম্পট থাকে। তারা নানা রকম দুষ্কর্ম করে থাকে। অবশ্য তাদের অপরাধের অনেকটাই গোপন থেকে যায় বলে প্রকাশ্যে তাদের অপরাধের সংখ্যা ততটা দেখা যায় না।

সুতরাং আমরা দেখতে পাই যে সব রকমের কলুষ দুর্নীতি অপরাধ

* ভিয়েনার প্রকাণ্ড অনাথ আশ্রম একটি বিশেষ ব্যতিক্রম। এর সমস্ত ব্যবস্থাটা স্বাস্থ্যকর ও মানবিক। কিন্তু এই রকম কয়েকটি আশ্রম থাকলেও, মূলত, আসল আশ্রমগুলি মোটেই ভাল থাকে না। (—ইং অনুবাদক)

আমাদের সামাজিক অবস্থা থেকে উদ্ভূত। সমাজে অস্থিরতা বরাবরই চলতে থাকে। কিন্তু তার থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় নারীরাই।

অনেক নারী এই বিষয়ে সচেতন এবং এর থেকে পরিত্রাণের চেষ্টা করে থাকে তারা প্রথমেই যথাসম্ভব অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দাবি করে। তারা দাবি করে যে, সমস্ত কাজ করবার তাদের শারীরিক মানসিক যোগ্যতা আছে। সে-সমস্ত কাজেই পুরুষদের সমান সুযোগ দেওয়া হোক, সমস্ত সাধারণ ক্ষেত্রে জীবিকা অর্জনের সুবিধা দেওয়া হোক। এই দাবিগুলি কি সংগত ? সেগুলি কি পাওয়া সম্ভব ? এই দাবিগুলি পেলে কি অবস্থা বদলাবে ? এই প্রশ্নগুলি আমাদের খতিয়ে দেখতে হবে। এবার তাই দেখা যাক।

বর্তমান কালে নারীর অবস্থা

জীবিকার ক্ষেত্রে নারীদের স্থান ঃ নারীর মানসিক শক্তি ঃ ডারউইন তত্ত্ব ও নারীর সামাজিক অবস্থা

নারীদের উপার্জনের স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতার বিষয়টির আইনগত অধিকারকে বুর্জোয়া সমাজ অনেকটা মেনে নিয়েছে। ঠিক যেমন তারা মেনে নিয়েছে শ্রমিকশ্রেণীর স্বাধীনতার সংগ্রামের অধিকারকে। উৎপাদন ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতির জন্যই বুর্জোয়াদের কাছে পুরুষ ও নারীর শ্রমশক্তির মুক্তির প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আর যতই উৎপাদনের যন্ত্রপাতির উন্নতি হতে থাকে, একই বিভাগে বিভিন্ন কাজের ভাগ হতে থাকে, তার ফলে শিল্পপতিদের মধ্যে যতই বিরোধ বাড়তে থাকে, শিল্পের একটি শাখার সঙ্গে অন্য শাখার বিরোধ বাড়তে থাকে, একটি দেশের সঙ্গে অন্য দেশের বিরোধ ও একটি মহাদেশের সঙ্গে অন্য মহাদেশের বিরোধ বাড়তে থাকে, ততই সেই অনুপাতে বিভিন্ন শিল্পে নারীদের নিয়োগও বাড়তে থাকে। বিভিন্ন শিল্পে নারীদের নিয়োগের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক অবস্থার মধ্যেই দেখা যাবে। নারীদের সর্বদাই পুরুষের চেয়ে হেয় গণ্য করা হয়ে থাকে। তাদের চরিত্রের মধ্যে তাই নত হয়ে বাধ্য হয়ে থাকা ও দাসত্বকে মেনে নেওয়ার ভাব সর্বহারা পুরুষদের চেয়ে বেশি দেখা যায়। তাই তারা পুরুষদের সঙ্গে সমমর্যাদায় কাজ পায় না, তাদের বাধ্য হয়েই পুরুষদের চেয়ে কম মজুরিতে কাজ নিতে হয়। নারী হিসাবে তার আরো একটি অন্তরায় আছে যার জন্য সে কম মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হয়। নারী সন্তান ধারণ করে। গর্ভ অবস্থায় ও সন্তান প্রসবের সময় তাকে ছুটি নিতে হয়। তার পক্ষে পুরুষদের মতো একটানা কাজ করা সম্ভব হয় না। মালিকরা তার সুযোগ নিয়ে নারী শ্রমিকদের অনেক কম মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য করে।

আবার এও দেখা যায় যে কতগুলি কাজের জন্য নারীরা বিশেষ উপযোগী। মালিকদের পক্ষে নারী শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করানো সহজ। তারা কথা শোনে। তাদের ধৈর্য বেশি। পুরুষদের চেয়ে তাদের শোষণ করা সোজা। বিবাহিত নারীরা আরো বেশি কষ্ট স্বীকার করে, প্রাণপণ চেষ্টা করে কোনোমতে জীবিকা উপার্জনের জন্য। তারা চট করে পুরুষ শ্রমিকদের সঙ্গে দাবি-দাওয়া আদায়ের

আন্দোলন সংগ্রামে নেমে পড়ে না। মালিকরা অনেক সময় তাদের পুরুষ শ্রমিকদের বিরুদ্ধেও কাজে লাগাতে পারে। সর্বশেষে এও দেখা যায় যে যেহেতু নারীদের ধৈর্য, নিপুণতা ও কাজের রুচি অনেক ভাল, বহুক্ষেত্রেই পুরুষ শ্রমিকদের চেয়ে নারী শ্রমিকরা বেশি উপযুক্ত, বিশেষ করে সূক্ষ্ম কাজের বেলায় তো বটেই।

পুঁজিপতিরা এইসব "মেয়েলী" বৈশিষ্টগুলির সুবিধা ঠিকই বুঝতে পারে। আর বছর বছর কলকারখানা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নারীদের কাজের ক্ষেত্রও বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে নারীদের সামাজিক অবস্থার কোনো উন্নতি হচ্ছে না। যেখানেই নারীদের কাজে নিয়োগ করা হয়, পুরুষদের ছাড়িয়ে দেওয়া হয়। পুরুষরা তখন বাঁচার জন্য কম মজুরিতে কাজ করতে চায়। তাতে চাপে পড়ে নারীদের মজুরি আরো কমে যায়। এইভাবে ক্রমশঃ ক্রমশঃ শ্রমিকরা যত বেশি সংখ্যায় কাজ করতে আসে, মালিকরা তাদের মজুরি কমানোর চাপ সৃষ্টি করে। নতুন নতুন নিয়োগের ক্ষেত্রে ও কলকারখানার শাখা খুলতে থাকলে শ্রমিকদের কিছুটা সুবিধা হয় বটে, কিন্তু তার দ্বারা তাদের মজুরি বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ হয় না। কারণ শ্রমিকদের মজুরি একটু বাড়তে থাকলেই মালিকরা আবার যন্ত্রপাতির উন্নতি করে মানুষের বুদ্ধি ও শারীরিক শক্তির কাজ অনেকটা যন্ত্র দ্বারা করিয়ে নিতে পারে। ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের গোড়ার দিকে মালিকরা শ্রমিকের বিরুদ্ধে শ্রমিককে কাজে লাগায়, তারপর পুরুষ শ্রমিকদের বিরুদ্ধে নারী শ্রমিকদের কাজে লাগায়, পরে আবার বয়স্কদের বিরুদ্ধে শিশুদের কাজে লাগায়। পুরুষ শ্রমিকের জায়গায় নারী শ্রমিককে কাজ দেয়, আবার নারী শ্রমিকের জায়গায় শিশু শ্রমিককে কাজ দেয়। এই হল আধুনিক শিল্পের "নৈতিক" নিয়ম।

নারী শ্রমিকদের দিক থেকে প্রতিবাদটা কম আসে বলে মালিকদের পক্ষে দৈনিক কাজের ঘণ্টা বাড়িয়ে বেশি বেশি করে তাদের শ্রমের "উদ্‌বৃত্ত মূল্য" আদায় করা সহজ। এই কারণেই জার্মানীর সূতাকলে—যেখানে পুরুষ শ্রমিকদের চেয়ে নারী শ্রমিকদের সংখ্যা বেশি, অন্য যে কোন শাখা থেকে কাজের ঘণ্টা বেশি, নারীরা তাদের পারিবারিক জীবনে দেখেছে যে তাদের কাজের কোনো সময়সীমা বাঁধা নেই, তাই তারা বাইরে কাজ করতে এসেও অতিরিক্ত সময় কাজ করাটাকে সহজেই মেনে নেয়। অন্যান্য শিল্পে, যেমন, টুপি তৈরির কাজ, ফুল তৈরির কাজ প্রভৃতির বেলায় যেখানে হাতের কাজ করতে হয়, সেখানে নারীশ্রমিকরা অতিরিক্ত কাজগুলি বাড়ি নিয়ে গিয়ে রাত দুপুর পর্যন্তও খাটে এবং তার দ্বারা তাদের নিজেদেরই ভাল মজুরি পাবার সুযোগ নষ্ট করে। তারা ভুলে যায় যে এর দ্বারা মাসের শেষে যেখানে স্বাভাবিক ভাবে দিনে দশ

বার ঘণ্টা খাটলে তারা যা রোজগার করত, ষোল ঘণ্টা খেটেও ঠিক সেই রোজগারই করছে।

আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়েছি যে নারী শ্রমিকদের সংখ্যা কি দারুণভাবে বেড়ে গেছে। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড ও ওয়েল্‌স্‌এর ছোটখাট কারখানার নারী শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল ১,০২৪,২৭৭ জন, আর এখন সে সংখ্যা সম্ভবতঃ দ্বিগুণ হয়ে গেছে। বিগত আদমসুমারী অনুযায়ী লণ্ডনে ভৃত্যের কাজে নিযুক্ত নারীদের সংখ্যা ২২৬,০০০ জন, শিক্ষিকা এবং গৃহপরিচারিকা বা গভর্নেস-এর সংখ্যা ১৬,০০০ জন, বই বাঁধাই-এর কাজে নিযুক্ত নারীদের সংখ্যা ৫,১০০ জন, ফুল তৈরির কাজে নিযুক্ত নারীদের সংখ্যা ৪,৫০০ জন, টুপি তৈরির কাজে নিযুক্ত নারীদের সংখ্যা ৫৮,৫০০০ জন, পোশাক তৈরির কাজে নিযুক্ত নারীদের সংখ্যা ১৪,৮০০ জন, দর্জির কাজে নিযুক্ত নারীদের সংখ্যা ২৬,৮০০ জন, জুতো তৈরির কাজে নিযুক্ত নারীদের সংখ্যা ৪,৮০০ জন, সেলাই কলের কাজে নিযুক্ত নারীদের সংখ্যা ১০,৮০০ জন এবং ধোপার কাজে নিযুক্ত নারীদের সংখ্যা ৪৪,০০০ জন। তাছাড়া আরো অনেক জায়গায় নারী শ্রমিকরা কাজ করে তাদের সংখ্যার হিসাব এর মধ্যে নেই।

এই রকম ঠিকমত হিসাব পাওয়া যায়নি বলে জার্মানীতে বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসায়ে যত নারীশ্রমিক নিযুক্ত আছে তা বলা সম্ভব নয়। আর এ হিসাবও খুব সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের, এর থেকে সম্পূর্ণ অবস্থাটা বোঝা যায় না।

বর্তমানে এরকম শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্র খুবই কম যেখানে নারী-শ্রমিকদের নিয়োগ করা হয় না, কিন্তু এদিকে এরকম অনেক জায়গা আছে—যেমন নারীদের ব্যবহারের কিছু দ্রব্য সামগ্রী—যেখানে কেবলমাত্র, বা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীদেরই নিয়োগ করা হয়ে থাকে—অন্যান্য জায়গায়, যেমন যেগুলির কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, সুতাকলে নারীশ্রমিকদের সংখ্যা কোথাও বা পুরুষ শ্রমিকদের সমান সমান, কোথাও বা তাদের চেয়ে বেশি, আর নারী-শ্রমিকদের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছে। বহু রকম ব্যবসাক্ষেত্রে সাহায্যকারী কাজে নারীরা চাকরী নিচ্ছে এবং তাদের সংখ্যাও বাড়ছে। এর ফলে দেখা যায় যে পারিবারিক জীবনের বাইরে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত নারীদের সংখ্যা বাড়ছে এবং বিভিন্ন শিল্পে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাদের নিয়োগের সুযোগও দ্রুত বাড়ছে। আর এই সব নিয়োগের ক্ষেত্রগুলি শুধু যে নারীদের উপযোগী বলেই বাড়ছে তাই নয় আধুনিক শিল্পে যেখানে যেখানে অধিক শোষণ করার সুবিধা আছে সেখানেও নারী শ্রমিকদের নিয়োগের সংখ্যা বাড়ছে। সেই সব কাজে নারীশ্রমিকরা অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম করে তাই নয় আর সেই সব কাজের চাপে শরীরও ভেঙে যায় তাড়াতাড়ি। কবি ও

ঔপন্যাসিকদের সুকোমল নারীদেহ সম্বন্ধে সেই রোমাঞ্চকর কল্পনা কোথায় গুঁড়িয়ে যায়।

প্রকৃত তথ্য দ্বারাই প্রকৃত সত্য জানা যায় তাই আমাদের প্রকৃত তথ্যের উপরেই নির্ভর করতে হয়। সেই তথ্য থেকে জানা যায় যে আজকাল নারীরা এইসব কাজে নিযুক্ত হয়ে থাকে : সুতি, লিনেন, উল, কাপড় কল, সুতো কল ক্যালিকো ছাপা, কাপড় রং করার, ইস্পাতের কলম, পিন কারখানা, চিনি কল, কাগজের কল, ব্রোঞ্জের কাজ, কাঁচ এবং চীনা মাটির কাঁচের উপর রং করা, সিল্ক বোনা তাঁতের কাজ, রবারের কাজ, প্যাকিং এর কাজ, মাদুরের কারখানা, কার্পেটের কাজ, হাতব্যাগ, কার্ডবোর্ড, ব্রোঞ্জের কাজ, লেসের কাজ, এমব্রয়ডায়ারীর কাজ, চামড়ার কাজ, গয়নার কাজ, তেল ও চর্বির শোধনাগারের কাজ, সবরকমের কেমিকেলেংই কারখানা, কাঠের খোদাই কাজ, মৃৎপাত্রে রং করার কাজ, টুপি তৈরির কাজ, কুমোরের কাজ, তামাকের কারখানার কাজ, আটা তৈরির কাজ, দস্তানার কাজ, চিরুনী তৈরির কাজ, খেলনা তৈরি, ঘড়ি তৈরি, ঘর রং করা, পালকের বিছানা পরিষ্কার করা, দাহ্য পদার্থ তৈরি, কামানের বারুদ তৈরি, ফসফরাস, আর্সেনিক কারখানা, লোহা কারখানা, ছাপাখানা, পাথর প্ালিশ করা, পাথরের উপর খোদাই-এর কাজ, ফটোগ্রাফী, ইঁট তৈরি, ধাতু তৈরি, বাড়ি তৈরি, রেল লাইন তৈরি, খনির কাজ, নদী ও খালের উপর দিয়ে জিনিসপত্র বহন করার কাজ, উদ্যান তৈরী, কৃষিকার্য, পশুপালন এবং সেই সংক্রান্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রের কাজ এবং সর্বশেষে যে সব কাজে নারীদেরই উপযুক্ত মনে করা হয়ে থাকে সেইসব ক্ষেত্রে নারীদের পোশাক তৈরি ও বিক্রির কাজ এবং পরবর্তী সময়ে কেরানীর কাজ, শিক্ষিকার কাজ কিন্ডারগার্টেন শিক্ষিকার কাজ, শিশুদের দেখাশুনার কাজ এবং শিল্পীর কাজ প্রভৃতি। তাছাড়া নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাজার হাজার মেয়ে দোকানে ভৃত্যের কাজ করে বা বাজারে কাজ করে এবং তার ফলে তারা তাদের পারিবারিক দায়িত্বগুলি পালন করতে পারে না, বিশেষ করে তাদের শিশুদের শিক্ষা দেবার কাজ করতে অবকাশ পায় না। আরও একটি জায়গার কথা উল্লেখ করা দরকার যেখানে সুন্দরী সুন্দরী যুবতী মেয়েদের কাজে লাগানো হয়ে থাকে যার জন্য তাদের শারীরিক মানসিক ও নৈতিক অবনতি ঘটে —সে হল মদের দোকানের পরিবেশিকা, সুঁড়িখানা রেস্টুরেন্ট প্রভৃতির পরিচারিকা হিসাবে মেয়েদের কাজে লাগানো হয়—যেখানে আমোদ প্রমোদের জন্য পুরুষরা এসে থাকে।

এর মধ্যে অনেক কাজই অত্যন্ত বিপজ্জনক, যেমন খড়ের টুপি তৈরির কাজ ও পরিষ্কার করার কাজে সালফিউরিক এসিড এবং এলকালিন গ্যাসের ব্যবহার করা হয়। তরিতরকারী পরিষ্কারের জন্য ক্লোরাইন গ্যাসের ব্যবহার খুবই

বিপজ্জনক, এরকম অনেক জিনিস তৈরির কাজেই বিষাক্ত জিনিসের বিপদ থাকে। সুতাকলে যন্ত্রপাতির কাজে, দাহ্য পদার্থ তৈরির কাজে এবং কৃষিকাজে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের কাজে জীবন হানি বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হানির আশঙ্কা থাকে। তা ছাড়া উপরোক্ত কাজের তালিকা দেখলেই বোঝা যায় যে এ সব কাজে অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম লাগে যা কিনা পুরুষদের পক্ষেও কষ্টকর। লোকে বলতে পারে যে এই কাজ বা ওই কাজ নারীদের পক্ষে যোগ্য নয় কিন্তু সেকথা বলার কোনই মানে হয় না, যতক্ষণ না নারীদের পক্ষে যোগ্য অন্য কোন কাজের সংস্থান হয়।

নারী শ্রমিকদের বিশেষ করে অন্তঃস্বত্ত্বা অবস্থায় ভারী ভারী কাজ করতে দেখার দৃশ্য সত্যিই বেদনাদায়ক যেমন বড় বড় যন্ত্রপাতি চালানো, রেললাইনের কাজ করা, বাড়ি তৈরির যোগান দেওয়া, ভারী ভারী জিনিস পত্র বয়ে নিয়ে যাওয়া, কয়লাখনিতে কাজ করা প্রভৃতি খুবই কষ্টকর। এইসব কাজের তাদের শরীর এবং নারীত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি নষ্ট হয়ে যায়। আবাব পুরুষদেরও এমন অনেক কাজ করতে হয় যাতে তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি নষ্ট হয়ে যায়। এই সবই হল সামাজিক শোষণ ও সামাজিক দ্বন্দ্বের ফলে। আমাদের সমাজের দুর্নীতিগ্রস্ত অবস্থার দরুন প্রকৃতির নিয়মগুলিকেও উল্টে দেওয়া হয়।

সুতরাং দেখা যায় যে সমস্ত কলকারখানার বিভিন্ন শাখাতেই নারীরা যেভাবে প্রবেশ করছে তাতেই পুরুষদের কাছ থেকে বাধা আসছে এবং তারা এমনকি আইন করেও নারীদের কাজ নিষিদ্ধ করার দাবি জানাচ্ছে। এই বিষয়ে সন্দেহ নাই যে নারীরা যতই বেশি বেশি বাইরের কাজে যোগ দিচ্ছে ততই শ্রমিকদের পরিবারগুলি ভেঙে যাচ্ছে। তারই ফল স্বরূপ বিবাহ-বিচ্ছেদ হতাশা অধঃপতন নানা রকম ব্যাধি, শিশু মৃত্যু ভয়াবহভাবে বেড়ে যায়। কিন্তু তবুও এইসব সত্ত্বেও বলতে হবে যে বড় বড় কলকারখানা ও শিল্প প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক প্রগতিই হচ্ছে। এর ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের স্বাধীনতা, এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাতায়াতের ও বিবাহের স্বাধীনতা লাভ করা যায় যদিও ছোট ছোট ব্যবসার ক্ষেত্রে অনেক ক্ষতি সাধন হচ্ছে।

বড় বড় শিল্প প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন ছোট ছোট সাবেকী পদ্ধতির শিল্পগুলি নষ্ট হয়ে যেতে থাকে। নারীদের শ্রম সম্বন্ধেও সেই পুরানো অবস্থায় আর ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। এর দ্বারা অবশ্য একথা বোঝায় না যে নারী ও শিশুদের উপর শোষণ বন্ধ করার জন্য কলকারখানায় আইন চালু করা যাবে না বা স্কুলে যাবার বয়সের শিশুদের খাটানো আইন করে বন্ধ করা যাবে না। শ্রমিকদের এই স্বার্থরক্ষা করা রাষ্ট্র, মানবতা ও সভ্যতার কাজ।* কিন্তু আমাদের

* আধুনিক কলকারখানার চাপে পড়ে মানুষের অবস্থার যে অবনতি হয়েছে তাতে বিগত কয়েক দশক ধরেই কয়েকবারই শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্র সংকুচিত করতে হয়েছে।

চূড়ান্ত লক্ষ্য হল সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্প প্রসার ও উন্নত যন্ত্রপাতির সঙ্গে সঙ্গে এবং সমস্ত আধুনিক শ্রমপদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে যে সব দোষগুলি আসছে সেগুলিকে সম্পূর্ণ দূর করা এবং তার সুফলগুলি যাতে সমাজের সমস্ত মানুষই ভোগ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা।

সমাজ সভ্যতার প্রগতির, মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি বিকাশের এমনই অপব্যবহার দেখা যায় যে যখনই বড় বড় যন্ত্রপাতির আবিষ্কার হয় তখনই সুবিধাভোগী কয়েকজন মাত্র ফল ভোগ করে আর হাজার হাজার শ্রমিক কারিগরের কাজ যায়। তারা দেখে যে মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি বেড়ে যাওয়ার ফলে এত ভাল ভাল যন্ত্রপাতির আবিষ্কার হয়েছে যে বিশগুণ বা চল্লিশগুণ উৎপাদন বেড়ে যেতে পারে এবং তারই ফলে আবার হাজার হাজার শ্রমিক কর্মচ্যুত হয়।*

সুতরাং যে ঘটনায় মানুষের আনন্দ হওয়া উচিত, সেই ঘটনায় তাদের মনে শত্রুতার সৃষ্টি হয়। অতীতে দেখা গেছে যে এর ফলে কলকারখানাই লোকে ভেঙেচুরে দিয়েছে। একইভাবে নারী শ্রমিক ও পুরুষ শ্রমিকদের মধ্যেও একটা প্রতিযোগিতামূলক শত্রুতা দেখা গিয়ে থাকে। এও একটা অস্বাভাবিক জিনিস, অর্থাৎ আমাদের এমন একটা সমাজ তৈরি করার চেষ্টা করতে হবে যেখানে উৎপাদনের যন্ত্রগুলো সর্বসাধারণ মানুষের অধিকারে আসে, যে সমাজে নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকলকেই সমান চোখে দেখা হবে, যে সমাজে সমস্ত যন্ত্রপাতির উন্নতি, বৈজ্ঞানিক উন্নতি সম্ভব, সে সমাজে সকলেই শ্রমজীবীর কাজ করতে পারবে, কেউ নিষ্ফল কাজে লেগে থাকবে না, বা অলস অকেজো জীবন কাটাবে না, যে সমাজে ক্রমশঃ মানুষের কাজের ঘণ্টা কমে আসবে ও তাদের শারীরিক মানসিক উন্নতি সম্ভব হবে। কেবলমাত্র তখনই নারীরাও পুরুষদের মতো অর্থকরী কাজে লাগতে পারবে, আর পুরুষদের সঙ্গে সমান অধিকার ভোগ করতে পারবে এবং তখনই নারীরা তাদের শারীরিক মানসিক শক্তিকে বিকশিত করতে পারবে, নারী হিসাবে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারবে এবং জীবনও উপভোগ

* বিগত ১৮৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ব্র্যাডফোর্ডে একটি বক্তৃতা দেবার সময় কারখানা পরিদর্শক এ রেডগ্রেভ (A. Redgrave) বলেছিলেন: "কিছুদিন ধরে উল কারখানার চেহারা পালটে গেছে দেখছি। আগে এখানে নারী ও শিশুরাই কাজ করত। এখন যন্ত্রের দ্বারাই সব কাজ হচ্ছে। একজন মালিককে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: "আগে যে ব্যবস্থা ছিল তাতে আমি ৬৩ জন শ্রমিক নিয়োগ করেছিলাম। উন্নত যন্ত্রের প্রচলন হবার পর আমি শ্রমিকদের সংখ্যা কমিয়ে ৩৩ করলাম, তারপর ক্রমশঃ নানাভাবে যন্ত্রের সুবিধা পাবার ফলে আমি মাত্র ১৩ জন শ্রমিক দিয়েই কাজ চালাতে পারি"। এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে আমাদের বর্তমান বড় বড় কলকারখানার উৎপাদন ব্যবস্থার ফলে একটি কারখানাতেই কয়েক বছরের মধ্যে শ্রমিকদের সংখ্যা প্রায় ৮০ ভাগ কমে যাচ্ছে, যদিও উৎপাদনের পরিমাণ ঠিকই থাকছে। কার্ল মার্কস্ এর "ক্যাপিটাল" গ্রন্থে এ বিষয়ে অনেক কিছু জানবার মতো জিনিস আছে।

করতে পারবে। কেবলমাত্র তখনই নারীরা তাদের স্বাধীনতা ও সমান অধিকারের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে এবং কোনো অবমাননাই আর তাদের স্পর্শ করতে পারবে না।

আমরা আরো দেখাব যে আমাদের সমগ্র আধুনিক উন্নতিই সেই দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং এই উন্নতির মধ্যেকার সাংঘাতিক দোষগুলি অদূর ভবিষ্যতে দূর হয়ে যাবে এবং আমরা আমাদের উপরোক্ত অবস্থায় পৌঁছাব। কিভাবে আমরা সে অবস্থায় আসবো তা পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণনা করা হবে।

যদিও যাদেরই চোখ আছে তারা দেখতে পায় যে আমাদের সমাজে নারীদের অবস্থার কিভাবে পরিবর্তন আসছে, তবুও রোজই এইসব খেজুরে আলাপ শোনা যায় যে নারীদের পক্ষে ঘরসংসার নিয়ে পড়ে থাকাটাই ঠিক। আর এইসব বুলি তখনই সবচেয়ে বেশি শোনা যায় যখন নারীরা উচ্চ শিক্ষায়, বিজ্ঞানচর্চায় প্রশাসনিক কাজে, চিকিৎসক, আইনজীবীর কাজে প্রভৃতিতে অগ্রসর হতে থাকে। আর জ্ঞানগর্ভ যুক্তির আড়ালেই অসহ্য হাস্যাস্পদ আপত্তিগুলি তোলা হয়ে থাকে। 'নীতি শৃঙ্খলার' কথাও ঐ ভাবেই বলা হয়ে থাকে। সম্ভবত কেউই বিশৃঙ্খলা ও নীতিহীনতা চায় না, অবশ্য যারা সেই অবস্থাটাকে নিজেদের কর্তৃত্ব রক্ষা করার কাজে লাগাতে চায় তারা ছাড়া। এ ক্ষেত্রেও তারাই নীতি শৃঙ্খলা ও ধর্ম রক্ষার নাম করে নিজেদের কাজের সাফাই গেয়ে থাকে। যাই হোক এদের উপর চকচকে কথাবার্তা তাদেরই বিরুদ্ধে কাজে লাগে যারা কিনা মানুষ যাতে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নীতি শৃঙ্খলা রক্ষা করতে চায়। সেই ভাবেই জ্ঞান বিজ্ঞানের দোহাই দিয়েই অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থাকে চালু রাখার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। এরা যুক্তি দিয়ে থাকে যে নারীদের প্রকৃতি ও শারীরিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তাদের ঘর সংসার নিয়ে থাকাটাই ঠিক ; তার মধ্য থেকেই নারীদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে। আমরা দেখেছি যে আজকালকার দিনে তা কতটা সম্ভব। আর সবচেয়ে বড় কথা হল এই যে নারীরা নাকি পুরুষদের চেয়ে মানসিক শক্তির দিক থেকে ছোট, সুতরাং একথা ভাবাই নাকি হাস্যকর যে নারীরা জ্ঞানবুদ্ধির দিক থেকে তেমন কোনো উচ্চস্তরে উঠতে পারে।

নারীদের যোগ্যতা ও কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তির এ ধরনের মতামত মানুষের কুসংস্কারের সংগে বেশ মিশে যায়, পুরুষরা বেশ মেনে নেয়, আর বর্তমানে নারীদের অধিকাংশই তা মেনে নেয়। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ যা মনে করে তাই-ই যে সব সময় সঠিক হবে তা নয়। যতদিন পর্যন্ত শিক্ষাদীক্ষা জ্ঞান বুদ্ধির স্তর এমন নীচুস্তরে থাকবে, যতদিন পর্যন্ত কায়েমী স্বার্থের প্রাধান্য থাকবে, ততদিন পর্যন্ত যে কোনো নতুন চিন্তাধারা কার্যকরী করার

পথে প্রবল বাধা আসবেই। কায়েমী স্বার্থের লোকেরা অতি সহজেই সাধারণ মানুষের মধ্যের কুসংস্কারগুলোকে নিজেদের কাজে লাগাতে পারে। সুতরাং যে কোনো নতুন ধ্যানধারণাই প্রথমে অতি অল্প লোকেই গ্রহণ করতে পারে। তাদের অনেক কুৎসা ও নিগ্রহও সহ্য করতে হয়। কিন্তু যদি সেই ধ্যানধারণা ভাল ও যুক্তিসংগত হয়, বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তার সত্যতা প্রমাণিত হয়, তবে তা ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়বে এবং আগে যারা অতি অল্প সংখ্যক ছিল, তারাই ক্রমশঃ অধিকাংশ হয়ে যাবে। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা গেছে যে সমস্ত নতুন ধ্যান-ধারণার বেলাতেই এই জিনিস হয়েছে, আর সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণা, যার সঙ্গে কিনা নারীদের কুৎ ও পূর্ণ মুক্তির প্রশ্নটি জড়িয়ে আছে—তার বেলাতেও ঠিক সেই অবস্থাই দেখা যায়।

ধনতন্ত্রবাদীরা সমাজতন্ত্রের যতটা বিরোধিতা করে, অনেক সমাজতন্ত্রবাদী মানুষও নারীদের মুক্তির ব্যাপারে তার চেয়ে কিছু কম বিরোধিতা করে না। প্রত্যেক সমাজতন্ত্রবাদীই ধনিকদের প্রতি শ্রমজীবী মানুষের বশ্যতার কথাটা বুঝতে পারে এবং অন্যদেরও সেটা বোঝা দরকার মনে করে। কিন্তু সেই সমাজতন্ত্রবাদীরাই আবার পুরুষদের প্রতি নারীদের বশ্যতার কথাটা বুঝে উঠতে পারে না, কারণ এখানে তার নিজের স্বার্থটা কম বেশি জড়িয়ে আছে। নিজেদের স্বার্থে আঘাত লাগলে মানুষ এমনই অন্ধ হয়ে যায়।

অনেকে যুক্তি দিয়ে থাকে যে নারীদের ঘরকন্না ও সেবাযত্নের কাজ নিয়ে থাকাটাই ঠিক, কারণ এতকাল তারা তা-ই করে এসেছে। এ যুক্তিটা ঠিক এই রকম যে, যেহেতু দেখা গেছে এতকাল ধরে ইতিহাসের গোড়া থেকেই কোনো না কোনো দেশে রাজা ছিল, সুতরাং দেশে রাজা থাকাটাই ঠিক। এ রকম যুক্তির কোন ভিত্তি নেই. যদিও আমরা জানি না যে পৃথিবীতে কে কোথায় প্রথম রাজা হয়েছিল, আর ধনিক শ্রেণীর কোন্ ব্যক্তি কোথায় তার “স্বাভাবিক কাজ” আবিষ্কার করেছিল, কিন্তু আমরা এ কথা জানি যে ইতিহাসের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে রাজাদের অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। আর একদিন না একদিন রাজতন্ত্র জিনিসটা একেবারেই অবাস্তব জিনিসে পরিণত হবে। ঠিক সেই রকমই সমাজের প্রতিটি জিনিসেরই পরিবর্তন হয়, রূপান্তর হয় এবং শেষ পর্যন্ত নষ্টও হয়ে যায়। বিবাহ ও নারীদের অবস্থা সম্বন্ধেও ঐ একই নিয়ম চলে থাকে। প্রাচীনকালের পিতৃপ্রধান পরিবারগুলিতেও নারীদের অবস্থা গ্রীস-দেশের নারীদের অবস্থার চেয়ে অনেক তফাৎ ছিল। সেখানকার বিষয়ে আমরা ডেমস্থিনিসের কথায় জানতে পারি যে—“নারীদের কাজ ছিল শুধু সন্তান ধারণ করা ও একনিষ্ঠভাবে গৃহ-কর্ম করা”। আজকের দিনে কেউই তা মেনে নেবে না। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই তখনকার

এথেন বাসীদের মতো মত পোষণ করতে পারে, কিন্তু খোলাখুলিভাবে কেউই বলবে না যে ২২০০ বছর আগে গ্রীসে যে নিয়ম ছিল এখনকার পক্ষেও সেটাই ভাল, এটা নিশ্চয়ই একটা প্রগতির লক্ষণ। আর একথাও ঠিক যে যদিও আমাদের আধুনিক সভ্যতায়, বিশেষ করে শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার নরনারীর ক্ষেত্রে বিবাহটা বাজে হয়ে গেছে, তবুও একথা বলতে হবে যে অনেক ক্ষেত্রে বিবাহ সফল হয়েছে এবং সমাজের পক্ষে ভাল হয়েছে। বেশি দিনের কথা নয়, যখন প্রতিটি কৃষি পরিবারে বা মধ্যবিত্ত পরিবারের স্ত্রীরা সেলাই, কোড়াই বোনা, কাপড় কাচা—এখন তাও অনেকেই করে না—রান্নাবান্না, সুতো কাটা, তাঁত বোনা, মদ তৈরি করা, সাবান ও মোম তৈরি করা, সব কাজই করত। পোশাক আশাক বাইরে থেকে তৈরি করানোটা বিলাসিতা ও অপব্যয় বলে মনে হতো। নারী পুরুষ উভয়েই তার বিরোধিতা করত। অবশ্য এখনও অনেক জায়গায় মেয়েরা ঘরেই এ সব কাজ করে থাকে, কিন্তু তার দৃষ্টান্ত খুব কমই দেখা যায়। শতকরা ৯০ জন এখন ঘরে এসব কাজ করা ছেড়ে দিয়েছে আর ছেড়ে দিয়ে তারা ঠিকই করেছে। এখন একদিক থেকে যেমন এ সব কাজ অন্য জায়গায় এসব জিনিস অনেক বেশি সস্তায় ও অনেক ভালভাবে করা যায়, অন্য দিক থেকে বাড়িতে এ সব কাজ করার বন্দোবস্তও থাকে না। এইভাবে কয়েক দশকের মধ্যেই আমাদের পারিবারিক জীবনে একটা মস্ত বড় বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা যেন তা লক্ষ্যই না করে এটাকে বেশ স্বাভাবিক অকথাই মনে করে থাকি। মানুষ অনেক নতুন জিনিসই এভাবে ক্রমশঃ ক্রমশঃ মেনে নেয়। কিন্তু কোনো নতুন চিন্তাধারা যদি তার গতানুগতিক জীবনে হঠাৎ ঘা দেয় তবে তার দিক থেকে প্রচন্ড বাধা আসে।

আমাদের পারিবারিক জীবনে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়ে গেছে এবং এখনও হচ্ছে, তাতে বাস্তবক্ষেত্রে নারীদের অবস্থার পরিবর্তন এসেছে বহু দিক থেকে। নারীরা এখন অনেক মুক্ত ও স্বাধীন হয়ে গেছে। আমাদের ঠাকুরমা কখনো স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে মেয়েরা বাড়ির বাইরে কাজ করবে আবার ঘন ঘন, এমন কি ছুটির দিন ছাড়াও, গান, বাজনা থিয়েটার আমোদ প্রমোদে যাবে। আর তারা কি ভেবেছিল মেয়েরা কখনো বাইরের ব্যাপারে মাথা ঘামাবে, বা রাজনীতি করবে? কিন্তু এখন অনেকেই তা করে থাকে। নারীরা এখন নানা বিষয় নিয়ে সংগঠন তৈরি করছে, খবরের কাগজ পড়ছে. নিজেরাই সম্মেলন ডাকছে। শ্রমজীবী নারীরা ট্রেড ইউনিয়নে যোগ দিচ্ছে, জনসভায় যাচ্ছে, পুরুষদের সঙ্গে একসঙ্গে সংগঠন করছে এবং জার্মানীতে কোনো কোনো জায়গায় তাদের শ্রমিকদের বিষয়ে মতবিরোধ হলে সালিসির জন্য ভোট দেবারও অধিকার আছে।

এমন বোকা কে আছে যে এই পরিবর্তন চাইবে না। যদিও একথা অস্বীকার করা যায় না যে এর একটা বিপরীত দিকও আছে। নারীরা যদিও এখনো রক্ষণশীল, তবুও তাদের সাধারণ ভোট নিলে বোধহয় দেখা যাবে যে তারাও এই শতাব্দীর প্রথম দিকের মতো পিতৃপ্রধান পরিবারের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে ফিরে যেতে চায় না।

যুক্তরাষ্ট্রে কিন্তু বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থা থাকলেও মানুষের মধ্যে ইউরোপের পুরোনো পচা সংস্কারগুলোর বিরুদ্ধে এতখানি লড়াই করতে হয় না। সেখানে প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণাগুলো তাড়াতাড়ি কাজে লাগানো যায়। ব্যাপক নারী সমাজের অবস্থাও সেখানে অনেক তফাৎ। যেমন, অনেক ক্ষেত্রেই তারা সাধারণ অভিজ্ঞতায় দেখেছে যে মেয়েদের দিয়ে রান্নাবান্নার কাজ করানোতে খরচও বেশি পড়ে আর ঝঞ্ঝাটও বাড়ে। তার চেয়ে সমবায় ভিত্তিতে রান্নার ব্যবস্থা করলে বাষ্পীয় যন্ত্রপাতিও ব্যবহার করা যায়, আর মেয়েরা পালা করে রান্নার কাজ করতে পারে। তার ফলে খাওয়ার খরচ অনেক কমে যায়, খাবারও ভাল হয়। রকমারী হয়, আর ঝামেলাও অনেক কমে যায়। আমাদের সেনাবাহিনীর অফিসাররা যারা কিনা সাধারণতঃ সোসালিস্টও নয় কমিউনিস্টও নয়, তারা এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছে! তারা তাদের মেসের মধ্যে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থার জন্য একটা সংগঠন তৈরি করে, একজনকে কেনাকাটা ব্যবস্থাপনার ভার দেয়, খরচপত্র নিজেরা ভাগাভাগি করে নেয়, রান্নার কাজ তাদের ব্যারাকে বাষ্পীয় যন্ত্রে হয়। এতে অফিসারদের খাবার খরচ হোটেলের তুলনায় অনেক কম পড়ে, আর খাওয়া দাওয়াও হোটেলের থেকে খারাপ হয় না।

রান্নার বাষ্পীয় যন্ত্র ছাড়াও যদি আমরা বাসন ধোওয়া, ঘর পরিষ্কার করার জন্যও বাষ্পীয় যন্ত্র ব্যবহার করতে পারি—যেমন অনেক বড়লোকের বাড়িতে, হাসপাতালে, স্কুলে, ব্যারাকে আছে (যদিও অনেক সময় সেগুলি ভালমতো চলে না)--মেয়েরা রান্নাঘরের ঘানিটানার কাজ থেকে অনেকটা মুক্তি পেয়ে যাবে, আর সময়ও নষ্ট হবে না। এখানে এ সব কথা বললে লোকে শিউরে ওঠে। পঞ্চাশ ষাট বছর আগে যদি নারীদের বলা হত যে জলের কল বসালে তাদের মেয়েদের ও বাড়ির চাকরদের জলটানার কষ্ট কমে যাবে, তবে তারা তা অসম্ভব মনে করত, আর মনে করত যে তাহলে মেয়েরা ও চাকরবাকর অলস হয়ে যাবে। প্রথম নেপোলিয়নই কি বাষ্পদ্বারা জাহাজ চালানোটাকে একটা হাস্যকর কথা বলেনি, আর সাধারণ গাড়ির জায়গায় রেলগাড়ি চালানোর কথাটা তো প্রথমে উড়িয়েই দিত।

সুতরাং বর্তমানে সর্বত্র মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে যে চিন্তাটা অংকুরিত হচ্ছে সেটাকে ভবিষ্যতে পরিপূর্ণ করতে হবে এবং ব্যাপক আমূল পরিবর্তনের কাজে লাগাতে হবে।

এখন দেখা যাচ্ছে যে আমাদের সামাজিক জীবনের গতি যেদিকে এগোচ্ছে, তাতে নারীদের আবার সেই ঘরকন্নার মধ্যে ঠেলে দেবার কথা আসে না। বরং নারীদের এখন সংকীর্ণ ঘরকন্নার গণ্ডী থেকে বেরিয়ে এসে বৃহত্তর সামাজিক জীবনের কাজের পূর্ণ দায়িত্ব নিতে হবে। এটা শুধু পুরুষদের একার দায়িত্ব নয়। নারীদেরও মানব সভ্যতা এগিয়ে নিয়ে যাবার কাজের পূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হবে। এই প্রসঙ্গে লেভেলী (LAVELEYE) লিখেছেন* : "আমরা যাকে বলি সভ্যতার বিকাশ, তার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ মা বাপের প্রতি ছেলে মেয়েদের ভক্তিশ্রদ্ধা আর পারিবারিক বন্ধন, তা কমে যাচ্ছে, মানুষের জীবনে তার প্রভাবও কমে যাচ্ছে। এ ঘটনা যেমন সর্বত্রই দেখা যায়, তাতে আমরা একে একটা সমাজ-বিকাশের রীতিই বলতে পারি।" ঠিক তাই। পরিবারের মধ্যে শুধু যে স্ত্রীদের অবস্থারই পরিবর্তন হয়েছে তা নয়, ছেলেমেয়েদের অবস্থারও পরিবর্তন হয়েছে। তারা ক্রমশঃ স্বাধীন হয়েছে। আগে এ রকম ছিল না। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে, যেখানে মানুষের মতো আত্মনির্ভরশীল হবার জন্য বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, সেখানে এ জিনিস অনেক বেশি দেখা যায়। এর দরুন এখন যে অসুবিধাগুলো হচ্ছে তা পরবর্তীকালে উচ্চতর সমাজব্যবস্থায় দূর করা যাবে।

লেভেলীর মতো ডাঃ স্কাইফিল ও (SCHAEFFLE) আমাদের সময়ে পারি-বারিক জীবনের আমূল পরিবর্তনের একটা সামাজিক কারণ** আছে বলে মনে করেন। তিনি বলেছেন : "দ্বিতীয় পঙতিতে যে বলা হয়েছে যে ক্রমশঃ পরি-বারের পরিধি ও কাজ কমিয়ে আনার ঝোঁক দেখা যাচ্ছে, সে কথা সত্য। পরি-বারের কাজ একটার পর একটা কমে আসছে। সামাজিক জীবনের একটা অংশ হিসাবেই পরিবারগুলি চলছে—আইন শৃংখলা, কর্তৃত্ব, ধর্ম প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কারিগরির কাজ—সব কিছুই একটার পর একটা সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে দাঁড়িয়ে গেলে পারিবারিক জীবনের কাজ কমে আসছে।"

নারীরা নিজেরাই এগিয়ে আসছে। যদিও তাদের সংখ্যা খুব কম, এবং তার মধ্যে অনেকেরই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। তারা যে শুধু ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রেই পুরুষদের সঙ্গে সমান তালে চলছে তাই নয়, তারা যে শুধু পারিবারিক জীবনে আরো স্বাধীনতা চায় তাই নয়, তাদের বিশেষ লক্ষ্য হল জীবনের উন্নতির জন্য মানসিক শক্তির বিকাশ ঘটানো। এখানে তাদের বাধা পেতে হয়। বলা হয় যে ওসব কাজ নারীদের জন্য নয়। নারীরা ওসব কাজের

* 'Primitive Property''. Chapter XX. Household Community.

** Bau und Lebendes Socialen Korpers. Vol 1 (Structure and Life of the Social Body).

অযোগ্য, যদিও বর্তমান সমাজে উচ্চতর কাজের জন্য নারীদের সুযোগ দেবার প্রশ্ন খুব কম ক্ষেত্রেই আসে, তবুও নীতি হিসাবে বিষয়টির গুরুত্ব আছে। কারণ যদি আমরা মেনে নিতে বাধ্য হই যে নারীদের উচ্চপদে নেওয়া যাবে না, তবে তাদের উন্নতি ও সমান অধিকারের প্রশ্নটিও লোকে মেনে নেবে না। অধিকাংশ পুরুষেরই দৃঢ় বিশ্বাস যে নারীরা মানসিক যোগ্যতার ক্ষেত্রে পুরুষদের চেয়ে কম আছে এবং থেকেই যাবে এ ধারণাটা যে ভুল তা প্রমাণ করার জরুরী প্রয়োজনের জন্যও নারীদের উচ্চপদে নিয়োগের সুযোগ দিতে হবে।

মজার ব্যাপার এই যে ঠিক যে সব লোক অন্য সময় নারীদের কঠিন শারীরিক পরিশ্রমের কাজ বা তাদের স্বাস্থ্য ও নৈতিক জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর এমন কাজ, আর যে সব কাজে গেছে তাদের সংসারে স্ত্রী বা মা হিসেবে দায়িত্ব পালনের বাধা হয় সে সব কাজের বেলায় কোনই আপত্তি করে না, ঠিক সেই সব লোকই আবার নারীদের অন্যান্য কাজে নিয়োগের বেলায় আপত্তি তুলে থাকে—যে সব কাজ কিনা অপেক্ষাকৃত হালকা, যেখানে বিপদও কম, আর নারীদের পক্ষে উপযোগীও বটে।

যে সব জার্মান পণ্ডিত উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নারীদের বাদ দেবার কথা বলে থাকেন তাদের মধ্যে মুচেনের অধ্যাপক এল বিশচফ (L. Bischof), গ্রেসলের ডাক্তার লুড উইগ হার্ট (Ludwig Hirt), অধ্যাপক এ. সিবেল (A. Sybel), এল. ভন ব্যারেনবাচ (L. Von Barenbach), ডাঃ ই. রেচ (E. Reich) এবং অনেকের নাম করা যায়। ব্যারেনবাচ বলেন যে নারীদের কোনো বৈজ্ঞানিক কাজে দেওয়া চলে না, কারণ তাঁর মতে নারীদের মধ্যে কোনো প্রতিভার সৃষ্টি হয়নি এবং স্বভাবতই তাঁরা দর্শনশাস্ত্রের অধ্যয়নের অনুপযোগী। শুনে মনে হয় যেন পৃথিবীতে পুরুষদের মধ্যে এতই দার্শনিক জন্মে গেছে যে নারীদের মধ্যে আর না হলেও চলবে। আর নারীদের মধ্যে কোনো প্রতিভার সৃষ্টি হয়নি এ কথাটাও ঠিক না। প্রতিভাবানরা আকাশ থেকে পড়ে না। প্রতিভার সৃষ্টি ও বিকাশের জন্য সুযোগ সুবিধা চাই। আর নারীদের এতকাল ধরে শুধু যে সে সব সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে তাই নয়, পুরুষরা তাদের হাজার হাজার বছর ধরে অত্যন্ত কঠোরভাবে পদানত করে রেখেছে। সাধারণভাবে শিক্ষিত নারীদের মধ্যে খুব একটা চমকপ্রদ প্রতিভা চোখে পড়ে না বলেই নারীদের মধ্যে প্রতিভাশালিনী হতে পারে না এটা ধরে নেওয়া ভুল হবে। ঠিক যেমন পুরুষদের মধ্যেও যে সামান্য কয়েকজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি বলে পরিচিত হয়েছে, তারা ছাড়া আর কোনো প্রতিভাশালী ব্যক্তি হতে পারবে না, এটা ধরে নেওয়া ভুল। সুযোগ সুবিধা পাবার বলেই মুষ্টিমেয় প্রতিভার বিকাশ সম্ভব হয়েছে। গ্রামের সাদাসিধে স্কুল শিক্ষকও বলতে পারবেন যে সুযোগ সুবিধার অভাবে

কত লোকের প্রতিভার বিকাশ হতে পারেনি। পুরুষদের মধ্যেও যে কয়েকজনের প্রতিভার বিকাশ সম্ভব হয়েছে তার চেয়ে হাজারগুণ বেশি মানুষের প্রতিভা সুযোগ সুবিধার অভাবে বিকশিত হতে পারেনি। ঠিক যেমন তারা আবার গুঁড়িয়ে দিয়েছে শত শত বছর ধরে নিপীড়িত, শৃংখলিত, অনেক বেশি বাধা-বিঘ্ন জর্জরিত নারীদের যোগ্যতাগুলি। স্বাভাবিক সুযোগ সুবিধার অবস্থার মধ্যে বেড়ে উঠলে নারী ও পুরুষের মধ্যে মানসিক শক্তি ও যোগ্যতা কতখানি হতে পারে এখন তা মেপে দেখবার মতো কোনো মাপকাঠিই আমাদের হাতে নেই।

জীবজগতের অবস্থাটা উদ্ভিদ জগতের মতই। একই জমিতে অন্য গাছ-পালা জন্মানোর ফলে লক্ষ লক্ষ বীজ পুষ্টি, আলো, হাওয়া না পেয়ে শুকিয়ে যায়। প্রকৃতির এই নিয়ম মানুষের বেলাতেও খাটে। যদি কোনো মালী বা চাষী জমিটা কেমন তা না দেখেই, বা যা করলে জমি উর্বর হতে পারে তার উল্টোটা করে যদি বলতে থাকে যে এ জমিতে কিছু ফলতে পারে না, তবে যারা জমির ব্যাপারটা বোঝে তারা তো তাকে বোকা বলবে। আর তা বলাও ঠিক। তেমনিই যদি কেউ উন্নত গৃহপালিত জন্তুর জন্য নিকৃষ্ট স্তরে স্ত্রী জাতীয় জন্তুকে উচ্চস্তরের পুরুষ জাতীয় জন্তুর সংগ দিতে না চায়, তাকেও বোকা বলা হবে। আজকের দিনে জার্মানীতে এমন অজ্ঞ লোক খুব কমই আছে যে জন্তু বা উদ্ভিদের বিষয়ে যুক্তিযুক্ত ব্যবস্থার কথা না বোঝে। সে ব্যবস্থা নেওয়া তার সাধ্যে কুলোয় কিনা সে কথা আলাদা। পুরুষদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিই প্রকৃতির নিয়মকে অব্যর্থ বলে মনে করে। কিন্তু তবুও বৈজ্ঞানিক না হয়েও, প্রত্যেকেরই প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অনেক কিছুই শিখবার আছে। গাঁয়ের চাষীদের ছেলেমেয়েরা শহরের ছেলেমেয়েদের থেকে তফাৎ কেন? তাদের জীবন, শিক্ষাদীক্ষা ভিন্ন রকমের বলে।

কোন একটা বিশেষ পেশার জন্য যে একঘেয়ে শিক্ষা নিতে হয় তাতে তার উপর একটা বিশেষ ছাপ পড়ে যায়। একজন পুরোহিত বা শিক্ষকের চেহারা ধরন-ধারণ দেখলেই বোঝা যায়। তেমনিই সাদাসিদে পোশাকেও অফিসারদেরও ঠিকই চেনা যায়। মুচির সঙ্গে দর্জির তফাৎ বা ছুতোর ও কামারের সঙ্গে তফাৎটাও স্পষ্টই বোঝা যায়। দুটি যেমন যমজ ভাই, যাদের অল্প বয়সে একই রকম চেহারা ছিল, তারা যদি বড় হয়ে একজন মিস্ত্রী ও একজন দার্শনিক হয় তবে তাদের চেহারাও তফাৎ হয়ে যাবে। বংশ ও পরিবেশের মানুষের জীবনে ও পশুদের জীবনেও মূল্যবান ভূমিকা আছে। অবশ্য মানুষই পরিবেশের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি খাপ খাইয়ে নিতে পারে। কয়েক বছরের আলাদা পেশা ও ভিন্ন ধরনধারণ মানুষকে বদলে দেয়। এই দ্রুত পরিবর্তনটা অবশ্য বাহ্যিক। কোনো গরিব মানুষের যদি হঠাৎ অবস্থার উন্নতি হয়, তবে এ তফাৎটা খুবই

দেখা যায়। সে তখন আর উ'চু'স্তরের অবস্থার মতো শিক্ষাদীক্ষাকে আর বাড়াতে পারে না, কারণ একটা বয়সের পর আর নিজেকে বদলাতে চেণ্টা করে না। তার আগের মতো ধরনধারণ থেকে যায়। এই ভুঁইফোড় বড়লোকেরা জ্ঞানের অভাবের জন্য অসুবিধা বোধ করে না। আমাদের অর্থলিপ্সু যুগ নামসংকীর্ণ কৃষ্টিবান প্রতিভাশালী মানুষের চেয়ে ধনীর চরণেই মাথা নত করে থাকে বেশি। অবশ্য এই ভুঁইফোড় ধনীদের ছেলেমেয়েরা আবার নতুন অবস্থার সংগে ঠিকই খাপ খাইয়ে নেয় ও সেই পরিবেশের আর পাঁচজনের মতই হয়।

আমরা দেখেছি যে-সব জেলায় শিল্পের উৎপাদন হয়ে থাকে সেখানকার জীবনধারণ ও শিক্ষাব্যবস্থা অন্য রকম। শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে এমনই তফাৎ দেখা যায় যেন তারা দুটো আলাদা জাতি। যদিও এই তফাৎটা আমার কাছে কিছু নতুন নয়, কিন্তু সেটা আমার এমন ভয়াবহ মনে হয়েছিল যখন আমি ১৮৭৭ সালের শীতকালে আরজগেবার্গ শহরে একটা নির্বাচনী সভায় গিয়েছিলাম। এই সভায় আমি একজন উদারনৈতিক অধ্যাপকের সংগে বিতর্কে যোগ দিয়েছিলাম। সভার হলঘরটিতে দুই পক্ষের লোক দুই দিকে আলাদা আলাদা বসেছিল। প্রথম সারিগুলিতে ছিল বিরোধী পক্ষের লোকেরা। তারা প্রায় সকলেই বেশ হৃষ্টপুষ্ট, বলবান, অনেকেই বেশ লম্বা চওড়া, সুন্দর স্বাস্থ্য চেহারায় ফুটে উঠেছে। আর পিছনের দিকে রয়েছে শ্রমিক ও ব্যাপারীরা, দশ-ভাগের নয় ভাগ তাঁতী। তাদের অধিকাংশই রোগা, বুকের ছাতি সরু, গাল তোবড়ানো, তাদের মুখের চেহারায় ফুটে উঠেছে দুঃখ কষ্ট অভাবের চিহ্ন। পূর্বের দল হল সুষ্ঠু বিত্তশালী গুণাবলী ও নীতির অধিকারী। আর পরোক্ত দল হল কাজের মানুষ, ভারবাহী জীবেরা এদের শ্রমের ফল ভোগ করে ঐ বড়লোকেরা তাদের চেকনাই চেহারা তৈরি করেছে, আর শ্রমিকদের জুটেছে অনাহার। এক বংশ পরম্পরা ধরে এদের উভয়কেই একই অনুকূল পরিবেশের মধ্যে রাখলে দেখা যাবে যে তাদের মধ্যেকার তফাৎটা চলে গেছে। আর তাদের সন্তানদের মধ্যে সে তফাৎ একেবারেই দেখা যাবে না।

আবার উল্লেখ করা যেতে পারে যে নারীদের সামাজিক অবস্থার বিচার করা আরো কঠিন, কারণ তারা নতুন অবস্থার সংগে অনেক সহজেই খাপ খাইয়ে নিতে পারে, এবং চটপট উচ্চতর শ্রেণীর চাল চলন শিখে ফেলতে পারে। এ বিষয়ে তারা পুরুষদের থেকে বেশি পটু। সুতরাং নারীরা যে মানসিক বিকাশের দিক থেকেও উন্নতি করতে পারে সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহের আর কোনো কারণ নেই।

এ সব জিনিস থেকেই আমরা দেখতে পাই সমাজের অবস্থার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রকৃতির নিয়মের মূল্য অনেকখানি।

উন্নত সামাজিক পরিবেশ পেলে, অর্থাৎ শারীরিক মানসিক বিকাশের উপযুক্ত সুযোগ ও শিক্ষা পেলে নারীরা যে কতদূর উন্নতির শিখরে উঠতে পারে সে বিষয়ে আমাদের বর্তমানে কোনো ধারণাই নাই। ব্যক্তিগতভাবে যে নারীরা অনেক উন্নতি করেছে তাদের দেখেই তা বোঝা যায়। পুরুষদের মধ্যেও যেমন প্রভাবশালী ব্যক্তিরা অন্য সবার চেয়ে অনেক তফাৎ, নারীদের মধ্যেও ঠিক তেমনিই দেখা যায়। রাষ্ট্রের সরকারী কাজের বেলায় গড়পড়তা পুরুষদের চেয়ে নারীদের দক্ষতা বেশি দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করতে পারি ইসাবেলা ও ক্লাটাইগের ব্লাঞ্চির কথা, রাশিয়ায় ক্যাথারিনের কথা, ম্যারিয়া টেরেসা প্রভৃতির কথা। তাছাড়া অনেক বড় বড় লোকের বেলায় দেখা গেছে যে তাদের নাম-ডাকের পিছনে অন্য অনেকেই কাজ করেছে। যেমন, জনৈক জার্মান লেখক হের ভন সিবেল (Herr Von Sybel কাউন্ট মিরাবোঁকে Count Mirabeau) একজন খুবই সুবক্তা এবং ফরাসী বিপ্লবের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলে বর্ণনা করেছেন। এখন গবেষণার মাধ্যমে দেখা গেছে যে তাঁর ভাল ভাল বক্তৃতাগুলি সব অন্যান্য পন্ডিত ব্যক্তিরা তৈরী করে দিতেন। তারা চুপচাপ পিছনে থেকে কাজ করতেন আর মিরাবোঁ তাঁদের নিজের কাজে লাগাতেন। কিন্তু নারীদের মধ্যে দেখা গেছে অস্বাভাবিক জিনিস! ম্যাডাম রোঁলা, ম্যাডাম ডি স্টীল, জর্জ স্যান্ড প্রভৃতির প্রতিভার কাছে অনেক প্রতিভার পুরুষই ম্লান হয়ে গেছে। বড় বড় লোকদের কৃতিত্বের পিছনে তাদের মায়েদের অবদানও উল্লেখযোগ্য। সমস্ত দিক বিবেচনা করে দেখলে দেখা যাবে যে নারীদের পক্ষে যতটা সম্ভব তা তারা করেছে, আর তার থেকেই বোঝা যায় যে ভবিষ্যতে অনেক উন্নতি হতে পারবে।

নারীরা কেউ পন্ডিত বা দার্শনিক হতে পারবে না এ কথা ধরে নেওয়া ঠিক নয়। পুরুষদের মধ্যেও বহুলোক সুযোগ সুবিধার ফলে উন্নতি করতে পারেনি। নারীদের বড় হবার যোগ্যতা নেই যারা বলে থাকে, তারা পুরুষদের মধ্যেও কারিগর, শ্রমিকদের বেলায় ঐ কথাই বলে থাকে। অভিজাতরা রক্ত ও বংশের কথা বলে থাকে। তারা নীচের তলার লোকদের থেকে নিজেদের বড় মনে করে। যেন তারা যে বিশেষ সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে সে সব কিছুই নয়, তারা যেন শুধু নিজেদের যোগ্যতা ও গুণের জন্যই উন্নতি লাভ করেছে। যারা নিজেদের সংস্কারমুক্ত বলে থাকে স্বাধীন চিন্তার বড়াই করে থাকে, এবং তাদের চেয়ে রক্ষণশীলদের অবজ্ঞার চোখে দেখে, তারাই আবার নিজেদের শ্রেণী-স্বার্থে ঘা লাগলে বা তাদের অহমিকায় ঘা লাগলে অত্যন্ত সংকীর্ণ মনের পরিচয় দিয়ে থাকে। তাদের বিরোধিতা গোঁড়া উন্মাদনার আকার ধারণ করে। এই অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা নীচের তলার মানুষদের যে চোখে দেখে,

অধিকাংশ পুরুষই নারীদের ঠিক সেই চোখে দেখে। পুরুষরা নারীদের শুধু তাদের সুবিধা ও ভোগের উপায় হিসাবে দেখে থাকে। নারীদের তারা কিছুতেই তাদের সমান মনে করতে পারে না। নারীকে হতে হবে নম্র বিনয়ী। শুধু ঘর সংসার নিয়েই তার থাকতে হবে। আর সবকিছু ছেড়ে দিতে হবে তার পুরুষ প্রভুর উপর। নারীকে নিজের ভাবনা চিন্তা আশা আকাঙ্ক্ষাকে দমন করে রাখতে হবে, আর মেনে নিতে হবে তার পার্থিব ভগবান অর্থাৎ তার পিতা বা স্বামীর কথা। তাহলেই তাকে ভার্যা বলা হবে, তার ফলে যদি তার নিজের শারীরিক মানসিক ক্ষতিও হয়ে যায় তাই সই। সমস্ত মানুষের সমান অধিকারের কথা বলা হয়ে থাকে। কিন্তু সমগ্র মানব জাতির অর্ধাংশকে বাদ দিয়ে সে সমান অধিকার হওয়া একেবারেই অসম্ভব।

প্রকৃতি নারী ও পুরুষকে একই অধিকার দিয়েছে। নারী হয়ে জন্মানর জন্যই আর সে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে পারে না। নারী বা পুরুষ হয়ে জন্মানর বিষয়ে, তাদের নিজেদের কোনো হাত নেই। জাতি ধর্ম রাজনৈতিক মতবাদের জন্য যেমন কোনো মানুষকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় না, তেমনি নারীদেরও করা যায় না। এই বৈষম্য করাটা প্রগতিশীল চিন্তার ও সমাজ প্রগতির পরিপন্থী। প্রকৃতির নিয়মেই নারী পুরুষের মধ্যেই যে দৃশ্যত পার্থক্য রয়েছে, তা ছাড়া অন্য কোনো পার্থক্য থাকা উচিত নয়। কোনো একটি শ্রেণীর যেমন অন্য শ্রেণীর পথে বাধা দেবার অধিকার নাই তেমনি নারী বা পুরুষের মধ্যেও কেউ কারও পথের বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না।

এই কথা বলেও আমরা নারীদের উন্নতির পথে বাধা না দেবার বা তাদের যোগ্যতাকে অস্বীকার না করার প্রসঙ্গ শেষ করতে পারি। কিন্তু আরো একটা বড় কথা রয়ে যায়। যারা নারীদের বিরুদ্ধে বলে, তারা বলে থাকে যে নারীর মস্তিষ্ক পুরুষের চেয়ে ছোট, এবং তার থেকেই প্রমাণিত হয় যে নারীরা পুরুষদের চেয়ে নীচেই থেকে যাবে। প্রথম কথাটা ঠিক, কিন্তু তার থেকে যে সিদ্ধান্ত করা হচ্ছে সে বিষয়ে আলোচনা করা দরকার।

দেখা গেছে যে গড়ে নারীদের মস্তিষ্কের মাপ ও ওজন পুরুষদের মস্তিষ্কের মাপ ও ওজনের চেয়ে কম। হাসকির (HUSCHKE) হিসাব অনুযায়ী ইউরোপের পুরুষদের মাথার খুলির গড় ওজন ১৪৪৫ কিউ সেণ্টিমিটার (c. ctm) আর নারীদের ১২২৬ কিউ. সেণ্টিমিটার সুতরাং ২২০ কিউ সেঃ তফাৎ। অধ্যাপক বিশচক-এর (BISCHOF) হিসাব অনুযায়ী পুরুষদের মস্তিষ্ক নারীদের মস্তিষ্কের চেয়ে ১২৬ গ্রাম বেশী ভারী! অধ্যাপক মেনার্ট (MEINERT) বলেন ৯০ থেকে ১০০ গ্রাম বেশি। কিন্তু নারী বা পুরুষের নিজেদের মধ্যেও তো একজনের থেকে অন্যজনের মস্তিষ্কে ওজনের অনেক তফাৎ দেখা যায়।

অধ্যাপক রেক্লাম (RECLAM) এর হিসাব অনুযায়ী প্রাণীতত্ত্ববিদ কাভিয়ার (CUVIER) এর মস্তিষ্কের ওজন ছিল ১৮৬১, বায়রণের ১৮০৭, গণিতজ্ঞ ডাইরেকলেট (DIRECHLET) এর ১৫২০, বিখ্যাত গণিতজ্ঞ গস (GAUS) মর মাত্র ১৪৯২, দার্শনিক হারম্যান (HERMANN) এর ১৩৫৮, এবং পণ্ডিত হসম্যান (HAUSMANN) এর ১২২৬ গ্রাম। এখানে আমরা দেখছি যে বিভিন্ন মেধাবী মানুষদের মস্তিষ্কের মাপের অনেক তফাৎ রয়েছে। এর থেকে দেখা যায় যে মস্তিষ্কের মাপ দিয়ে মানুষের মানসিক শক্তি মাপতে গেলে ভুল হবে। তাছাড়া এই সব পরীক্ষা নিরীক্ষা অতি সম্প্রতি শুরু হয়েছে, এবং এর থেকে এখনই কোনো সিদ্ধান্তে আসাও যায় না। তাছাড়া নারী ও পুরুষের শরীরের মাপ ও ওজন হিসাবে তাদের মস্তিষ্কের আয়তন ও ওজনের কথা যদি ধরা যায় তবে দেখা যাবে যে শরীরের গড়পড়তা মাপ ও ওজন অনুপাতে পুরুষদের চেয়ে নারীদের মস্তিষ্কের মাপ বেশি। মনে হয় যেমন শরীরের মাপ দেখে শরীরের শক্তি বোঝা যায় না, মস্তিষ্কের বেলাতেই সেই রকম। মস্তিষ্কের মাপ ও ওজন বেশি হলেই যে বুদ্ধি বেশি হবে তার কোনো মানে নেই। অনেক ছোট ছোট জীব আছে, যেমন পিঁপড়ে, মৌমাছি তাদের বুদ্ধি অনেক বড় বড় জন্তু যেমন ভেড়া গরুর চেয়ে বেশি। তেমনি আমরা দেখেছি যে অনেক লম্বা চওড়া মানুষের চেয়ে অনেক বেঁটে খাটো মানুষের বুদ্ধি বেশি। সুতরাং মস্তিষ্কের মাপ ও ওজন দিয়ে মানুষের বুদ্ধি মাপতে যাওয়া ঠিক নয়। মস্তিষ্ক কি প্রকারের এবং তার ব্যবহার ও উৎকর্ষ কিভাবে করা হচ্ছে তার গুরুত্ব অনেক বেশি।

আসল কথা মানুষের মস্তিষ্ক বা মগজের পুষ্টি ও ব্যবহারের প্রয়োজন। শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতো মস্তিষ্কের বিকাশ হওয়া দরকার। যদি তা না হয় বা মানুষের মাথার কাজটা ভুলপথে চালানো হয়, যদি বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের চেষ্টা না করে অনুভূতি ও কল্পনার চেষ্টা করা হয়, তাহলে তার মস্তিষ্কের শক্তির বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যায়। একটি অংশের ক্ষতি করে অপর অংশকে পুষ্ট করা হয়।

নারীর বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের ইতিহাসের সঙ্গে যাদের এতটুকুও পরিচয় আছে তারাই জানেন যে হাজার হাজার বছর ধরে নারীর প্রতি কত অন্যায় চলে আসছে। অধ্যাপক বিশচক যখন বলেন যে নারীরাও পুরুষদের মতো মগজ ও বুদ্ধির চর্চা করতে পারত, তখন বোঝা যায় যে এতবড় একটা পণ্ডিত ব্যক্তিও তাঁর অলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে কতদূর অজ্ঞ। তাহলে সভ্যতার নিম্নস্তরের উপজাতি-গুলির মধ্যে, যেমন নিজেদের এবং প্রায় সমস্ত অসভ্য উপজাতিগুলির মধ্যে যে সভ্যসমাজের চেয়ে নারী ও পুরুষদের মস্তিষ্কের মাপ ও ওজনের তফাৎ অনেক কম তা কেমন করে হল? তার কারণ নিশ্চয়ই এই যে সভ্য জাতিগুলির মধ্যে

পুরুষদের বুদ্ধির বিকাশের জন্য যে শিক্ষাদীক্ষা হয়েছে তারই জন্য, মাথার কাজের শক্তি বেড়েছে, আর নারীদের তা বাড়তে পারেনি। এই পুস্তকের প্রথমের দিকে দেখানো হয়েছে যে গোড়ার দিকে নারী ও পুরুষের শারীরিক মানসিক শক্তির মধ্যে বিশেষ কোনো তফাৎ ছিল না, কিন্তু ক্রমশঃ নারীর উপর পুরুষের প্রভুত্ব বিস্তার হতে থাকলে এই তফাৎ ক্রমশঃ বাড়তে থাকে।

আমাদের বিদ্বান ব্যক্তিদের যদি বিজ্ঞানে কোনো বিশ্বাস থাকে তবে তাঁরা মানুষের জীবন ও তার বিকাশের ক্ষেত্রেও সেই বিজ্ঞানের নীতি মানবেন। তাহলে তাঁরা মানবেন যে প্রকৃতির অন্য সমস্ত জীবের মতো মানুষের ক্ষেত্রেও বংশ পরিবেশ, বিকাশের ধারা একই বৈজ্ঞানিক নিয়মে চলে।

ডাঃ এল বুচনের (L-BUCHNER) এর মতো কোনো কোনো লেখক বলে থাকেন যে ভিন্ন ভিন্ন সভ্যজাতির মধ্যে নারী ও পুরুষের মগজের পার্থক্যেরও তফাৎ আছে। জার্মান ও ওলন্দাজদের মধ্যে এই পার্থক্য সবচেয়ে বেশি। তারপর আসে ইংরাজ, ইতালীয়, সুইডিশ এবং ফরাসী জাতি, শেষোক্ত জাতির মধ্যে নারীপুরুষের মগজ প্রায় সমান সমান। বুচনের এ প্রশ্নে যাননি যে ফরাসী দেশের নারীরা অনেক বেশি শিক্ষিত বলেই তারা পুরুষদের সমান হয়েছে, না সেখানকার পুরুষরাই কম শিক্ষিত বলে নারীদের বুদ্ধিবৃত্তিতে নারীদের কাছাকাছি রয়ে গেছে। দুটোর একটা হয়তো ঠিক। ফরাসী দেশের সভ্যতার স্তর হিসাবে বিচার করলে প্রথমটায় কি মনে হবে।

বাস্তবিক পক্ষে শিক্ষাদীক্ষা যেমন হয় সেই অনুযায়ী মানুষের মস্তিষ্কের শক্তিও বাড়ে। সমস্ত শরীরতত্ত্ববিদরাই একথা জানেন যে মানুষের বুঝবার শক্তি তার মস্তিষ্কের সামনের অংশের উপর, অর্থাৎ চোখের উপরের দিকে, মাথার খুলির সামনের দেওয়ালের ঠিক পিছনের দিকের উপর নির্ভর করে। অনুভূতির অংশটা মস্তিষ্কের মাঝামাঝি অংশের সঙ্গে প্রধানতঃ জড়িত। নারী ও পুরুষের মাথার গড়নের মধ্যে লক্ষ করা যায় যে পুরুষদের মাথার সামনের দিকটা বেশি বড় আর নারীদের মাথার মাঝখানটা বেশি বড়।

নারী পুরুষের সৌন্দর্যও নির্ধারিত হয়েছে তাদের এই মাথার গড়ন অনুযায়ী, যা কিনা তাদের মধ্যে প্রভুত্ব ও দাসত্বের সম্বন্ধ থেকে হয়েছে। সৌন্দর্যের গ্রীক আদর্শ অনুসারে যা কিনা আজ পর্যন্ত প্রাধান্য পেয়ে এসেছে— নারীদের কপাল হবে সরু ও নীচু আর পুরুষদের কপাল হবে উন্নত ও প্রশস্ত। নারীদের প্রতি অবমাননাকর এইরকম রূপের আদর্শ নারীদের নিজেদের মনের মধ্যেও এমনই গেঁথে গেছে যে সাধারণ মেয়েদের চেয়ে একটু উঁচু কপাল হলেই তারা তাকে অস্বাভাবিক মনে করে, আর নানা কৌশলে সেই স্বাভাবিক অবস্থা-

টাকে ঢাকবার জন্য কপালের উপর চুল টেনে টেনে নিয়ে এসে কপালটাকে ছোট করে দেখাতে চেষ্টা করে।

এত সবের পর আর আদপেই এ ভেবে অবাক হবার কোনো কারণ নেই যে নারীদের অবস্থা কেন এমন হল। ডারউইন খুবই ঠিক কথা বলেছেন যে কাব্যে, চিত্রকলায়, স্থাপত্যশিল্পে, সঙ্গীতে, বিজ্ঞানে এবং দর্শন শাস্ত্রে যে বিশিষ্ট নারীদের তালিকা পাওয়া যায় তাদের সঙ্গে ঐ ধরনের পুরুষদের তালিকার কোনো তুলনা হয় না। কিন্তু তাতে আমাদের অবাক হবার কিছু নেই। সে রকম না হলেই অবাক হবার কারণ ছিল। ডাঃ ডোডেল পোর্ট* (Dr. Dodel Port)এর স্পষ্ট জবাব দিয়েছেন যখন তিনি বলেছেন যে কয়েকটি বংশ পরম্পরায় ধরে যদি নারী ও পুরুষ কলা ও বিজ্ঞানে সমান শিক্ষাদীক্ষা পেতে থাকে তবে তাদের মধ্যে পার্থক্যটা এ রকম দেখা যাবে না। নারীরা গড়পড়তায় পুরুষদের চেয়ে শারীরিকভাবে দুর্বল। কিন্তু অনেক অ-সভ্য উপজাতির মধ্যে সে রকম দেখা যায় না। তাদের মধ্যে কখনো কখনো উল্টোটাও দেখা যায়। ছোট বেলা থেকে শরীরচর্চার যে কি ফল হতে পারে তা নানা রকম ক্রীড়া ও সার্কাসের মেয়েদের দেখলেই বোঝা যায়। তারা সাহসে, যোগ্যতায় শক্তিতে যে কোনো পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। তাদের কার্যকলাপ দেখলে কখনো কখনো বিস্মিত হতে হয়।

এ সব জিনিসই শিক্ষা ও জীবনের বাস্তব অবস্থার উপর নির্ভর করে। সোজা কথায় প্রকৃতির বিজ্ঞান সব ক্ষেত্রেই চলে। গৃহপালিত পশুদেরও যেমন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রক্ষণাবেক্ষণ করলে চমকপ্রদ ফল পাওয়া যায়, মানুষের বেলাতেও তেমনিভাবে তাদের শারীরিক মানসিক বিকাশ ঘটানো যায়। আর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতনভাবে শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করতে পারলে আরো অভূতপূর্ব ফল পাওয়া যেতে পারে।

এই সব থেকে আমরা দেখতে পাই যে আধুনিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সঙ্গে আমাদের সমগ্র সামাজিক জীবন ও তার বিকাশ জড়িত। আর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গি ছাড়া মানব সমাজের অবস্থাটা স্পষ্ট বোঝা যায় না। এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে আমরা দেখতে পাই যে মানুষের মধ্যে ছোট বড়র সম্বন্ধ, তাদের চরিত্র, তাদের শারীরিক গঠন—ব্যক্তিগত ও জাতিগতভাবেও নির্ভর করছে তাদের শারীরিক অবস্থান, বা সামাজিক অর্থনৈতিক শক্তি বিন্যাসের উপর**, তার উপর

* Die neuere Schopfungeschicht. (The Modern History of Creation).

** এ বিষয়টি কার্লমার্কস প্রথম আবিষ্কার করেন, এবং তাঁর চিরায়ত রচনার মধ্যে, বিশেষত "ক্যাপিটাল" গ্রন্থে তা লিপিবদ্ধ করেন। এই মৌল তত্ত্বের উপরই ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কার্লমার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো লেখেন, যেটি কিনা এখনো খুবই চমৎকার পুস্তিকা।

থাকে বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা, জমি উর্বরতা ও জলবায়ুর প্রভাব। মার্কস, ডারউইন, বাকল্ এই তিনজনই তাঁদের নিজের নিজের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আধুনিক যুগের সবচেয়ে বড় বড় কথা বলেছেন। মানব সমাজের বিকাশ, ভবিষ্যৎ রূপ শেষ পর্যন্ত তাঁদেরই শিক্ষা ও আবিষ্কার অনুসারে হবে।

তাহলে যদি আমরা একথা মেনে নিই যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা সামাজিক বিধি ব্যবস্থার অভাবেই ব্যক্তিগত জীবনের বিকাশ ব্যাহত হয়, তবে এর থেকে একথাই বোঝা যায় যে সামাজিক পরিবেশের উন্নতি হলে ব্যক্তিগত জীবনেরও উন্নতি হবে। এর থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে ডারউইনের তত্ত্ব অনুযায়ী স্বাভাবিক নিয়মে মানুষের ক্রমবিকাশ হতে থাকবে কিন্তু তার জন্যও ক্রমশঃ ভিন্ন সামাজিক পরিস্থিতির প্রয়োজন। সুতরাং মার্কসবাদী তত্ত্ব অনুযায়ী সেই সমাজ ব্যবস্থা সমাজতন্ত্রে গিয়ে পৌঁছবে। বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়েই একথা প্রমাণিত হয়।

ডারউইন-এর তত্ত্ব অনুযায়ী নিজের অস্তিত্বের জন্য লড়াই-এর মধ্য দিয়ে সবল ও উন্নত প্রাণীরা ক্রমশঃ দুর্বল প্রাণীদের ধ্বংস করে দেয়। মনুষ্য জগতে তার ভিন্নতর রূপ দেখা যায়। মানুষ চিন্তা ভাবনা করতে পারে। তারা ক্রমশঃ তাদের জীবনকে পরিবর্তিত ও উন্নত করে উৎকর্ষের দিকে এগিয়ে যায়। তাদের সামাজিক অবস্থা এবং পারিপার্শ্বিক সব কিছুকে এমনভাবে অগ্রগতির দিকে নিয়ে যেতে থাকে যাতে শেষ পর্যন্ত সমগ্র মানব জাতিই সমান সুযোগ সুবিধা পেতে পারে। মানুষে ক্রমশঃ এইরূপ পরিবেশ, আইন কানুন ও বিধি ব্যবস্থা করবে যাতে প্রত্যেকটি ব্যক্তি তার প্রতিভা ও যোগ্যতাকে এমনভাবে বিকশিত করতে পারে যাতে তার নিজের ও সমগ্র সমাজের উপকার হতে পারে। কিন্তু তখন তার অন্য কোন তৃতীয় ব্যক্তির অথবা সমাজের ক্ষতি করার ক্ষমতা থাকবে না, কারণ তাতে তার নিজেরই ক্ষতি হবে। সেই উৎকৃষ্ট অবস্থায় পৌঁছলে তার মানসিক অবস্থারও এমন উন্নতি হবে যে সে আর অন্যের উপর প্রভুত্ব করার বা কারও ক্ষতি করার কথা ভাবতেও পারবে না।

প্রত্যেক বিজ্ঞানের মতো ডারউইনতত্ত্বের মধ্যেও গণতান্ত্রিক* চিন্তা রয়েছে। যারা তা অস্বীকার করে তারা সে বিজ্ঞানের আসল কথাটাই উপলব্ধি করতে পারেননি। ধর্মযাজকরা ডারউইন তত্ত্বের বিরোধিতা করে। কারণ তারা নিজেদের স্বার্থের কথাটা বেশ বুঝতে পারে। তাই তারা ডারউইনবাদকে সমাজতান্ত্রিক ও নাস্তিক আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করে। এই শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে একমত

* "The Hall of Science is the Temple of Democracy". Buckle : History of Civilisation in England, 2nd Part 4th edition, translated into German by A. Runge.

হয়েই অধ্যাপক ভারশ (VIRCHOW) ১৮৭৭ সালে মানয়েনে অনুষ্ঠিত বৈজ্ঞানিকদের অধিবেশনে অধ্যাপক হ্যাকেল এর (HACKEL) বিরোধিতা করে বলেছিলেন ঃ "ডারউইনতত্ত্ব সমাজতন্ত্রের দিকেই যায়"। বিদ্যালয়ে পাঠক্রমে 'হিসট্রি অব ইভলিউশন' অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অধ্যাপক হ্যাকেল যে প্রস্তাব এনেছিলেন তার বিরোধিতা করার জন্যই একথা বলা হয়েছিল।

ভারশ যে বলেছেন ডারউইনতত্ত্ব সমাজতন্ত্রের দিকে নিয়ে যায়, তাতে সমাজ-তন্ত্রের পক্ষেই যুক্তি আসে; বিপক্ষে নয়। কিন্তু বিজ্ঞানের কাজ এ নয় যে তার সিদ্ধান্তের দ্বারা রাষ্ট্রের বা সমাজের কোন্ পরিস্থিতিতে পেঁছবে তা দেখা। বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলি সঠিক কি না তা দেখতে হবে, এবং সঠিক হলে তা গ্রহণ করতে হবে। তা না করে কেউ যদি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তকে কোনো ব্যক্তিগত পার্টি বা শ্রেণীগত সুবিধা অসুবিধা অনুযায়ী বিচার করতে থাকে, তবে সে বিজ্ঞানকেই অসম্মান করে থাকে। একথা সত্য যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বৈজ্ঞানিক সত্যেব স্থান নেই। সেখানে চাকরি যাবার, কর্তৃপক্ষের কুনজরে পড়বার, বা সুনাম, সুযোগ সুবিধা হারাবার ভয় আছে। তাই অনেকে তাদের নিজেদের বিশ্বাস গোপন করে রাখে, বা অনেক সময় যা বিশ্বাস করে তার উল্টোটাও বলে থাকে। ১৮৭০ সালে যখন অধ্যাপক ডুবইস রেমন্ত (DUBOIS REYMOND) বার্লিন বিশ্ববিদালয়ের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করতে গিয়ে বলেছিলেন "বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হল হোহেন জোলায়নের (HOHEN ZOLLERN) আধ্যাত্মিক শরীর রক্ষক, তখন হের ডুবই রেমন্তের চেয়ে যারা জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধিতে অনেক কম, তাদের অধিকাংশ লোক বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আর কি ভাবতে পারে? বিজ্ঞানকে ক্ষমতার সেবাদাসীর পর্যায়ে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তাই এটাও স্বাভাবিকই যে অধ্যাপক হ্যাকেল এবং তাঁর অনুগামীরা—যেমন অধ্যাপক স্মিড (SCHMIDT), হের ভন হেলওয়াল্ড (HERR VON HELLWALD) এবং অন্যান্যরা জোরের সংগে একবার প্রতিবাদ করে যে ডার-উইনতত্ত্ব সমাজতন্ত্রের দিকে নিয়ে যায়, আর বলে যে ঃ "ঠিক তার উল্টো, ডারউইনতত্ত্বের আভিজাত্য আছে, কারণ এই তত্ত্ব শেখায় যে প্রকৃতির সর্বত্রই অধিক শক্তিশালী ও উন্নত প্রাণীরা নিম্নস্তরের প্রাণীদের ধ্বংস করে ফেলে। সুতরাং শিক্ষিত ধনী ব্যক্তিরা হল সেই অধিক শক্তিশালী প্রাণী। তাদের আধিপত্য হল স্বাভাবিক নিয়ম সম্মত ও যথার্থ।

* ১৮৮৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে 'গ্রেট ফ্রেডারিকের' (Frederick the great) জন্ম-বার্ষিকী অনুষ্ঠানের সময় হের ডুবাইস রেমণ্ড (Herr Dubois-R ymond) তাঁর উপর যে আক্রমণ হয়েছিল সেই সূত্রে এই কথাটির পুনরুল্লেখ করেন।

এই ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত কেমন করে করা হয় তা সহজেই বোঝা যায়। ওই ভদ্রলোকেরা নিজেদের সুবিধামত একটা তত্ত্বকে যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগ করেছেন। তারা মনে করেন, যে যেহেতু জীবজন্তুরা চেতনাশূণ্যভাবেই দুর্বলদের উপর সবলের জোর প্রয়োগ করে থাকে, মানুষদের বেলাতেও তাই চলবে। কিন্তু মানুষ এই তত্ত্ব অনুযায়ী ক্রমশঃ বিকাশ লাভ করে রাজনৈতিক সামাজিক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান—সর্বক্ষেত্রেই তার প্রয়োগ করে সম্পূর্ণ পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে যায়। মানুষের সংগে নিম্নস্তরের প্রাণীদের তফাৎ এই যে মানুষ ভাবনা চিন্তা করতে পারে, অন্য প্রাণীরা তা পারে না। ডারউইনতত্ত্ববিদ পণ্ডিতরা এই জিনিসটা দেখেননি বলে ভুল সিদ্ধান্তে এসে পেঁছেছেন।

অবশ্য অধ্যাপক হ্যাকেল ও তাঁর অনুগামীরা একথা বলেন যে ডারউইনতত্ত্ব নাস্তিকতার দিকে যায়। সব রকমের যুক্তিতর্কের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে নাকচ করে দিয়েও তাঁরা আবার পিছন দরজা দিয়ে তাকে নিয়ে আসে। মানুষের নিজস্ব "ধর্ম", "উচ্চ নৈতিকতা বোধ', "নৈতিক নীতি" ইত্যাদি বুলির আড়ালে আবার ঈশ্বরবাদকে নিয়ে আসে। ১৮৮২ সালে আইসেনাকে বিজ্ঞানীদের সমাবেশে অধ্যাপক হ্যাকেল ওয়েমারের গ্র্যান্ড ডুকাল পরিবারের সামনে শুধু ধর্মকে উদ্ধার করার কথাই বললেন না, তিনি তাঁর নেতা ডারউইনকে একজন ধার্মিক ব্যক্তি হিসাবে উপস্থাপন করলেন। তাঁর সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। ডারউইনের যে বক্তৃতা ও যে চিঠির উদ্ধৃতি তিনি দিলেন তা থেকে অধ্যাপক হ্যাকেল যা বলতে চাইলেন তার উল্টোটাই বোঝা গেল। ডারউইন তাঁর ইংল্যান্ডের সাধারণ মানুষের ধর্ম-বিশ্বাসের দিকে তাকিয়েই নিজের মনের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করতেন না। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তিনি তার মনোভাব প্রকাশ করেছেন। আইসেনাকের অধি-বেশনের কিছুদিন পরেই সেকথা জানা যায়। অধ্যাপক বুচনের (BUCHNER) কাছে তিনি স্বীকার করেছিলেন যে তাঁর ৪০ বছর বয়স থেকে, অর্থাৎ ১৮৪৯ সাল থেকে তিনি ঈশ্বর বিশ্বাস করতে পারেননি, কারণ সে বিশ্বাসের পক্ষে কোনো প্রমাণ তিনি পাননি। তদুপরি ডারউইন পরবর্তী সময়ে নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত নাস্তিকদের পত্রিকাকে ছদ্মনামে সমর্থন করেছিলেন।

আধুনিক প্রকৃতি বিজ্ঞানের বিষয়ে, এবং মানবসমাজের প্রতি তার প্রভাবের বিষয়ে এই পর্যন্ত বলা যায় যে জার্মানীর বিশিষ্ট প্রতিনিধিরা না হয় সচেতন-ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন, অথবা তাঁর ভূমিকা সম্বন্ধে বুঝতে পারেননি।

অধ্যাপক ভারশ-এর সংগে ডক্টর ডুরিংও (DUHRING) ডারউইন এবং ডারউইনতত্ত্বের প্রতি তীব্র আক্রমণ করেছেন। তার জন্য তিনি ডারউইন তত্ত্বের বিকৃত ব্যাখ্যা করেছেন এবং তাঁকে আক্রমণ করেছেন। এ হল যুক্তিতর্কের বাইরে মানসিক অবনতির লক্ষণ।

আমাদের প্রকৃত আলোচ্য বিষয় বলতে গেলে আরো একটি কথা বলতে হয়। প্রকৃতি বিজ্ঞান ও তার ভিত্তিতে কৃত্রিম প্রজনন ব্যবস্থা অনেক ধরনের নতুন প্রাণী ও উদ্ভিদের সৃষ্টি করতে পারে। গৃহপালিত জন্তুদের ক্ষেত্রে তার অনেক পরীক্ষা হয়েছে। পুরুষ ও নারীদের উন্নতির জন্য বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার প্রয়োগ করলে তাদের শরীর ও মনের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ হতে পারে।

সম্পূর্ণ উৎকর্ষ লাভের দিকে যাবার জন্য নারীদের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে। পুরুষদের ইচ্ছা অনিচ্ছার অপেক্ষা না করেই তারা জ্ঞানবৃদ্ধির ক্ষেত্রেও প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে। যুগের হাওয়া আর প্রকৃতির এই শক্তি—যা কিনা মানুষের সর্ববিধ অগ্রগতির গোড়ার কথা—নারীদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। কোথাও কোথাও নারীরা পুরুষদের সহযোগিতায় সমস্ত বাধাবিঘ্ন সরিয়ে জ্ঞান বিদ্যাবুদ্ধির ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছে। কোনো কোনো দেশে নারীদের উন্নতি অনেক বেশি হয়েছে। সবচাইতে বেশি হয়েছে উত্তর আমেরিকায় ও রাশিয়ায় যে দুটো দেশ রাজনীতিক ও সামাজিক দিক থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত। ইতিমধ্যেই আমেরিকা ও রাশিয়ায় বেশ কিছু মহিলা ডাক্তার আছে, এবং তারা বেশ সুনামের সঙ্গে চিকিৎসার কাজ করছে।* এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, যে সব নারীরা নার্সের কাজ করছে তারা চিকিৎসার ক্ষেত্রে কাজ করার খুবই উপযোগী। তদুপরি মহিলাদের জন্য মহিলা ডাক্তারদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। নানা অসুখ বিসুখে বিশেষ করে যৌন সংক্রান্ত ব্যাপারে ডাক্তারদের কাছে যেতে হয় বলে অনেক সময় তাদের সময়মত চিকিৎসাই হয় না। তার থেকে নারীদেরই যে শুধু ক্ষতি হয় তা নয়, পুরুষদেরও অনেক ক্ষতি হয়। প্রত্যেক ডাক্তারই বলেন যে নারীরা তাদের অসুখের কথা খুলে পরিষ্কার করে বলে না, যার জন্য মারাত্মক ক্ষতি হয়। এটা স্বাভাবিকই। তবুও পুরুষরা, বিশেষতঃ পুরুষ ডাক্তাররা যে নারীদের ডাক্তারী পড়াটা যুক্তিযুক্ত মনে করে না সেটাই সবচেয়ে অযৌক্তিক ব্যাপার।

যে সব দেশে ডাক্তারের সংখ্যা কম, সেখানে নারীদের ডাক্তারী পড়া আরো প্রয়োজন। বুর্জোয়া যুবকরা কষ্ট করে খাটতে চায় না। গত এক বছরের ডাক্তারী ছাত্রের হিসাব থেকে তা দেখা যায়। সে ক্ষেত্রে মেয়েরা প্রতিযোগিতায় নামলে তার ফল ভালই হবে;

এখানেও আমরা যুক্তরাষ্ট্রের ভাল উদাহরণ দেখতে পাই। সেখানে বহু কলেজেই ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে পড়াশুনা করে। আর তার ফল কি হয়?

* Dr. L. Buchner, Die Frau, ihre haturliche Stellung nnd gesellschaft liche Best mung. (Woman, Her Natural Position and Social Desting). Neue Gesellschaft, 1879-80.

মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট বলেছেন : "বিগত কয়েক বৎসর পর্যন্ত ১,৩০০ ছাত্রের মধ্যে একটি তরুণী মেয়েই গ্রীক ভাষায় সবচেয়ে ভাল করেছে। একটি খুব বড় ক্লাসের মধ্যেও গণিতে যে সবচেয়ে ভাল ছাত্র সে হল একটি মেয়ে। প্রকৃতি বিজ্ঞান ও সাধারণ বিজ্ঞানেব সবচেয়ে ভাল ছাত্রের মধ্যেও অনেকেই মেয়ে।" ওহিওর ওয়ারলিন কলেজের ১০০০ হাজারের উপর ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন ক্লাসে পড়ে। সেখানকার প্রেসিডেন্ট ডক্টর কেয়ারশিল্ড বলেছেন : "বিগত আট বৎসর ধরে প্রাচীন ভাষা ল্যাটিন, গ্রীক ও হিব্রু শেখাবার অভিজ্ঞতায় এবং নীতিশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র শেখাবার অভিজ্ঞতায় দেখেছি, এবং বিগত এগার বৎসর ধরে গণিত শাস্ত্র শেখাবার অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে প্রকাশের ভঙ্গি ছাড়া আর কোনো তফাৎ নেই। ডিলাওয়ার কাউন্টি পা'র সোয়ার্থমোর কলেজের প্রেসিডেন্ট এডওয়ার্ড ম্যাচিল, যার বই থেকে প্রামাণিক তথ্য উদ্ধৃত করা হয়ে থাকে—তিনি বলেছেন* যে চার বছরেব অভিজ্ঞতার ফলে তিনি এই সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হয়েছেন যে, ছেলে মেয়ে উভয়কেই একই শিক্ষা দিলে তার থেকে নৈতিক ফল ভাল হয়। যাঁরা মনে করে থাকেন যে ছেলেমেয়েদের একরকম শিক্ষা দিলে নৈতিক অধঃপতন হবে তাঁদের জবাব এর থেকেই দেওয়া যায়। যুক্তিযুক্ত পথে এগোতে হলে জার্মানীকে এখনো অনেক সংস্কার** কাটিয়ে উঠতে হবে।

আর একটা আপত্তি এই ওঠে যে ছেলেমেয়েদেয় একসঙ্গে ডাক্তারী ক্লাসের লেকচার শোনা, অস্ত্রপচারের কাজ করা, সন্তান প্রসব করানোর কাজ করা ঠিক নয়। পুরুষ ছাত্রদের পক্ষে নার্স এবং অন্যান্য নারী রোগীদের সামনে নারী রোগীদের পরীক্ষা কয়ার মধ্যে যদি দোষ না থাকে তবে ছাত্রীদের সামনে তা করার মধ্যে দোষটা কোথায় তা বোঝা মুস্কিল। এবিষয়ে অনেকটা নির্ভর করে কিভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় ও ছাত্র ছাত্রীদের উপর শিক্ষকের কি প্রভাব পড়ে তার উপর।

আবার এও হতে পারে যে, যে সমস্ত মেয়েরা এভাবে একসঙ্গে পড়ছে, তারা উৎসাহিত হয়ে আরো দৃঢ়তার সঙ্গে তাদের পুরুষ সহপাঠীদের ছাড়িয়ে যাবে। যে সব অধ্যাপকরা সহ-শিক্ষার ক্লাসগুলিতে পড়িয়েছেন তাঁরা সে কথাই বলেন। মেয়ে ছাত্রীদের উৎসাহ গড়পড়তা ছেলেদের চেয়ে বেশি। আর শেষ পর্যন্ত মানুষ যদি একথাই মনে করে যে—নারী পুরুষের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক ব্যবধান রাখাই দরকার, তবে অভিজ্ঞ মেয়ে ডাক্তারবাও মেয়েদের পড়াতে পারবেন!

বাস্তবিক পক্ষে অধিকাংশ ডাক্তাররা যে মেয়েদের ডাক্তারী পড়ায় আপত্তি

* An Address upon the Co-Education of Sexes, Philadelphia.

** "Piglail" Zopf : Antiquated (অনুবাদক)

তোলে তার কারণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাঁরা মনে করেন যে মেয়েরা শিখতে আরম্ভ করলে চিকিৎসা শাস্ত্রটাই খেলো হয়ে যাবে, শিক্ষিত লোকের মধ্যে তার মর্যাদা কমে যাবে, কারণ এতদিন পর্যন্ত যে জ্ঞানভাণ্ডারের চাবিকাঠি শুধু উচ্চস্তরের বিদ্বান পুরুষদের কাছেই ছিল তা যদি স্ত্রী বুদ্ধিও বুঝতে পারে তবে সে বিজ্ঞান আর এমন কি জিনিস ?

আসলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি, এবং সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাটাই, যতই যা বলুক না কেন, একেবারেই সংশোধনের বাইরে চলে গেছে। জাতীয় বিদ্যালয়-গুলিতে ছাত্রদের মূল্যবান সময় নষ্ট হয়। তাদের মাথায় এমন সব জিনিস ঢোকানো হয় যাতে তাদের সাধারণ জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানও বাড়ে না। তাদের মাথায় এমন বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয় যা তাদের বাস্তব জীবনে কাজে আসে না, উপরন্তু তাদের উন্নতি ও সাফল্যের পথে বাধার সৃষ্টি করে। আমাদের উচ্চ বিদ্যালয়গুলির অবস্থাও ঠিক তেমনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য কতকগুলি শুষ্ক বাজে জিনিসকে চর্বিত চর্বন করতে হয়, মুখস্ত বিদ্যা দিয়ে আয়ত্ত করা হয়. আর সেজন্য তার শ্রেষ্ঠ সময় ও বুদ্ধিবৃত্তি ব্যয় করতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েও সেই একই পদ্ধতি চলতে থাকে। কতগুলো পুরানো পচা বাড়তি জিনিস তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় যা তাদের কোনো কাজে লাগে না। অধ্যাপকরা অধিকাংশই একই পাণ্ডুলিপি এমনকি তার মধ্যের ইতস্ততঃ ছড়ানো ঠাট্টা তামাসাও বছরের পর বছর পুনরাবৃত্তি করে যায়। অনেক ক্ষেত্রেই উচ্চ শিক্ষা এই রকম গতানুগতিক হয়ে যায় আর তার মধ্যে নতুন কিছু শেখবার থাকে না। তদুপরি বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন সম্বন্ধে গতানুগতিক মনোভাব যা তাতে শিক্ষার কোনো গুরুত্বই দেওয়া হয় না। অনেকে যারা উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে আসে তারাও পরে শিক্ষকের কেতাদুরস্ত নিরস পদ্ধতিতে পৌছিয়ে যায়। পরীক্ষার সময় এসে পড়লে ছাত্ররা মাসকয়েক ধরে তাড়াতাড়ি যান্ত্রিকভাবে মুখস্ত করতে থাকে আর ঠিক পরীক্ষার জন্য যেটুকু শিখতে হবে তাই শেখে। তারপর একটা বড় পোস্টে বা পেশায় ঢুকে পড়তে পারলে এইসব বিদ্বান ব্যক্তিরা সাধারণত খুব যান্ত্রিক ধরনের কর্মী হয়। কিন্তু যদি কোনো অশিক্ষিত ব্যক্তি তাঁদের সম্মান না দেখায় বা তাদের খুব উন্নত স্তরের মানুষ বলে না মনে করে তবে তারা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়। কেবলমাত্র প্রকৃত আগ্রহী ব্যক্তিই পরে বুঝতে পারে যে সে যা শিখেছে তার অনেকখানিই কোনো কাজে আসে না, আর তার যা প্রয়োজন তা সে শেখেনি, এবং তারপরই সে সর্বপ্রথম সঠিক পথে শিখতে শুরু করে। তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় অপ্রয়োজনীয় ক্ষতিকর জিনিস শিখেই কেটে গেছে, তার জীবনের বাকী সময়ে তার সে সব শিক্ষা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, তার যুগের উপযোগী

শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। আর তা ভালভাবে না করতে পারা পর্যন্ত সে সমাজের একজন প্রকৃত যোগ্য মানুষ হতে পারে না। অনেকেই প্রথম স্তর পেরুতে পারে না। কেউ কেউ দ্বিতীয় স্তরেই থেকে যায়। মাত্র অল্প সংখ্যক মানুষই তৃতীয় স্তরে গিয়ে পৌঁছবার শক্তি রাখে।

তবুও যাই হোক শিক্ষাব্যবস্থার এই আজেবাজে অকেজো ঐতিহ্যের ঠাটটা বজায় রাখা হয়। স্কুল কলেজের চত্বরে ছেলেদের সংগে মেয়েদের পড়তে দেওয়া হয় না। তার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজাও তাদের কাছে বন্ধ রাখা হয়। লিপজিগের একজন চিকিৎসা বিদ্যার নামকরা অধ্যাপক তো একজন মহিলাকে বলেই বসলেন ঃ "ডাক্তারী পড়ার জন্য যে সরকারী বিদ্যালয়ে পড়ে আসতে হবে তার কোনো মানে নাই। কিন্তু ডাক্তারীতে ভর্তি করতে হলে আমাদের দেখতে হবে যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের মর্যাদাটা যেন নষ্ট না হয়।"

মানচেনের অধ্যাপক বিশচফ (BISCHOF) মেয়েদের ডাক্তারী পড়তে না দেওয়ার যুক্তি উল্লেখ করে বলেছেন ঃ "ছাত্রদের মধ্যে বর্বরতা রয়েছে"—সত্যিই বেশ জুতসই-যুক্তি। সেই অধ্যাপকের লেখা পুস্তিকার এক জায়গায় আবার দেখা যায় ঃ "যদি কোনো মেয়ে বেশ আকর্ষণীয়, বুদ্ধিমতী ও সুন্দরী হয়, তবে তিনি মাঝে মাঝে তাকে কোনো সরল বিষয়ের ক্লাসের লেকচার শুনতে কেনই বা আসতে না দেবেন?" হের লিবেল (HERR V LYBEL)ও ঐ একই মত পোষণ করে বলেছেন ঃ "কোনো পুরুষ পড়াশুনায় অত্যন্ত মনোযোগী এবং সুন্দরী মেয়েদের প্রতি সহানুভূতিশীল না হয়ে এবং তাদের সাহায্য না করে পারে না।"

এই রকম যুক্তি ও মনোভাবের বিষয়ে মন্তব্য করে সময় নষ্ট করতেও প্রবৃত্তি হয় না। এমন সময় আসবে যখন মানুষ ও-রকম যুবকদের বর্বর মনোভাব নিয়ে বা বৈজ্ঞানিকদের পাণ্ডিত্য ও যৌন কামনা নিয়ে মাথা ঘামাবে না, তারা শুধু যুক্তি ও ন্যায়ের পথই বেছে নেবে।

ইতিমধ্যেই আমরা দেখতে পাই যে ইউরোপের দেশগুলিতে বিশেষ করে জার্মানীতে যেমন গতানুগতিক সংস্থায় ছেয়ে আছে, পূর্ব আমেরিকায় ততটা নাই। যেখানে নারীরা চিকিৎসা শাস্ত্র, আইন, শিক্ষকতার সর্বস্তরেই বেশ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে আমেরিকায় শিক্ষকতার ক্ষেত্রে নারীদের সংখ্যাই বেশি। এবং প্রশাসনিক কাজের মধ্যেও অনেক নারী আছে। রাশিয়াতেও মানুষের মনোভাব জার্মানীর চেয়ে অনেক উদার ও উন্নত।* রাশিয়ার অনেক

* অবশেষে বার্লিনেও বরফ গলেছে। ১৯৮৩ সালের বসন্তকালে সেখানে পাঁচজন মহিলা চিকিৎসক সাফল্যের সঙ্গে কাজ করেছেন। এ খবর শুনে জার্মান পণ্ডিতেরা শঙ্কিত হয়ে ওঠেন।

নারীই বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় সাফল্য লাভ করেছে। ১৮৭৮ সালের বসন্তে বার্ণে একটি রাশিয়ার ছাত্রী, টুলুর ফ্রাও লিটুইনভ পরীক্ষায় এত ভাল ফল করেছিল—বিশেষ করে—যে দর্শন ফ্যাকাল্টির সম্ভাব্য সর্বসম্মতিক্রমে তাকে সবচেয়ে বেশি নম্বর দিয়ে ডক্টর উপাধিতে ভূষিত করেছিল, ভ্রূ সুসলোভার বেলাতেও ঠিক সেই রকমই দেখা গিয়েছিল। সে জুরিখে ডাক্তারী পড়েছিল, এবং অনেক বৎসর ধরেই এখন সেণ্ট পিটার্সবার্গে ডাক্তারী করছে। ভিয়েনার অধ্যাপক রকিটানস্কি (Rokitansky) হলেন একজন বিখ্যাত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ। নারী মুক্তির বিষয়ে তাঁর কোনো পক্ষপাতিত্ব আছে বলে কেউই বলতে পারবে না। তিনিও এই মহিলার বিষয়ে আন্তরিক প্রশংসার সংগে বলেছেন ঃ "এই মহিলা ডাক্তারটি যখন অস্ত্রোপচারের কাজ করে তখন দেখে খুবই আনন্দ হয়।" নারীদের কাজকে পুরুষরা যে কি সমালোচনার চোখে দেখে—বিশেষ করে তাদের সংগে প্রতিযোগিতায় নামলে—তা যারা জানেন, এই মন্তব্য শুনে তারা লাভবান হবেন।

কালেভদ্রে যে কয়েকটি প্রশাসনিক পদে জার্মান সরকার মেয়েদের নিয়োগ করেছে, সেখানে তাদের শোষণ করার জন্যই তা করেছে। সেখানে তারা পুরুষদের সমান একই কাজের জন্য অনেক কম বেতন পেয়ে থাকে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে পুরুষদের সংগে যখন কাজের জন্য মেয়েদের প্রতিযোগিতায় নামতে হচ্ছে, তখন পুরুষরাই যেন তাদের শত্রু হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এইভাবে পরস্পরের মধ্যে বিরোধ বেধে যাচ্ছে। তদুপরি আমাদের সৈন্যবিভাগের এমন নিয়ম প্রতি-বছর বহু সৈনিক ও সেনাবাহিনীর অফিসার অবসর গ্রহণ করে বসে প্রশাসনিক কাজে যোগ দেয়, যার ফলে অন্যদের জন্য কাজের সুযোগই থাকে না। সুতরাং যে মেয়েদের সরকারী কাজ দেওয়া হয় তাদেরও তাড়াতাড়ি ছাড়িয়ে দেওয়া হয়। তদুপরি একথা অস্বীকার করা যায় না যে সরকারী বা বেসরকারী উভয় কার্য-ক্ষেত্রেই নারীদের উপর যে অত্যধিক কাজের ভার চাপান হয় তাতে তাদের খুবই কষ্ট হয়। বিশেষ করে যে সব নারীদের আবার বাড়িতে ঘরকন্নার কাজ করতে হয় তাদের পক্ষে খুবই কষ্টকর। বর্তমানে আমাদের ঘরসংসারের কাজকর্মের ধরন ধারণ যে রকম আছে তাতে—জীবনের তাগিদে যে লক্ষ লক্ষ নারীরা কর্ম-ক্ষেত্রে এগিয়ে যাবে তার পথে বাধা সৃষ্টি করে। ঠিক যেন আমাদের সমস্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

শত অবহেলা সত্ত্বেও নারীরা যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে এবং দিচ্ছে, এবং অনেক ক্ষেত্রেই পুরুষদের সংগে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হচ্ছে। নারীদের মধ্যে অনেক প্রথম সারির লেখিকা ও শিল্পী হয়েছে, এবং অনেক পেশাতেই প্রতিনিধিত্ব করতে পারছে। তার থেকেই প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের উপযুক্ত

জবাব পাওয়া যায়, আর বলা বাহুল্য যে অল্পদিনের মধ্যেই নারীর সমান অধিকার স্বীকার করে নিতেই হবে কিন্তু আবার একথাও একেবারেই সঠিক যে বর্তমান সমাজব্যবস্থায় নারী বা পুরুষ কেউই তার লক্ষ্যে পেঁছিতে পারবে না। উচ্চপদের জন্য বহুলোকই চেষ্টা করে, কিন্তু খুব অল্প লোকই তা পায়। কল-কারখানাগুলির ব্যাপারেও ঠিক তেমনিই হয়, কর্মপ্রার্থীদের সংখ্যা যত বাড়তে থাকে, তত তাদের মজুরি কমে যায়, প্রতিযোগিতার ঠেলায় তাদের শ্রমের দাম কমে আসে। আমি একজনের কথা জানি, যেখানে একটি সরকারী স্কুলে সব-চেয়ে উচ্চপদে একজন পুরুষ শিক্ষকদের জায়গায় একজন মহিলাকে নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তার জন্য তাকে তার অর্ধেক মাইনে দেওয়া হয়েছিল। এ একটা নির্লজ্জ ব্যবস্থা। কিন্তু মধ্যবিত্তদের মধ্যে এ রকম নীতি চলে আসছে। আর অবস্থার চাপে পড়ে সে রকম নীতি গ্রহণ করেও নেওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে বিন্দু-মাত্র সন্দেহ নাই যে সব রকম পেশায় কাজ করার সুযোগ পেলেই নারী বা পুরুষ কারো পক্ষে তা এই জঘন্য সামাজিক অবস্থা থেকে মুক্তি এনে দেয় না। আমাদের আরো এগিয়ে যেতে হবে।

নারীর আইনগত অধিকার ও রাজনৈতিক সম্পর্ক

যখনই কোনো স্তরের বা কোনো শ্রেণীর মানুষ পরাধীন বা অবনত অবস্থায় থাকে, তখনই সে দেশের আইন-কানুনের মধ্যে তাদের সে অবস্থার প্রতিফলন দেখা যায়। সব দেশের সামাজিক অবস্থা আইনের মধ্যে একসঙ্গে দেখা যায়, আইনের মধ্যে আয়নার মতো সামাজিক অবস্থা ধরা পড়ে। নারীজাতি সমাজে পরাধীন ও পদানত অবস্থায় থাকে। তাদের বেলাতেও আইনের এই নিয়ম চলে। আইন ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় প্রকারেরই আছে। নেতিবাচক এই দিক থেকে যে পরাধীন শ্রেণীকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। আর ইতিবাচক এই দিক থেকে যে বা যারা পরাধীন তাদের হেয় অবস্থাকেই আইনের দ্বারা চালু রাখা হয়।

আমাদের সাধারণ আইনগুলি রোমান আইনের ভিত্তিতে রচিত। আর রোমান আইনে শুধু পুরুষকেই সম্পত্তির অধিকারী বলে স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু, আবার পুরাতন জার্মান আইনে যখন পুরুষদের বেলাতেও আরো উদার মনোভাব দেখিয়েছে, এবং নারীদের প্রতিও সম্মান দেখিয়েছে* তার উপরও এর প্রভাব পড়ছে। কিন্তু সমস্ত রোমান দেশগুলিতেই রোমান আইনের ধারণা, বিশেষত নারীদের প্রতি তার মনোভাব, আজও পর্যন্ত চলে আসছে। এটা কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয় যে ফরাসী ভাষায় মনুষ্যজাতির জন্য শুধু পুরুষ বা 'লা হোম' (L' homme) শব্দটিই আছে। রোমেই ঠিক সেই অবস্থা। তাদের মধ্যে আছে রোমান নাগরিক ও রোমান নাগরিকদের স্ত্রীরা, নারীদের জন্য কোনো নাম (Citoyennes) নাই।

জার্মানীর আইনের বিভিন্ন দিক দিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে লাভ নেই। কয়েকটি উদাহরণই যথেষ্ট।

জার্মানীর সাধারণ আইন অনুসারে নারীরা সর্বত্রই পুরুষের তুলনায় ছোট, নারীর কাছে স্বামী হল প্রভু ও কর্তা। বিবাহের সময় থেকেই স্ত্রীকে স্বামীর বাধ্য হয়ে থাকতে হবে। স্ত্রী অবাধ্য হলে প্রুশিয়ার আইন অনুযায়ী স্বামীরা তাদের দৈহিক শাস্তি দিতে পারে। তাদের ইচ্ছামতো স্ত্রীদের মারধোর করতে

* প্রাচীনকালে ট্যাসিটাসের (Tacitus) সময়ে এমন সব গোষ্ঠী ছিল যাদের প্রধান ছি' নারীরা। রোমানরা যাকে খুবই অস্বাভাবিক মনে করে।

পারে। হামবার্গের সাম্প্রদায়িক আইন বলে ঃ "স্ত্রীর প্রতি স্বামীর, সন্তানের প্রতি মা বাপের, ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের, ভৃত্যের প্রতি প্রভুর সাধারণ দৈহিক শাস্তি বিধান করার অধিকার আছে এবং তা ন্যায্য।"

জার্মানীর বহু জায়গায় এই ধরনের আইন প্রচলিত আছে। প্রুশিয়ার সাধারণ আইনে আরো বলেছে যে স্ত্রী কতক্ষণ পর্যন্ত তার শিশুকে স্তন্য পান করাতে পারবে তাও ঠিক করে দেবার অধিকার তার স্বামীর আছে। সন্তান সম্বন্ধে সমস্ত সিদ্ধান্তই নেবার অধিকার শুধু পিতারই আছে। স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকে তার সন্তানদের অভিভাবকের জন্য সর্বত্র ছুটতে হবে, আইনের কবলে স্ত্রী অপ্রাপ্ত বয়স্কর সমান। সন্তানদের শিক্ষা ব্যবস্থা করার পক্ষে অযোগ্য ধরা হবে, এমনকি যদি সেই সন্তানদের শিক্ষা তারই সম্পত্তি বা পরিশ্রমের থেকেই চলে তবুও তাকে সে অধিকার দেওয়া হবে না। তার সম্পত্তির ভারও তার স্বামীর উপর। আর বিবাহের পূর্বে যদি বিশেষ কোনো সর্ত না থাকে তবে সম্পত্তির বিষয়ে দেউলিয়া হয়ে গেলে অধিকাংশ রাষ্ট্রেই তা তার স্বামীর ভাগেই পড়বে। জ্যেষ্ঠ সন্তানের ভাগে যদি জমি পড়ে, আর সে যদি মেয়ে হয়, তবে তার স্বামী বা ভাইয়েরা থাকলে তা পাবার অধিকার তার থাকবে না। যদি কোনো ভাই না থাকে বা ভাইদের মৃত্যু হয়ে যায় তবেই নারী সম্পত্তির অধিকার পেতে পারে। নারী কোনো রাজনৈতিক অধিকার ব্যবহার করতে পারবে না, কারণ রাজনৈতিক অধিকারগুলি সব সম্পত্তির সংগে যুক্ত করা আছে। মাত্র কয়েকটি বিশেষ জায়গায়ই নারী রাজনৈতিক অধিকার পেয়ে থাকে, যেমন স্যাকসনিতে নিয়ম আছে যে নারী ভোট দিতে পারবে, কিন্তু তার নির্বাচিত হবার অধিকার নাই। কিন্তু সে অধিকারও নারীর বিবাহ হলে তার স্বামীর উপর চলে যাবে। বেশির ভাগ রাষ্ট্রেই স্বামীর অনুমতি ছাড়া নারী কোনো চুক্তিবদ্ধ হতে পারবে না, অবশ্য যদি সে নিজেই কোনো ব্যবস্থা করে থাকে, যে অধিকার কিনা তাকে সাম্প্রতিক আইনে দেওয়া হয়েছে, তাহলে পারবে। নারীর কোনো বাইরের কাজ করার অধিকার নাই। প্রুশিয়ার সামাজিক আইন অনুসারে স্কুলের ছাত্ররা, ১৮ বছরের কম বয়সের শিক্ষানবীশরা এবং নারীরা কোনো রাজনৈতিক সংগঠনে যোগ দিতে পারবে না বা প্রকাশ্য জনসভায় যোগ দিতে পারবে না। বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যেই বিভিন্ন জার্মান বিধি অনুযায়ী নারীদের প্রকাশ্য আদালতে শ্রোতা হিসাবে যাওয়াও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কোনো নারী যদি অবৈধভাবে অন্তঃসত্ত্বা হয়, আর তার প্রণয়ীর কাছ থেকে যদি কোনো উপহার স্বেচ্ছায় নিয়ে থাকে, তবে তার ভরণ-পোষণেরও কোনো দাবি থাকে না। বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেলেও নারীকে চিরকাল ধরে তার পূর্বের স্বামীর নামই বহন করে চলতে হবে যদি না সে আবার বিবাহ করে।

এই উদাহরণগুলিই যথেষ্ট। ফ্রান্সে নারীদের অবস্থা আরো খারাপ। আমরা আগেই দেখেছি অবৈধ সন্তানের পিতৃত্বের প্রশ্নটি কি ভাবে দেখা হয়ে থাকে। ঐ একই নীতি অনুসারে বিবাহ বিচ্ছেদের বিষয়টি দেখা হয়ে থাকে। পুরুষের দুর্নীতি একেবারে চরম অবস্থায় না পৌঁছলে নারীর পক্ষে বিবাহ বিচ্ছেদ সম্ভব নয়। কিন্তু পুরুষ ইচ্ছা করলে তক্ষুনি বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারে। স্পেন, পর্তুগাল ও ইটালীতেই ঠিক এই অবস্থা।

সিভিল কোডের ২১৫ ধারা অনুযায়ী নারীদের যদি আদালতে মামলাও থাকে তবুও তারা দু'জন নিকট আত্মীয়ের অনুমতি ছাড়া প্রকাশ্য আদালতে হাজির হতে পারবে না। আর ২১৩ ধারা অনুসারে স্বামীর কর্তব্য স্ত্রীকে রক্ষণাবেক্ষণ করা, আর স্ত্রীর কর্তব্য স্বামীর প্রতি অনুগত থাকা। সম্পত্তির বিধি ব্যবস্থা করা স্বামীর কাজ। এই রকমই সব নিয়ম রয়েছে। ঠিক একই ধরনের নিয়মকানুন ফরাসী অধিকৃত সুইজারল্যাণ্ডে রয়েছে, যেমন ভড-এর ক্যান্টনে। ফ্রান্সে নারীদের নেপোলিয়ন কি চোখে দেখতেন সে বিষয়ে একটা প্রচলিত প্রবাদবাক্য আছে যে, "ফ্রান্সে একটি জিনিস চলবে না, সে হল এই যে এখানে কোনো নারী তার যেমন ইচ্ছা চলতে পারবে না।"*

ইংল্যাণ্ডে নারীদের নিজেদের উদ্যোগেই জনসাধারণের মধ্যে ও পার্লামেন্টের মধ্যে জোর আন্দোলনের ফলে ১৮৮২ সালের আগস্ট মাস থেকে তাদের আইনগত অধিকারের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। তার পূর্ব পর্যন্ত ইংলণ্ডের নারীরা তাদের স্বামীদের ক্রীতদাসীর অবস্থায়ই ছিল। স্বামী ইচ্ছা করলে স্ত্রীকে বা তার সম্পত্তিকে বেচেও দিতে পারত। স্ত্রীর অবস্থা বরাবরই অপ্রাপ্ত বয়স্কদের পর্যায়ে ছিল; স্বামীর সামনে স্ত্রী কোনো অপরাধ করলেও তার জন্য স্বামীই দায়ী হত। স্ত্রী যদি কোনো তৃতীয় ব্যক্তিকে জখম করত তবে তা গৃহপালিত পশুর আক্রমণের সমান ধরা হত, তার জন্য স্বামীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হত। ১৮৮২ সালের আগস্ট মাসের আইন অনুযায়ী নারীরা পুরুষদের সমান নাগরিক অধিকার ভোগ করতে পারে।

ইউরোপের সমস্ত রাষ্ট্রের মধ্যে রাশিয়াতেই নারীদের অবস্থা সবচেয়ে স্বাধীন। যুক্তরাষ্ট্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীরা লড়াই করে সমান নাগরিক অধিকার আদায় করেছে। তারা আরও পতিতাবৃত্তির বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের ছোঁয়াচে ব্যাধি আইন ও অনুরূপ আইন প্রবর্তনে বাধা দিয়েছে। নারীদের মধ্যে যারা আলোকপ্রাপ্ত হয়েছে তারা নারী-পুরুষের মধ্যেকার দুস্তর অসাম্যের বিরুদ্ধে আইনের ন্যায্য অধিকার অনুযায়ী রাজনৈতিক অধিকারের দাবি করেছে। ঠিক একই নীতি অনুযায়ী

* Bridei : Puissance Marital (Morital Power).

শ্রমিকশ্রেণীও তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা পাবার জন্য চেষ্টা করেছে। শ্রমজীবী পুরুষদের জন্য যে অধিকার পাওয়া উচিত নারীদের জন্য তা অনুচিত হতে পারে না। যারা নিপীড়িত তাদের স্বাধীনতা পাবার জন্য প্রতিটি সুযোগেরই সদ্ব্যবহার করা দরকার। আর তাতে স্বভাবতই প্রতিক্রিয়াশীলদের টনক নড়ে ওঠে। দেখা যাক তাদের আশঙ্কার কারণ কতটা ঠিক।

১৭৮৯ সালে পুরাতন শৃঙ্খল চূর্ণ করে নতুন যুক্ত ভাবধারার প্রবর্তনের জন্য সারা বিশ্বের মধ্যে যে অভূতপূর্ব মহান ফরাসী বিপ্লব শুরু হয়েছিল, তার মধ্যে নারীরাও এগিয়ে এসেছিল। বিপ্লব শুরু হবার পূর্বে দুই দশক পর্যন্ত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যে সংগ্রাম ফরাসী সমাজকে আলোড়িত করে তুলেছিল তার মধ্যে অনেক নারী সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল। তারা দলে দলে বৈজ্ঞানিক আলোচনায় যোগ দিয়েছে, বৈজ্ঞানিক ও রাজনৈতিক ক্লাবগুলিতে যোগ দিয়েছে, সেই চিন্তাধারাকে কাজে পরিণত করার জন্য বিপ্লবের প্রস্তুতির কাজে অংশ গ্রহণ করেছে। কিন্তু ঐতিহাসিকরা অধিকাংশই সে সব ঘটনা বিকৃত করে লিখেছে, জনগণের পরাজয়কে দেখাবার জন্য, তাদের প্রতি ঘৃণা উদ্রেক করার জন্য, আর শাসকশ্রেণীর অপরাধকে লঘু করে দেখাবার জন্যই তারা তা করেছে। অপরপক্ষে এই সব ঐতিহাসিকরা এই সময়কার নারীদের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা এড়িয়ে গেছে বা সে সম্বন্ধে নীরব থেকেছে। বিজেতারাই যখন তাদের বিজয়ের কাহিনী লিখেছে তখন তারা এই রকমই করেছে। কিন্তু সময়ের পরিবর্তন আসবেই।

১৭৮৯ সালের অক্টোবর মাসেই নারীরা জাতীয় পরিষদ (National Assembly) এর কাছে আবেদন করেছে "নারী পুরুষের সমান অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য, নারীদের শ্রমের ও কাজের অধিকারের জন্য ও তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মে নিয়োগের জন্য"। নারী পুরুষের সমান অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবির থেকে মনে হতে পারে যে পূর্বে সেই সমান অধিকার ছিল ধরে নেওয়া যেতে পারে। সে ধারণা যে ভুল, অতীতেই ইতিহাস থেকে মানুষ তাই জানত। ইতিহাসের জ্ঞান বা সমাজ বিকাশের ধারার কথা ছাড়াই লোকে বিশ্বাস করতে ভালবাসত যে মানুষ এখনকার চেয়ে আগে অনেক স্বাধীন ও সুখী ছিল। এখনো অনেকের মধ্যে সেই ধারণা আছে। অনেক প্রভাবশালী লেখক, বিশেষত রুশো সে বিষয় লিখেছেন। তার ফলে সমস্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেই অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রশ্নটি আসে, এবং প্রগতিশীল ফরাসী লেখকদের রচনার মধ্যেও তা অনেক সময়ই দেখা যায়।

১৭৯৩ সালের 'কনভেনশন' যখন 'মানুষের অধিকার' ঘোষণা করল, নারীদের মধ্যে যারা বুঝতে পারত তারা দেখল যে তার মধ্যে নারীর অধিকারের

কথা নেই। সুতরাং অলিম্পে ডি গজ্জে (Olympe de Gouges), লুই ল্যাকম্বে (Louise Lacombe) এবং অন্যান্যরা সপ্তদশ ধারায় "নারীর অধিকার" যুক্ত করলেন এবং ১৭৯৩-তে ২৮ ব্রুমায়ার (28th Brumaire) ২০শে নভেম্বর এই যুক্তি দেখালেন যে ঃ "নারীদের যদি ফাঁসিকাষ্ঠে উঠবার অধিকার থাকে তবে তাদের মঞ্চে উঠবারও অধিকার নিশ্চয়ই আছে"। আর যখন ইউরোপের প্রতিক্রিয়াশীল আক্রমণের মুখে সেই কনভেনশন থেকে ঘোষণা করা হল যে "পিতৃভূমি বিপদাপন্ন", এবং দেশ ও রিপাবলিক রক্ষা করবার জন্য সকলকে অস্ত্র ধরবার আহ্বান জানাল, তখন প্যারিশিয়ান নারীরা তার জন্য প্রস্তুত হয়ে ছিল। বিশ বছর পর প্রুশিয়ার উৎসাহী নারীরা তাদের দেশ রক্ষা করবার জন্য নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে ঠিক সেই ভাবেই অস্ত্র ধরেছিল। র‍্যাডিকাল কউমিটি (Radical chaumete) তাদের বাধা দিয়ে বলেছিল ঃ "নারীরা আবার কবে থেকে তাদের নারীত্ব বিসর্জন দিয়ে পুরুষ হয়ে গেছে? কতদিন থেকে তারা তাদের গৃহকর্মের পবিত্র কাজ, সন্তান পালনের কাজ ছেড়ে প্রকাশ্য জায়গায় এসে জড় হতে লেগেছে, বক্তৃতা দিতে শুরু করেছে, সৈন্য বাহিনীতে যোগ দিতে লেগেছে, এক কথায় প্রকৃতি যে সব কাজ শুধু পুরুষদের উপরই ন্যাস্ত করেছে, নারীরা সেই সব করতে শুরু করেছে। প্রকৃতি পুরুষকে নির্দেশ দিয়েছে 'তুমি পুরুষ, ছুটোছুটি করা, শিকার করা, কৃষি, রাজনীতি, প্রভৃতি সমস্ত কাজ করার অধিকার শুধু তোমারই আছে।' আর নারীকে প্রকৃতি নির্দেশ দিয়েছে ঃ 'তুমি নারী। সন্তান পালন করা, সংসারের সব খুঁটি-নাটি কাজ করা, মাতৃত্বের মধুর কষ্ট সহ্য করা, এই সব তোমার কাজ।' মূর্খ নারীরা, তোমরা পুরুষের মতো হতে যাবে কেন? উভয়ের মধ্যে কি দুস্তর প্রভেদ নেই? প্রকৃতি তোমাদের যেমন বানিয়েছে, তেমনিই থাক। আর আমাদের ঝঞ্চা সংকুল জীবনকে ঈর্ষা না করে, আমরা যাতে পারিবারিক জীবনে তোমাদের সেবা যত্নে লালিত সুখী সন্তানদের মধুর দৃশ্য দেখে আমাদের চোখ জুড়াতে পারি, জীবনের ঝড়ঝঞ্চা ভুলে যেতে পারি তার জন্য কাজ করে নিজেরা সন্তুষ্ট থাক।"

নারীরা সে কথা মেনে নিল। সন্দেহ নাই যে 'র‍্যাডিকাল কউমিটি (Radical chaumete) যা বলেছে তা তখনকার দিনে অনেকেরই মনোভাব প্রকাশ করেছে এবং তারাও নারীদের জন্য এছাড়া অন্য কোনো রকম ব্যবস্থার কথা ভাবতেই শিউরে ওঠে। আমিও মনে করি যে এ এক রকম সুবিধাজনক কার্য-বিভাগ যে পুরুষরা বাইরের ক্ষেত্রে গিয়ে দেশ রক্ষার কাজ করবে এবং নারীরা ঘর সংসার দেখাশোনা করবে। রাশিয়ায় কোনো কোনো গ্রামে এই ধারাই প্রচলিত আছে যে হেমন্তের চাষ আবাদের কাজ হয়ে গেলেই সেখানকার পুরুষরা সবাই

শহরের কলকারখানায় চলে যেত, আর গ্রামের প্রশাসনের কাজ ও ঘরসংসারের কাজ সব নারীরা করত। তাছাড়া কমিউটির মতবাদ আজকালকার আধুনিক পরিবারে চলে না। কৃষি শ্রমের ব্যাপারেও তার মন্তব্য ঠিক নয়। সেই আদিম কালের থেকে আজো পর্যন্ত কৃষিক্ষেত্রেও নারীদের ভাগে কিছু সহজ কাজ পড়েনি। আর যদি শিকার, দৌড়, রাজনীতি এ সব আলোচনা করা যায় তবে দেখা যাবে যে প্রথম দুটি ক্ষেত্রে পুরুষদেরই বেশি ঝোঁক, আর রাজনীতির ক্ষেত্রে যারা চলতি স্রোতের বিরুদ্ধে যায় তাদের বেলাতেই বিপদ আছে, আর বাকীদের বেলায় রাজনীতির কাজে যেমন পরিশ্রম আছে, তেমনি আনন্দও আছে। তাই এ বক্তৃতা থেকে পুরুষদের আত্মম্ভরিকতাই প্রকাশ পায়। কিন্তু এ যে বহুপূর্বে ১৭৯৩ সালে তিনি এ বক্তৃতা করেছিলেন তাই তাকে ক্ষমা করা যেতে পারে।

এখন অনেক পরিবর্তন হয়েছে। পরিস্থিতি অনেক বদলে গেছে, আর সংগে সংগে নারীদের অবস্থারও পরিবর্তন হয়েছে। নারীরা বিবাহিত হোক বা অবিবাহিতই হোক পূর্বের যে কোনো সময়ের থেকে তারা বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার সংগে অনেক বেশি জড়িত হয়ে থাকে। রাষ্ট্র থেকে কি রকম সৈন্যবাহিনী মজুত রাখা হচ্ছে, সরকারী নীতি যুদ্ধ না শান্তির দিকে যাচ্ছে, কিভাবে কর বাড়ানো হচ্ছে, পরোক্ষ কর বাড়ানোর ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়ে যাচ্ছে কিনা ও তার দরুন পারিবারিক জীবনে কতদূর কষ্ট হচ্ছে—এ রকম কোনো বিষয়ের প্রতিই নারীরা উদাসীন থাকতে পারে না। শিক্ষা ব্যবস্থার বিষয়েও নারীরা আগ্রহী আর সে শুধু নারীরা যাতে শিক্ষালাভ করতে পারে সেজন্যই নয়। সন্তানের মা হিসাবে এখানে তাদের দ্বিগুণ দায়িত্ব রয়েছে।

আমরা আরও দেখতে পাব যে লক্ষ লক্ষ নারী বহু শিল্পের বিভিন্ন শাখায় কর্মে নিযুক্ত আছে। সেইসব নারীরা তাদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে সামাজিক আইন-কানুনের সুযোগ সুবিধার বিষয়ে আগ্রহী। প্রতিদিনের কাজের ঘণ্টা, রবিবারের ছুটি, শিশুদের কাজকর্মে নিয়োগ, মজুরি ব্যবস্থা, নোটিশের সময়, শ্রমিকশ্রেণীর জন্য 'ক্যারেকটার-বুক' এর প্রবর্তন করা, কারখানার নিরাপত্তা ব্যবস্থা, ওয়ার্কশপের অবস্থা, এই রকম সমস্ত বিষয় সংক্রান্ত আইন কানুনের ব্যাপারেই পুরুষদের মতো নারীরাও আগ্রহী। অনেক শিল্পের যে সব শাখাগুলিতে শুধু নারী শ্রমিকরাই নিযুক্ত আছে সেখানকার অবস্থা সম্বন্ধে পুরুষ শ্রমিকরা বিশেষ কিছুই জানে না, মালিকরা নিজেদের স্বার্থেই তাদের নিজেদের দোষ ঢেকে রাখবার জন্য সে সব গোপন করে রাখে। যে সব জায়গায় নারীরা কাজ করে, সে সব জায়গায় কারখানা পরিদর্শনের ভাল ব্যবস্থাই নেই। অথচ সেই সব জায়গায়ই নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। পাঠকদের শুধু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে আমাদের বড় বড় শহরগুলিতে কি অবস্থার

মধ্যে নারীরা দরজীর কাজ, পোশাক তৈরি, টুপি তৈরির কাজ ইত্যাদি করে থাকে। কিন্তু তাদের কাছ থেকে কোনো অভিযোগও আসে না, আর তাদের অবস্থারও কেউ তদন্ত করে দেখে না। সে বিষয়ে এখন পর্যন্ত কিছুই করা হয়নি। পরিশেষে যে সব নারীরা ব্যবসায়ের কাজে নিযুক্ত আছে, তারা বাণিজ্য সংক্রান্ত আইন কানুন সম্বন্ধেও আগ্রহী। আইন কানুন সম্বন্ধে নারীদের আশ্রয় থাকা যে খুবই প্রয়োজন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তদুপরি বাইরের জীবনের সংগে যুক্ত হলে নারীদের মধ্যে উৎসাহের সৃষ্টি হবে এবং তাদের জন্য নতুন নতুন পথও খুলে যাবে।

এর উত্তরে চট করে প্রতিবাদ আসে: "নারীরা রাজনীতির কিছুই বোঝে না। আর সাধারণভাবে তারা সে সব নিয়ে মাথা ঘামাতেও চায় না। ভোট দেবার অধিকার পেলেও তারা তার ঠিক মতো ব্যবহার করতে পারবে না।" একথা সত্যিও, আবার সত্যি নয়ও। একথা অস্বীকার করা যাবে না যে জার্মানীর অতি অল্প সংখ্যক নারীই নারীদের জন্য পুরুষের সমান অধিকার দাবি করেছে। লেখিকাদের মধ্যে মাত্র একজনের হেলউইগ ডম (Frau Helwig Dohm) এর নাম আমি জানি, যে এ বিষয়ে এগিয়ে এসেছে, তার অনেকেই পেছিয়ে পড়ে আছে।

কিন্তু নারীরা এতদিন রাজনীতিতে বিশেষ উৎসাহ দেখায়নি—এ যুক্তি থেকে আমরা কোনো সিদ্ধান্তেই আসতে পারি না। নারীরা কতদিন পর্যন্ত বাইরের কাজ নিয়ে মাথা ঘামায়নি বলে তাদের মাথা ঘামানো উচিতই নয় তা বলা যায় না। পুরুষরাও তো একসময় তেমনিই ছিল। নারীদের ভোটাধিকার দেওয়া উচিত না বলে যে যুক্তি এখন দেওয়া হয়, ঠিক সেই যুক্তি দিয়েই এক সময় বলা হয়েছিল যে জার্মানীতে সমস্ত প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষদের ভোটাধিকার দেওয়া উচিত নয়। ১৮৬৭ সালে তাদের ভোটাধিকার দেবার পর এক ধাক্কাতেই সব ওজর আপত্তি উড়ে গেল। ১৮৬৩ সালে যারা সর্বজনীন ভোটাধিকারের বিরুদ্ধে বলেছিল আমিও তাদের মধ্যে একজন ছিলাম। কিন্তু চার বছর পরে সেই সর্বজনীন ভোটাধিকারের জন্যই আমি পার্লামেন্টে নির্বাচিত হতে পেরেছি। হাজার হাজার মানুষের ক্ষেত্রেই এ রকম হয়েছে। 'সল' পরিণত হয়েছে 'পল'এ। যদিও এখনো বহুসংখ্যক লোক আছে যারা তাদের এই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অধিকারকে অবহেলা করে, অথবা তার গুরুত্ব বোঝেই না। কিন্তু তাই বলে যে তাদের ভোটের অধিকার কেড়ে নেওয়া উচিত সেকথা কেউই বলবে না। জার্মানীর রাইখস্ট্যাগের নির্বাচনের সময় সাধারণত শতকরা ৪০ ভাগ লোক ভোট দেয় না, আর এই যারা ভোট দেয় না তারা সব শ্রেণীর মধ্যেই আছে। তাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ও কারিগররাও আছে। আর বাকি যে শতকরা ৬০ জন ভোট

দেয়, তাদের মধ্যেও অধিকাংশ নানা মুনির নানা মত শুনে ভোট দেয়, যা তাদের মোটেই করা উচিত না। তারা তাদের নিজেদের প্রকৃত স্বার্থের কথা বোঝে না। তাদের রাজনৈতিক শিক্ষা নাই বলেই তা বোঝে না। তবুও যে ৪০ ভাগ লোক একেবারেই ভোটদান থেকে বিরত থাকে তাদের চেয়ে যে ৬০ ভাগ লোক ভোট দেয় তাদের রাজনৈতিক শিক্ষা বেশি আছে। অবশ্য এর মধ্যে যারা নিজেদের বিশ্বাস অনুযায়ী ভোট দিতে গেলেই বিপদে পড়বে জেনে স্বেচ্ছায় ভোটদান থেকে বিরত থাকেন তাদের কথা স্বতন্ত্র।

কিন্তু জনগণকে রাজনীতি থেকে দূরে ঠেলে রেখে তাদের রাজনৈতিক শিক্ষা দেওয়া যায় না। রাজনৈতিক অধিকার কাজে লাগানোর মধ্য দিয়েই তাদের রাজনৈতিক শিক্ষা হয়ে থাকে। কাজের মধ্য দিয়েই উৎকর্ষে পেঁছানো যায়। এতদিন পর্যন্ত শাসকশ্রেণী তাদের নিজেদের স্বার্থের জন্যই অধিকাংশ জনগণকে রাজনৈতিক বিষয়ে অজ্ঞ রাখতে চেষ্টা করে এসেছে, এবং তারা তাদের সে প্রচেষ্টায় সফলও হয়েছে, সুতরাং এতদিন পর্যন্ত যে অল্পসংখ্যক লোক সুযোগ সুবিধা পেয়েছে বা ব্যক্তিগতভাবেও যোগ্যতার অধিকারী তারাই সকলের জন্য সর্ব শক্তি দিয়ে লড়াই করে এগিয়ে এসেছে, এবং ক্রমশঃ অনগ্রসর জনসাধারণের জাগরণ দেখা দিয়েছে ও তারা এগিয়ে গেছে। সমস্ত বড় বড় আন্দোলনের ইতিহাসই এইরূপ। সর্বহারাদের মধ্যে এবং নারীদের মধ্যেও অনেকে পেছিয়ে থাকলে তাতে অবাক হবারও কিছু নেই আর হতাশ হবারও কিছু নেই। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকেই দেখা যায় যে দুঃখ কর্ম সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়েই ভবিষ্যতে বিজয় সুনিশ্চিত হয়ে থাকে।

নারীরা যখনই তাদের রাজনৈতিক অধিকার পাবে তখনই তারা তাদের রাজনৈতিক কর্তব্য সম্বন্ধেও সচেতন হয়ে উঠবে। যখন তাদের ভোট দিতে বলা হবে, তখনই তারা জিজ্ঞাসা করবে "কেন ভোট দেব, এবং কাকে ভোট দেব?" স্বামী স্ত্রী উভয়েরই এই একই স্বার্থের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলবে, এবং তাতে দাম্পত্য জীবনের ক্ষতি না হয়ে উন্নতিই হবে। পেছিয়ে পড়া স্ত্রী তখন তার স্বামীর কাছে খবরাখবর জানতে চাইবে। তার থেকে পরস্পরের মধ্যে ভাবনা চিন্তার বিনিময় হবে, দুজনে দুজনের কাছ থেকে শিখতে পারবে—যা কিনা এতদিন পর্যন্ত স্বামী স্ত্রীর মধ্যে খুবই কম দেখা গেছে। এর থেকে নারীদের জীবনে একটা নতুন প্রেরণা আসবে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষা জ্ঞান-বুদ্ধির তারতম্য থাকার জন্যে যে ঝগড়াঝাঁটি হয়ে থাকে, ও তার দরুন স্বামীরও কর্তব্য কাজের অনেক ক্ষতি হয়ে থাকে, সমাজের পক্ষেও ক্ষতিকর হয়ে থাকে, সে সবও এর ফলে কমে আসবে। স্বামী তখন দেখবে যে স্ত্রী তার পদে পদে বাধা না হয়ে কাজের সহায়ক হবে, সামাজিক কর্তব্য কাজে বাধা দেবে না,

নিজে যদি অন্য কাজের জন্য সামাজিক কাজ নাও করে উঠতে পারে, স্বামীর কাজের বাধাস্বরূপ হবে না। সে তখন নিজের উপার্জন থেকেও পত্র-পত্রিকা কেনার জন্য বা আন্দোলনের জন্য দু পয়সা খরচ করতে দ্বিধা করবে না, কারণ সে তখন বুঝতে পারবে মানুষের মতো বাঁচার ও সমান মানবিক অধিকারের জন্য আত্মত্যাগের প্রয়োজনের কথা—যে অধিকার এতকাল পর্যন্ত তারা বা তাদের সন্তান সন্ততিরা কখনই ভোগ করতে পারেনি।

এইভাবে সর্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য পরস্পরের সঙ্গে যৌথ কাজকর্মের ফলে একটা অত্যন্ত উন্নত নৈতিক প্রভাব পড়ে, তার ফল যে কত ভাল হয় তা যারা সমান অধিকারের ভিত্তিতে নূতন সমাজ গঠনের বিরোধিতা করে আসছে তাদের দূরদৃষ্টিহীন চোখে ধরা পড়ে না আর সামাজিক অবস্থার যতই উন্নতি হতে থাকবে, পুরুষ ও নারীরা যত আর্থিক ও শ্রমের শোষণের জোয়াল থেকে মুক্ত হবে, ততই পুরুষ ও নারী উভয়ের সম্পর্কের উন্নতি হবে।

অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রের মতো এ ক্ষেত্রেও বাস্তব অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার মধ্য দিয়েই সম্পূর্ণতা আসবে। জলে না নামলে কেউ সাঁতার শেখে না। না শিখে বা চর্চা না করে কেউ একটা বিদেশী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করতে পারে না। একথা সকলেই মেনে নেবে। কিন্তু খুব কম লোকই আছে যারা বুঝতে পারে যে রাষ্ট্র ও সমাজের বেলাতেও ঠিক সেই নিয়মই খাটে। আমাদের নারীরা কি উত্তর আমেরিকার নিগ্রোদের চেয়েও অপারগ—যারা কতদূর পিছনে পড়ে আছে, কিন্তু তবুও তাদের রাজনৈতিক সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে? আমরা কি এ কথাই ধরে নেব যে হাজার হাজার শিক্ষিত মার্জিত নারীর চেয়ে সবচেয়ে মূর্খ, অজ্ঞ পোমারানিয়ার দিন মজুরের, অথবা পোল্যাণ্ডের জাহাজী শ্রমিকদের দাবি বেশী, আর শুধু মাত্র এই কারণেই যে এ দুনিয়াতে তারা পুরুষ হয়ে জন্মেছে বলে? মায়ের চেয়ে পুত্রের অধিকার বেশি হবে? আর সেই মায়ের গুণাবলী নিয়েই পুত্র বড় হয়েছে, মাতাই পুত্রকে গড়ে তুলেছেন। আশ্চর্য! তা ছাড়া এমন নয় যে শুধু জার্মানীতে আমরাই একটা অজানা অচিন্তনীয় অন্ধকারের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। উত্তর আমেরিকা ও ইংল্যান্ড ইতিমধ্যেই সূচনা করে দিয়েছে। উত্তর আমেরিকার কোনো কোনো অঞ্চলে নারীদেরও পুরুষদের মতো ভোটাধিকার আছে। তার ফলও খুবই ভালই হয়েছে, উইওমিং অঞ্চলে (Wyoming Territory) ১৮৬৯ সাল থেকে নারীদের পরীক্ষামূলকভাবে ভোটাধিকার দেওয়া হয়েছে, এবং তার যে কতটা সাফল্য হয়েছে তা নিম্নের রিপোর্ট থেকে দেখা যায়ঃ

১৮৭২ সালের ২৬শে ডিসেম্বর উইওমিং অঞ্চলের লাড়ামি শহরের জজ কিংম্যান শিকাগোর মহিলা পত্রিকায় লিখেছেনঃ

"আজ থেকে তিন বছর পূর্বে আমাদের অঞ্চলে নারীরাও পুরুষদের মতো বিভিন্ন পদের জন্য ভোট দেবার ও নির্বাচিত হবার অধিকার পেয়েছে। এই সময়ের মধ্যে তারা জুরি ও শালিসির কাজও করেছে। প্রতিটি নির্বাচনেই তারা ব্যাপকভাবে অংশ গ্রহণ করেছে। আর যদিও আমি মনে করি যে আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা নীতিগত ভাবেই নারীদের এসব কাজের মধ্যে প্রবেশের বিপক্ষেও, কিন্তু তারাও একথা অস্বীকার করতে পারবেন না যে নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারীদের প্রভাব অনেক ভাল হয়েছে। তার ফলে নির্বাচনগুলি শান্তিপূর্ণ ও সুশৃংখলভাবে করা গেছে। যে সব অপরাধ এতদিন চোখের আড়ালে থেকে যেত সেগুলি ধরা পড়েছে ও আদালত থেকে তার শাস্তি বিধান করা গেছে।

"যেমন দেখা গেছে যে এই অঞ্চলটি যখন সংগঠিত হয়েছিল তখন এমন ব্যক্তি খুব কমই ছিল যে রিভলভার নিয়ে না চলত, আর যখন তখন তার ব্যবহারও করত, আমার এমন কোনো উদাহরণ মনে পড়ে না যে পুরুষদের দ্বারা গঠিত কোনো জুরি রিভলভার দিয়ে গুলি করেছে এমন কোনো ব্যক্তিকে অপরাধী বলে রায় দিয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে যখনই দুই বা তিনজন নারী থেকেছে তখনই তারা আদালতের নির্দেশকে মেনে চলেছে।"

জজ কিংম্যান আরো বলেছেন যে বিচারপতিরা দুঃখ করে বলেছেন যে ঘরকন্নার কাজে আটকা থাকার জন্য নারীরা জুরিদের কাজ বিশেষ করতে পারে না, কিন্তু যখন তারা কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করেছে তখন তা তারা খুবই বিবেকের সংগে সম্পন্ন করেছে। পুরুষদের চেয়ে তারা আদালতের বিচারের কাজকে অধিক মনোযোগ দিয়ে দেখেছে, তারা বাইরের কোনো কিছুর দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে, অনেক ভালভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করেছে।

অধিকন্তু জুরি ও বিচারক হিসাবে নারীদের উপস্থিতির প্রভাবে আদালতের শৃংখলা ও শান্ত অবস্থা দেখা গেছে। পুরুষরা নম্র ভদ্র ব্যবহার করেছে। শ্রোতারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক পরে এসেছে। সমস্ত কাজকর্ম বেশ সসম্ভ্রমে ও দ্রুতগতিতে চলেছে।

সাধারণ নির্বাচনগুলির সময়ও নারীদের এই প্রভাবের সুফল দেখা গেছে। আগে এই নির্বাচনগুলিতে দেখা যেত হৈ হুল্লোড়, চেঁচামেচি, মারামারি, মাতালদের মাতলামি—সর্ব রকমের বিশৃংখলা। কিন্তু নারীদের ভোটাধিকার দেবার পর থেকে সমগ্র চিত্রটাই বদলে গেছে। নারীরা ভোট দিতে এলে সকলেই তাদের অত্যন্ত সম্মান করেছে। উচ্ছৃংখল হাংগামাকারীরা পালিয়েছে। নির্বাচন-গুলি সুন্দরভাবে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে। ক্রমশঃই নারীরা অধিক সংখ্যায় ভোট দিয়েছে। অনেক সময় তারা তাদের স্বামীদের বিপক্ষ দিকেও ভোট দিয়েছে। কিন্তু তার জন্য কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি হয়নি।

জর্জ কিংম্যান তাঁর দীর্ঘ পত্রের শেষে এই উল্লেখযোগ্য উক্তি করেন : "আমি বিশেষ জোরের সঙ্গে বলছি যে নারীদের এই আইনগত অধিকার দেবার দরুন অনেক সুফল দেখতে পাওয়া গেছে। আর যারা এর বিরুদ্ধে ছিল তাদের কথা অনুযায়ী কোনো কুফলই আমি দেখতে পাইনি।"

ইংলণ্ডে অনেক জায়গায় যেখানে নারীরা প্রয়োজনীয় কর দিয়ে থাকে, তারা পৌর প্রতিষ্ঠানে ভোটাধিকার পেয়েছে। তাতে কোনোই অসুবিধা দেখা যায়নি, ৬৬টি পৌরসভার ২৭,৯৪৬ নারী ভোটাধিকার পেয়েছিল। তার মধ্যে ১৪,৪১৫ জন, অর্থাৎ শতকরা ৫০ জনের উপর নারী প্রথম নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছিল আর ১,৬৬,৭৮১ জন পুরুষের মধ্যে শতকরা ৬৫ জনও ভোট দেয়নি। জার্মানীতেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, যেমন স্যাকসনিতে নারীদের ভোটাধিকার আছে। জেলাগুলির নিয়মানুযায়ী যদি কোনো অবিবাহিত নারীর সম্পত্তি থাকে তবে সে সম্প্রদায়গত ভিত্তিতে ভোট দিতে পারবে। যেমন, যদি কোনো অঞ্চলে সম্পত্তির অধিকারী অবিবাহিত নারীরাই সংখ্যা গরিষ্ঠ হয়, তবে তারা সেই অঞ্চলের দুই তৃতীয়াংশ প্রতিনিধি নির্বাচিত করতে পারবে। কিন্তু সেই প্রতিনিধিরা পুরুষ হবে। আর অবিবাহিত ভোটাধিকারীদের বিবাহ হওয়া মাত্রই তার ভোটের অধিকার তার স্বামী পাবে। নারীর আর ভোটের অধিকার থাকবে না। তারপর যদি সেই সম্পত্তি বিক্রি হয়ে যায়, তবে তার স্বামীরও ভোটাধিকার চলে যাবে। সুতরাং ভোটাধিকার আসলে দেওয়া হয় সম্পত্তিকে—মানুষকে নয়। এই হল রাষ্ট্রের নীতি, নাগরিক অধিকার সম্পর্কে রাষ্ট্রের এই ধ্যান-ধারণা। যে মানুষের টাকা বা জমি নেই, তার কোনো মূল্যই নেই। যুক্তি বা বুদ্ধির কথা পরে আসে, তা হিসেবের মধ্যে ধরা হয় না।

নারীদের ভোটাধিকার দেবার বিরুদ্ধে আর একটা যুক্তি হল এই যে তারা ধর্মের ও তার রক্ষণশীলতার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। একথা সত্য। কিন্তু নারীদের ধর্মবিশ্বাস ও রক্ষণশীলতার কারণ তাদের অজ্ঞতা। তাদের শিক্ষিত করে তোল, এবং তাদের প্রকৃত স্থান কোথায় তা তাদের বোঝাও। তাছাড়া নির্বাচনের ক্ষেত্রে ধর্মের প্রভাবের কথাটা আমার কাছে অতিরঞ্জিত বলে মনে হয়। জার্মানীতে আল্ট্রামনটেনে যে বিক্ষোভ হয়েছিল তার পিছনে ধর্মীয় ও সামাজিক স্বার্থ একসঙ্গে কাজ করেছে। সেখানকার ধর্মযাজকরা সামাজিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। এই কারণেই তারা জনগণের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। কুলটার ক্যাম্প (Kultur Kamp) শান্তিচুক্তি হয়ে যাওয়া মাত্রই তাদের সোরগোল থেমে যায়, তারপরই সব চিত্রটা বদলে যায় ও দেখা যায় যে নিছক ধর্মের প্রভাব খুবই সামান্য। নারীদের বেলাতেও সেই কথাই খাটে। যখন তারা পুরুষদের কাছ থেকে শুনে, খবরের

কাগজ পড়ে মিটিং-এ গিয়ে জানতে পারবে যে তাদের প্রকৃত স্বার্থ কোথায় তখনই তারা পুরুষদের মতনই অতি দ্রুত ধর্মের প্রভাব থেকে নিজেদেব মুক্ত করে আনবে। কিন্তু তা যদি নাই হল ধরে নিলাম, তবুও কি সেজন্য নারীদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা উচিত ?

নারীদের ভোটাধিকারের বিরুদ্ধে সবচেয়ে তীব্র বিরোধিতা করে ধর্মযাজকেরা এবং কেন করে তা তারা জানে। তাদের ক্ষমতার শেষ আশ্রয় স্থলটুকু ধ্বসে যাবে বলে। উদারপন্থীরা যদি এই বলে সর্বজনীন ভোটাধিকার বাতিল করতে চায় যে তাতে সমাজতন্ত্রীদেরই বেশি সুবিধা হয়ে যাচ্ছে, তবে শ্রমিকরা কি বলবে ? অধিকারকে যদি কেউ ঠিক মতো কাজে লাগাতে না শেখে তবে তার প্রাপ্ত অধিকার বাতিল হয়ে যেতে পারে না।

তবে ভোট দেবার অধিকার ও নির্বাচিত হবার অধিকার এক সঙ্গেই না দিলে সে অধিকার হবে ইস্পাতহীন ছুরির মতো। কেউবা বলে ওঠে ঃ "রাইখস্ট্যাগে যদি নারীরা আসে তবে তো সে খুবই চমৎকার দৃশ্য হবে !" নারীদের আমরা দেখেছি তাদের কংগ্রেসের মধ্যে সভা সমিতিতে, আমেরিকার উচ্চস্থানে ও জুরির আসনে, তবে রাইখস্ট্যাগে তাদেব আসতে দোষ কি ? আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারি যে প্রথমেই যে নারী রাইখস্ট্যাগে আসবে, সেই পুরুষদের কাছ থেকে সম্মান অর্জন করতে পারবে। প্রথম যখন শ্রমিকরা সেখানে এসেছিল, তখনও লোকে মনে করেছিল যে তাদের সেখানে বেখাপ্পা মনে হবে, এবং বলেছিল যে শ্রমিকও শীঘ্রই বুঝতে পারবে যে তারা কি দোষ করেছে। কিন্তু সেই শ্রমিক-সভ্যরা খুবই তাড়াতাড়ি তাদের যোগ্যতা প্রমাণ করেছে, আর এখন লোকে ভয় পাচ্ছে পাছে তাদের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। আবার কেউবা হাসি ঠাট্টা করে বলে ঃ "কল্পনা করত সংসদে অন্তঃসত্ত্বা নারীদের কী অশালীন দেখাবে !" কিন্তু এই ভদ্রলোকরাই আবার এটা সঠিক মনে করেন যখন শত শত গর্ভবতী নারী শেষ সময় পর্যন্ত তাদের নারীত্বের মর্যাদা, স্বাস্থ্য ও নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে অত্যন্ত অশালীন কর্মে নিযুক্ত থাকে। আমার কাছে যে পুরুষ অন্তঃসত্ত্বা নারীর যে কোনো অবস্থাতেই ঠাট্টা করতে পারে সে অতি হীন ব্যক্তি। তার মনে রাখা উচিত যে একদিন তারও জননী এমনই অবস্থার মধ্য দিয়ে তাকে এই পৃথিবীতে এনেছিলেন, তার নিজের স্ত্রীরও এই অবস্থার কথা তার ভাবা দরকার। তাহলেই লজ্জায় তার মাথা নত হয়ে আসবে।

সংসদে জনগণের প্রতিনিধিদের বাইরের চেহারার সৌন্দর্যের কথা যদি ধরি, তবে বর্তমান সংসদ সদস্যদের বিষয়েও অনেকেরই ভিন্ন মত দেখা যাবে। নিজেদের শরীরের প্রতি অতিরিক্ত যত্ন নিয়ে নিয়ে অনেকে নিজেদের বুদ্ধি ও চরিত্র নষ্ট করেও স্থূলকায় হয়ে ওঠে। কিন্তু অন্তঃসত্ত্বা নারীর স্থূলকায় হবার

কারণ অতি স্বাভাবিক। যে নারী সন্তানের জন্ম দেয় সেও সামাজিক কর্তব্যই পালন করে। যে পুরুষরা জীবন দিয়ে শত্রুর হাত থেকে দেশ ও সমাজকে রক্ষা করে তার চেয়ে এ কর্তব্য কিছু ছোট নয়। সন্তানের জন্ম দেবার জন্য মায়েরা তাঁদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে থাকেন, এবং অনেক মা-ই তাঁদের জীবন বিসর্জনও দেন। যে নারীরা সন্তানের জন্ম দেবার জন্য মৃত্যুমুখে পতিত হন, বা চিররুগ্ন হয়ে থাকেন তাদের সংখ্যা বোধহয় যে পুরুষরা যুদ্ধ ক্ষেত্রে জীবন দিয়ে থাকেন বা আহত হন তাদের চেয়ে কম নয়। শুধু এই একটা যুক্তিতেই নারীরা পুরুষের সমান অধিকার পেতে পারে। তাছাড়া আমাদের সামরিক ব্যবস্থা অনুযায়ী সামরিক বাহিনীর অনেককেই তাদের কর্তব্য করতে হয় না, অনেকেই নামে মাত্র থেকে যায়।

নারীদের সামাজিক কাজে অংশ গ্রহণ সম্বন্ধে এ সব আজে বাজে ওজর আপত্তি উঠতই না, যদি গোড়া থেকেই নারী পুরুষের সম্বন্ধটা হত স্বাভাবিক, যদি না তাদের পরস্পরের মধ্যে প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ স্থাপন করে তাদের মধ্যে কৃত্রিম ব্যবধান সৃষ্টি করা হত। এই ব্যবধান সৃষ্টি করার জন্য খ্রীষ্ট ধর্মের ধ্যান-ধারণাও অনেকখানি দায়ী।

নারী পুরুষের মধ্যের এই মারাত্মক ব্যবধান দূর করা এবং তাদের মধ্যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ ফিরিয়ে আনা যে কোনো যুক্তিসঙ্গত সামাজিক ব্যবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। প্রকৃতির বিরুদ্ধে অপরাধ শৈশবে, ছাত্র জীবন থেকেই শুরু হয়। ক্রমেই ছেলে মেয়েকে পৃথক করে রাখা হয়, তারপর মানুষের যৌন জীবন সম্বন্ধে কুশিক্ষা দেওয়া হয়, নয়তো কোনো শিক্ষাই দেওয়া হয় না। একথা ঠিক যে এখন যে কোনো সাধারণ বিদ্যালয়েই জীববিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। কি করে পাখিরা ডিম পাড়ে, কি করে তারা ডিমে তা দেয়, মেয়ে পাখি ও পুরুষ পাখির সম্বন্ধের বিষয়েও তাদের শেখানো হয়। জীবজন্তুর সন্তান প্রজননের বিষয় তাদের শেখানো হয়ে থাকে, কিন্তু মানুষের বিষয়ে তাদের শেখানো হয় না। একটা রহস্যময় আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। ছেলে মেয়েরা সে সব বিষয়ে শিক্ষকদের কাছে প্রশ্ন করতে সাহস পায় না। মা বাপের কাছে প্রশ্ন করলে অদ্ভুত কথা বলে তাদের থামিয়ে দেওয়া হয়। তার ফলে ছেলে-মেয়েরা যেভাবে বিষয়টা জানতে পারে তাতে তাদের ক্ষতি হয়ে যায়। আর প্রায় সব ছেলেমেয়েরাই বার বছর বয়সের মধ্যে সব জানতে পারে। গ্রামের ও ছোট ছোট শহরের অল্প বয়সী ছেলেমেয়েরা জীবজন্তুদের মধ্যেকার যৌন সংসর্গ ও তাদের বাচ্চা হবার ব্যাপারটা লক্ষ্য করে থাকে, এ সব ব্যাপারে বড়দের আলাপ আলোচনাও শোনে। এসব থেকে তার নিজের মনের ভিতরও সন্দেহ জাগতে থাকে কেমন করেই বা তার মা তাকে এই

পৃথিবীতে এনেছিল। অবশেষে তারা সব বুঝতে পারে, কিন্তু এই বুঝতে পারার পদ্ধতিটা সরল স্বাভাবিক হয় না। ছেলেমেয়েদের কাছে এই গোপনতার জন্য তাদের মা বাবার সঙ্গে তাদের একটা ব্যবধান হয়ে যায়। তাদের ধ্যান-ধারণাও সঠিক হয় না। পরবর্তী সময়ে সকলেই তাদের বা তাদের বন্ধু-বান্ধবের অপরিণত বয়সের কথা মনে করতে পারে।

আমেরিকার জনৈক মহিলার লেখা একখানি বই আছে। এই বইখানির মধ্যে তিনি লিখেছেন যে তার আট বছরের শিশুপুত্রের মনে সে যে কিভাবে এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করল এ বিষয়ে অসংখ্য কৌতুহলপূর্ণ প্রশ্ন দেখা দেয়। তখন তিনি তাকে বানানো মিথ্যে মিথ্যে কথা বলাটাই নৈতিকতা-বিরোধী মনে করেন এবং তাকে আগাগোড়া সত্য কথা বলেন। লেখিকা বলেছেন যে তাঁর শিশুপুত্র সমস্ত কথা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শোনে এবং তার মা তাকে পৃথিবীতে আনবার জন্য যে কত কষ্ট ও উদ্বেগ সহ্য করছে তা জানা অবধি মায়ের প্রতি তার আরো অনেক বেশি টান ও ভক্তি বেড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য মায়ের প্রতিও তার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। লেখিকা ঠিকই বলেছেন যে স্বাভাবিকভাবে ছেলেমেয়েদের এ সব শিক্ষা দিলে নারী পুরুষের সম্বন্ধটাও উন্নত হয়, আর নারীদের প্রতি পুরুষদের মনোভাবও অনেকটা সংযত হয়ে যায়। স্বাভাবিক সংস্কার মুক্ত মন নিয়ে চিন্তা করলে সকলেই একথা বুঝতে পারবে।

বর্তমান অবস্থার উন্নতির জন্য আমরা যে দিক দিয়েই চিন্তা করি না কেন, আমরা দেখতে পাব যে এর জন্য প্রয়োজন সামাজিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন করা, এবং তার মাধ্যমে নারীর মধ্যে যৌন সম্পর্কেরও আমূল পরিবর্তন আনা। কিন্তু নারীদের ব্যাপারটা যদি শুধু তাদের উপরই ছেড়ে দেওয়া যায় তবে কখনই তারা লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে না। তাদের সঙ্গে সহযোগী শক্তি চাই। তাদের স্বাভাবিক সহযোগী শক্তি হল সর্বহারাগণ—যারা নিজেরাই শোষিত শ্রেণী। শ্রমিকরা অনেক আগেই শ্রেণী রাষ্ট্রের দুর্গে আঘাত করতে শুরু করেছে, যে শ্রেণী-শাসন ব্যবস্থার মধ্যেই রয়েছে পুরুষদের দ্বারা নারীদের উপর প্রভুত্ব। এই দুর্গকে সর্বদিক থেকে ঘিরে ফেলে সর্ব রকমে এর পতন ঘটাতে হবে। এই লড়াইয়ের জন্য সৈন্যবাহিনী সব দিক থেকেই সাহায্য পাবে। আধুনিক ঐতিহাসিক গবেষণা, শিক্ষার এবং সংখ্যাতত্ত্বের সংগে সংগে সমাজবিজ্ঞান ও প্রকৃতিবিজ্ঞানও এগিয়ে চলেছে। দর্শনশাস্ত্রও পেছিয়ে নেই। মেইনল্যান্ডস (Mainlandes)-এর ফিলসফি অব রিডিমশন (Philosophy of Redemption)-এ অদূর ভবিষ্যতে আদর্শ রাষ্ট্রের কথাও বলা হয়েছে।

বর্তমান শ্রেণীরাষ্ট্রের পতন ঘটানের পথটা এই রাষ্ট্রের রক্ষকদের কার্যাবলীর দ্বারাই আরো সুগম হয়ে যাচ্ছে। তারা তাদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করার জন্য

সংগ্রাম করে বটে, কিন্তু আবার মুনাফার ভাগাভাগি নিয়ে পরস্পরের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকে। একদল আর এক দলের বিরুদ্ধে লড়াই করে। আবার যে সৈন্য বাহিনীর উপর তাদের নির্ভর করতে হয় তাদের মধ্যেও জাগরণ দেখা দেয়। আর সর্বশেষে দেখা যায় যে শত্রুপক্ষের থেকেও অনেকে উচ্চ আদর্শ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাদের ক্ষুদ্র শ্রেণী স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে এসে মুক্তিকামী জনগণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।

কিন্তু আবার অনেকেই রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের বিষয়ে সচেতন নয়। তাই এ বিষয়ে আরো বিশদ আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা সেই আলোচনা করব।

বর্তমান যুগে নারীর অবস্থা

রাষ্ট্র ও সমাজ

বিগত কয়েক দশক পর্যন্ত সভ্যদেশগুলির সমাজ জীবনের মধ্যে দ্রুত পরিবর্তন এসেছে। একদিকে মানুষের অনেক অগ্রগতি হয়েছে ও অন্যদিকে পুরাতন সমাজ ব্যবস্থায় পচন ধরেছে। এখন রাষ্ট্র এবং ব্যক্তি উভয়েরই পায়ের তলার মাটি নড়ে গেছে। সমাজের উপরতলা থেকে শুরু করে নিচুতলা পর্যন্ত সর্বস্তরের মধ্যেই অসন্তোষ, বিক্ষোভ এবং অনিশ্চয়তার ভাব দেখা গেছে। এ বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই। শাসকশ্রেণী তাদের এই দুঃসহ অবস্থাকে জোড়াতালি দিয়ে রাখবার জন্য নানা রকম প্রচেষ্টা করে ব্যর্থ হচ্ছে ও তার ফলে আরো অবিশ্বাস ও উৎকণ্ঠা বেড়ে চলেছে। তারা কোনো একটা সমস্যাকে আইন কানুন দিয়ে ঠেকিয়ে রাখতে গিয়েই দেখতে পাচ্ছে যে অন্যত্র আরো দশটা সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এর মধ্যে আবার তাদের নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্ব লেগেই আছে। বিক্ষুব্ধ জনগণকে থামিয়ে রাখতে একটা পার্টি যদি কোনো কিছুতে সমঝোতা করার প্রয়োজন মনে করল, তো অন্য পার্টি রুখে এসে বলল যে শাসকশ্রেণীর দুর্বলতায় জনগণ এভাবে জনগণকে সুবিধা ছেড়ে দিলে তাদের মধ্যে চাহিদা বেড়েই চলবে।

সরকারগুলি শুধু জার্মান সরকার নয়, সমস্ত সরকারগুলিই বাতাসের তোড়ে নলখাগড়ার মতো নড়ছে, তাদের প্যালা দিয়ে ঠেকিয়ে রাখতে হচ্ছে, নাহলে তারা টিকতে পারছে না। তাই তারা ঠ্যাকা দেবার জন্য একবার এদল, আর একবার ওদলের কাছে সমর্থন চেয়ে বেড়াচ্ছে, আজ একজনের উপর আর একজন আঘাত হানছে, কাল আবার তা উল্টে যাচ্ছে। একজন অতিকষ্টে যা গড়ে তুলছে, আর একজন তা ভূমিস্মাৎ করে দিচ্ছে। বিভ্রান্তি ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে। বিক্ষোভ ফেটে পড়ছে। সংঘাত বাড়ছে। পূর্বের যে কোনো সময়ের চেয়ে অতি দ্রুত শ্রমিকরা এগিয়ে আসছে। জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে, তথাকথিত জাতীয় সম্পদও বেড়ে চলেছে, কিন্তু তার অনুপাতে যে ভাবে অতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধি ও করবৃদ্ধি হচ্ছে তাতে মানুষের আর্থিক দুরবস্থা অত্যন্ত বেড়ে গেছে।

আর এসব সত্ত্বেও আমাদের শাসকগোষ্ঠী বেশ আত্মসন্তুষ্টি ও মোহ নিয়ে চলেছেন। তারা সম্পত্তির মালিকদের স্বার্থে জনগণের উপর কর ধার্যের নিয়ম বাড়িয়েই চলে, আর মনে করে যে এটা কোনো শোষণের কাজ হচ্ছে না, কারণ

জনগণ নিজেদের অজ্ঞতার কারণেই কর প্রথার শোষণের বিষয়টা প্রত্যক্ষভাবে বুঝতে পারে না। কিন্তু তারা ভুলে যায় যে এই অন্যায় করভারগুলি বহন করতে হয় প্রধানতঃ শ্রমিকশ্রেণীর, এবং তাদের উপরই চাপ পড়ে। আয়কর দেবার থেকে এই করভার বহন করেই শ্রমিকশ্রেণী বেশি তাড়াতাড়ি ফতুর হয়ে যায়, তাদের মধ্যে অপুষ্টি বেড়ে যায়, খাদ্যে ভেজাল বেড়ে যায়। দৈনন্দিন জীবনের উপর এই করের বোঝা অনেক বেশি চাপ সৃষ্টি করে, তার ফলও ফলতে থাকে। যখন পরোক্ষ করের চাপ দুঃসহ হয়ে ওঠে, তখন দুঃস্থ মানুষরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে, তার জন্য রাষ্ট্রকেই দায়ী করে। যখন পরোক্ষ করের বোঝা একটা সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন সমগ্র সমাজ ব্যবস্থাকেই তার জন্য দায়ী করা হয়, কারণ এটা একটা সামাজিক দুর্গতি হয়ে দাঁড়ায়। এই হল প্রগতি। "দেবতারা যাদের ধ্বংস করতে চায় তাদের অন্ধ করে দেয়।"

ইতিমধ্যে নতুন নতুন সংগঠন গড়ে উঠছে। কিন্তু কোনো পুরনো প্রতিষ্ঠানই একেবারে বাতিল হচ্ছে না। আবার কোনো নতুন প্রতিষ্ঠানও পুরোদমে এগিয়ে যাচ্ছে না। জাতীয় জীবনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি প্রয়োজনও বেড়ে গেছে। সাধারণ শিল্পগুলিতে বহু টাকা খাটাবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, বিশেষ করে যখন সেগুলির উপর বসে বসে বহু সংখ্যক পরগাছা মুনাফা লুটছে। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানগুলি রয়েছে যেগুলি সভ্যতার অগ্রগতির অন্তরায় স্বরূপ। সেগুলিকে শুধু যে রেখে দেওয়া হয়েছে তা নয়, বাড়িয়েও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেগুলি জনগণকে আরো নিপীড়ন করছে। পুলিস, সৈন্যবাহিনী, আইন, আদালত, জেলখানা—এ সব ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে, আর এর পিছনে খরচও বেড়ে চলেছে। অন্যান্য প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যাপারেও ঠিক এই জিনিস দেখা যায়, অথচ দেশের ভিতরে বা বাইরে নিরাপত্তা যে বাড়ছে তা নয়। প্রকৃতপক্ষে তার উল্টোটাই হচ্ছে।

আমাদের বহু পৌরসভাগুলির অবস্থাই অত্যন্ত কাহিল হয়ে পড়েছে। বছর বছর যে চাহিদা বাড়ছে তা মেটাবার সাধ্য তাদের নেই। এ সমস্যা বিশেষ করে বড় বড় শিল্প নগরীগুলিতে প্রকট হয়ে উঠেছে। সেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার অনেক উন্নতি করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আর তা করার যা কিনা গরিব মানুষদের পক্ষে করে ওঠা সম্ভব নয়। তাই আবার নতুন করে কর বসাতে হয়, নতুন করে ঋণ নিতে হয়, স্কুল বাড়ি তৈরী, রাস্তা তৈরী, গ্যাস, নর্দমা, জল সরবরাহ, পুলিস প্রশাসনের পিছনে বাড়তি খরচ—এসব প্রতি বছর বেড়েই চলেছে। তদুপরি মুষ্টিমেয় ধনী ব্যক্তিদের চাহিদাই সমাজের উপর সবচেয়ে বেশি। তাদের জন্য উচ্চশ্রেণীর পাবলিক স্কুল চাই, থিয়েটার চাই, চমৎকার চমৎকার সাজানো কোয়ার্টার, গ্যাস, ফুটপাথ, ইত্যাদি চাই। বর্তমান সমাজ-

ব্যবস্থার অন্তর্গত এই বিশেষ সুবিধাভোগীদের বিষয়ে জনসাধারণের প্রতিবাদ খুবই সঙ্গত। এই সংখ্যালঘুদের হাতেই রয়েছে ক্ষমতা। তারা ইচ্ছে করলে তাদের প্রতিবাদী সাধারণ মানুষের উপর আঘাত হানতে পারে। উৎপাদনের যন্ত্রগুলি সম্পূর্ণভাবেই তাদের কব্জায়, আর তার উপরই অধিকাংশ মানুষকে নির্ভর করতে হয়, তদুপরি প্রশাসন ব্যবস্থার যথেষ্ট ত্রুটি রয়েছে। বেতনভোগী আমলাদের সংখ্যাও অনেক সময় কম থাকে, অথবা তাদের মধ্যে অনেকেরই কাজের উপযুক্ত যোগ্যতা থাকে না, আর যারা বিনা বেতনে বিভিন্ন প্রশাসনে বা পৌর প্রতিষ্ঠানে কাজ করে তারা নিজেদের অন্যান্য কাজে এতই ব্যস্ত থাকে যে তারা এসব কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সময় দিতে পারে না। এই রকম অবস্থা থেকে অনেকেই আবার সমাজের স্বার্থের বদলে ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধি করে থাকে। আর তার বোঝাটা গিয়ে পড়ে করদাতাদের উপর।

বর্তমান সমাজের এই অবস্থার কোনো আমূল পরিবর্তনের প্রশ্নই ওঠে না, যাতে সকলের উপকার হতে পারে। সে বিষয়ে আধুনিক সমাজের কোনো ক্ষমতাই নেই। এই সমাজ ব্যবস্থার অবসান ছাড়া উপায় নেই, কিন্তু তাও তারা করতে পারে না। যে কোনো ভাবেই করভার বাড়ুক না কেন, মানুষের মধ্যে অসন্তোষ বাড়বেই। কয়েক দশকের মধ্যেই অধিকাংশ পৌরসভাগুলি এভাবে প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালাতে অপারগ হয়ে উঠবে। কেন্দ্রীয় সরকারের ভিতরের চেয়েও স্থানীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যে আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন আরো তীব্রভাবে দেখা দেবে। বর্তমান ব্যবস্থা দেউলিয়া হতে চলেছে। এর পর কোন ব্যবস্থা আসবে তা আমরা পরে আলোচনা করছি।

এই হল রাষ্ট্র ও সমাজের সংক্ষিপ্ত চিত্র, যার মধ্য দিয়ে কিনা মানুষের সামাজিক জীবনের রূপ প্রতিফলিত হয়েছে।

*　　　*　　　*

সামাজিক জীবনে বেঁচে থাকার সংগ্রাম দিনে দিনে তীব্র হয়ে উঠছে। সব কিছুর বিরুদ্ধেই একটা সর্বব্যাপী সংগ্রাম তীব্র হচ্ছে। তার জন্য যে কোনো অস্ত্রই ব্যবহার করা হচ্ছে। যে যেমন করে পারছে লড়াই করছে। সবলের কাছে দুর্বল হেরে যাচ্ছে। যেখানে গায়ের জোর, টাকার জোর ও সম্পত্তির জোরে কুলোচ্ছে না, সেখানে যে কোনো ধূর্ত, অসৎ উপায় গ্রহণ করা হচ্ছে—মিথ্যে কথা, জোচ্চুরি, শঠতা, জালিয়াতি, খুনখারাপি—যত রকমের দুষ্কৃতি সম্ভব তা চলেছে। নিজের নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য দ্বন্দ্ব চলেছে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর, নারীর সঙ্গে পুরুষের, এক বয়সের সঙ্গে অন্য বয়সের লোকের। মুনাফা ও সুবিধা ভোগই মানুষের সমস্ত অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রিত করছে—আর সব কিছুকেই পিছনে ঠেলে দিচ্ছে। হাজার হাজার পুরুষ ও নারী

শ্রমিক চরম দুরবস্থায় পেঁাছে ভিখারীতে পরিণত হচ্ছে বা দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। শ্রমজীবী মানুষ দলে দলে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে কাজের জন্য ছুটোছুটি করছে। দীর্ঘদিন পর্যন্ত কাজ না পাবার ফলে, অনেকে দুঃস্থ নিঃসম্বল হয়ে যাবার ফলে মুষড়ে পড়েছে, "সম্মানিত ব্যক্তিরা" তাদের ভীতি ও বিরক্তির চোখে দেখে, অথচ দিনের পর দিন অন্ন বস্ত্রহীন ক্ষুধার্ত যে সব মানুষদের জন্য তাদের মনের ভিতর থাকে প্রচ্ছন্ন বিতৃষ্ণা ও ঘৃণা, তাদের দুরাবস্থার জন্য ঐ "সম্মানিত ব্যক্তিরা" নিজেরাই দায়ী। বিবাহিত মানুষদের পরিবারগুলির অবস্থাই সবচেয়ে ভয়ংকর হয়ে ওঠে, এবং অনেক সময় মা বাপ শেষ পর্যন্ত বেপরোয়া হয়ে উঠে তাদের সন্তানদের ও নিজেদের উপরই ভয়াবহ অপরাধ করে বসে। বিগত কয়েক বছরের এ রকম অপরাধের সংখ্যা অনেক দেখা গেছে।* নারীরা ও অল্পবয়সী মেয়েরা পতিতাবৃত্তির দিকে চলে যেতে বাধ্য হয়। নানা রকম অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর বেড়ে চলে কারাগার ও তথাকথিত শোধনাগারগুলি যেগুলিতে অপরাধীদের সংখ্যা উপছে পড়ে।

গত ১৭ই এপ্রিল ১৮৭৮-এর লিপজিগার জাইটুং (Leipziger Zeitung)-এ স্যাকসন ভয়েগল্যাণ্ডের (Saxon Voigtland)-এর অবস্থার বর্ণনা দিয়ে লিখেছে ঃ

"আমাদের তাঁতীদের দুরবস্থার কথা নতুন নয়, বর্তমানের ব্যবসায়ের মান্দার সঙ্গে এর সম্বন্ধ খুবই কম। এর কারণ হল হাতের তাঁতের বদলে কল বসে যাচ্ছে, আর তা যেতেই হবে। সুতরাং এখন তাঁতীদের অন্য কাজ নিতে হবে। যে সব তাঁতীরা বুড়ো হয়ে গেছে, আর অন্য কোনো কাজে নতুন করে যেতে পারে না, তাদের এখন অপরের দয়ার উপরই নির্ভর করতে হবে। কিন্তু তা ছাড়াও অনেক ভাল ভাল তাঁতী কাজের অভাবে বেকার হয়ে বসে আছে। এদের জন্য কাজ পেতেই হবে। তাদের যোগ্যতার কথা বিবেচনা করতে হবে। আমরা আশা করি যে আমাদের শিল্পমালিকরা এ বিষয়ে অনুসন্ধান করে দেখবেন

* একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। বার্লিনের জনৈক বেকার নকলনবিশ ৪৫ বৎসর বয়স্ক এস তার ৩৯ বৎসর বয়স্ক সুন্দরী স্ত্রী ও ১২ বৎসর বয়স্ক কন্যা সহ প্রায় অনাহারের অবস্থায় পড়ে। তখন তার স্ত্রী, স্বামীর অনুমতি নিয়েই পতিতাবৃত্তি করার সিদ্ধান্ত নেয়। পুলিস সে কথা জানতে পেয়ে ঐ মহিলার নাম পতিতাবৃত্তির রেজিস্টারের অন্তর্ভুক্ত করে। তখন ঐ পরিবারের উপর নেমে আসে চরম লজ্জা এবং হতাশা। আর ওরা তিনজনে মিলেই বিষ খেয়ে মরবার সিদ্ধান্ত করে ও ১৮৮৩ সালে ১লা মার্চ তাদের মৃত্যু হয়। ঠিক তার কয়েকদিন পরেই বার্লিনের অভিজাত সমাজের লোকেরা রাজকীয় উৎসবে অসংখ্য টাকা উড়িয়েছে। আধুনিক সমাজে এইরূপ বৈষম্যই চলছে, তবুও যাহোক আমরা কিন্তু "বিশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ" অবস্থার মধ্যেই বাস করছি।

যে তাঁদের কলকারখানায় আমদের এইসব যোগ্য ও সস্তা মজুরদের—কারণ ভয়েগল্যাণ্ডের শ্রমিকরা পরিশ্রমী ও অল্পেই সন্তুষ্ট হয়—কাজ দেওয়া যায় কিনা।”

বর্তমান অবস্থার এই একটি চিত্র। এ চিত্র খুবই দুঃখের। কিন্তু এ রকম আরো শত শত উদাহরণ রয়েছে। ভয়েগল্যাণ্ডের পরিশ্রমী ও “অল্পে সন্তুষ্ট” হওয়া শ্রমিকদের যদি মালিকরা কাজ দেয় তবে অন্য শ্রমিকরা আবার বেকার হয়ে যাবে। এ হল এক “ভিসিয়াস সার্কেল” বিশেষ।

সামাজিক অবস্থার সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে নানারকমের সামাজিক অপরাধের বৃদ্ধির কারণ। এ সমাজ তার মুখটা উটের মতো বালুর মধ্যে গুঁজে রেখে সত্যকে গোপন রাখে। নিজের ও অন্যের বিবেককে চাপা দিয়ে রাখে। মিথ্যে প্রতারণা করে বোঝাতে চায় যে শ্রমিকদের মধ্যে আলস্য, আমোদপ্রিয়তা ও ধর্মবিশ্বাসের অভাবই তাদের দুরবস্থার কারণ। এ হল ন্যক্কারজনক প্রতারণা। কিন্তু তার উপর খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া হয় না। সমাজের অবস্থা যত খারাপের দিকে যায়. অপরাধের সংখ্যা ও গভীরতাও ততই বাড়তে থাকে। অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম তখন হিংস্ররূপ ধারণ করে। মানুষ আদিম হিংস্রতায় পরস্পরকে শত্রু বলে আক্রমণ করতে থাকে। হৃদ্যতার বন্ধন শিথিল হতে থাকে।*

শাসকশ্রেণীগুলি এসব কারণগুলিকে স্বীকার করে না বা মানতে চায় না। যারা এই অবস্থার শিকার হয়, তাদের উপর জোর খাটিয়ে অবস্থার পরিবর্তন করতে চায়। আর এমনকি যাদের আমরা বেশ আলোকপ্রাপ্ত ও সংস্কারপ্রাপ্ত ও সংস্কার মুক্ত বলে মনে করি, তারাও এই ব্যবস্থাকে সমর্থন করে থাকে। যেমন অধ্যাপক হ্যাকেল (Hackel) এর মতো** লোক মৃত্যুদণ্ডের নিষ্ঠুর প্রয়োগকে সমর্থন করেন এবং যে সমস্ত অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে তিনি অনেক বিষয়ে তীব্র বিরোধিতা করেন, তাদের সঙ্গে পর্যন্ত এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন। তাঁর মতে চরম অপরাধীদের একেবারে আগাছার মতো উপড়ে নির্মূল করে দেওয়া

---

* এমনকি প্লেটো পর্যন্ত এ ধরনের জিনিসের ফলাফল কি হবে তা বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি লিখেছেন: “শ্রেণী বিভক্ত হলে রাষ্ট্র আর একটি থাকে না, দুটি হয়ে যায়। গরীবরা হয় একটা রাষ্ট্র, ধনীরা আর একটা, আর উভয়ে পাশাপাশি থেকে পরস্পরের অবস্থা দেখতে থাকে। শেষ পর্যন্ত শাসক শ্রেণী লড়াই করতে পারেনা, কারণ লড়াইয়ের জন্য তাদের প্রয়োজন জনগণের, যে জনগণের হাতে অস্ত্র দিলে তাদের ওরা শত্রুর চেয়েও বেশি ভয় করতে থাকে।” (প্লেটো: ‘রিপাবলিক’)। এবং এ্যারিস্টটল বলেছেন: “ব্যাপক দারিদ্র্য থেকে অসুবিধার সৃষ্টি হয়, কারণ তখন তাদের মধ্যে-বিক্ষোভ দেখা দেবেই”—(এ্যারিস্টটল, ‘পলিটিক্স’)।

** Naturliche Schpfungsgeschichte—(Natural History of Creation) Fourth revised edition, Berlin, 1873, PP 155-6.

দরকার যাতে অন্য মূল্যবান চারাগুলো আলো বাতাস মৃত্তিকার সৌজন্যে বেড়ে উঠতে পারে। অধ্যাপক হ্যাকেল যদি শুধু প্রকৃতি বিজ্ঞানের মধ্যে তাঁর জ্ঞান সীমাবদ্ধ না রেখে একটু সমাজ বিজ্ঞানও অধ্যয়ন করতেন তবে তিনি দেখতে পেতেন যে জীবনধারণের অনুকূল পরিবেশ পেলে ঐ সব অপরাধীরাও সমাজের মূল্যবান সত্যে পরিণত হতে পারত। তিনি দেখতে পেতেন যে অপরাধীদের নিধন করে অপরাধকে নির্মূল করা যায় না। আবার নতুন করে অপরাধীর সংখ্যা গজায়। ঠিক যেমন জমির ভিতরে আগাছার মূল ও বীজ থেকে গেলে উপর উপর আগাছাকে কেটে ফেলে জমিকে আগাছামুক্ত করা যায় না। প্রকৃতিকে সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিকর বীজানু থেকে মুক্ত করা মানুষের সাধ্যের বাইবে, কিন্তু সমস্ত মানুষ যাতে সমান সুখের সুবিধা পেতে পারে, একজনকে বঞ্চিত করে অন্যের স্বার্থসিদ্ধি করতে হয় না, এমন সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্টি করার ক্ষমতা নিশ্চয়ই মানুষের আছে। অপরাধের কারণগুলিকে খুঁজে বের করতে হবে। সেগুলিকে দূর করতে হবে। তবেই অপরাধের অবসান হবে।*

স্বভাবতই যারা অপরাধের কারণগুলিকে দূর করতে চায়, তারা নিষ্ঠুর দমন পীড়ন সমর্থন করতে পারে না। সমাজকে তার নিজের পদ্ধতি অনুসারে অপরাধ ঠেকাবার পথ থেকে তারা ফেরাতে পারে না বটে, তবে তারা চায় খুব তাড়াতাড়ি সমাজের আমূল সংস্কার হোক যাতে অপরাধের কারণগুলি দূর হয়ে যায়।

আমাদের সমাজের এই অবস্থার মূলে রয়েছে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা। যারাই উৎপাদন পদ্ধতির বড় বড় যন্ত্রগুলির মালিক, তারাই ছোট ছোট মালিকদের উপর বা যাদের কোনোই সম্পত্তি নাই তাদের উপর শাসন কায়েম করে। তারা বাজারের চাহিদা সরবরাহের নিয়ম অনুযায়ী মূল্য দিয়ে দুস্থ মানুষদের শ্রমশক্তি কিনে নেয়। এই শ্রমশক্তির মূল্য ওঠানামা করে, কখনো উৎপাদনের খরচের কম থাকে কখনো বেশি থাকে। শ্রমশক্তির দ্বারা উৎপাদনের বাড়তি মূল্য সুদ, পুঁজিপতিদের মুনাফা, বাড়িভাড়া ইত্যাদিরূপে মালিকের পকেটে যায়। শ্রমিকদের শোষণ করে মালিকরা যে বাড়তি মূল্য পেতে থাকে, ক্রমশঃ তা জমা হয়ে পুঁজিতে পরিণত হয়। মালিকরা আবার নতুন করে শ্রমিকদের কিনে নিতে থাকে, ক্রমশঃ তাদের শিল্প বেড়ে ওঠে, যন্ত্রপাতির উন্নতি হয়, শ্রমবিভাগ করতে পারে। এই-ভাবে বড় বড় পুঁজিপতিরা তাদের উৎপাদন ব্যবস্থাটাকে সুসংগঠিত করে ফেলে।

* এ বিষয়ে প্লেটো মন্তব্য করেছেন: "অপরাধের কারণ হল শিক্ষা-সংস্কৃতির অভাব ও রাষ্ট্রের অব্যবস্থা"। আমরা দেখতে পাই যে তেইশ শত বৎসর পূর্বে প্লেটো তাঁর বর্তমানের পণ্ডিত উত্তরাধিকারীদের চেয়ে সমাজের প্রকৃতি সম্বন্ধে বেশী বুঝতেন। এদের অভিনন্দন জানানো যায় না।

তারপর তারা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বীর যোদ্ধারা যেমন করে অস্ত্রহীন পদাতিক সৈনিকদের পরাস্ত করে, তেমনি করে ছোট ছোট মালিকদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে। এর ফলে সমাজটা ক্রমশঃ দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়—একদিকে মুষ্টিমেয় শক্তিশালী পুঁজিপতিরা, অন্যদিকে ব্যাপক দুঃস্থ জনগণ—যাদের মধ্যে পুরুষ ও নারী উভয়েই আছে—যাদের দৈনন্দিন জীবন ধারণের জন্য ঐ পুঁজিপতিদের কাছেই শ্রমশক্তি বিক্রয় করতে হয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীদের অবস্থাও ক্রমশঃ সঙ্গীন হয়ে পড়ে। ছোট ছোট ব্যবসাগুলো বড় পুঁজিপতিদের গ্রাসের মধ্যে গিয়ে পড়ে। ছোট ছোট কুটির শিল্পের কামার কুমোররা সব ক্রমশঃ দিন মজুরে পরিণত হতে থাকে। সমাজ বিজ্ঞানের নীতি অনুসারেই এই পরিণতি অবধারিতভাবে এগিয়ে চলে, এর হাত থেকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করাও বালখিল্য। ভাগ্যের এই পরিণতির হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য অনেকে যোগ্যতার উন্নতি বা সস্তা যন্ত্রপাতির কথা বলে থাকে, কিন্তু তার দ্বারা তাদের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবই প্রমাণিত হয়। মানুষের হাতের কাজের বদলে উন্নত যন্ত্রপাতি বসানো হয়। এই উন্নত যন্ত্রের সঙ্গে বাজারের প্রতিযোগিতায় ছোট ছোট শিল্পগুলি ধ্বংস হয়ে যায়। ১৮৮২ সালের ডিসেম্বরে মানচেনে ৪১৪টি ব্যবসা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে ঘোষণা করা হল, এবং চালু রইল মাত্র ৩১৫টি। অর্থাৎ একটি মাত্র শহরে এক মাসের মধ্যেই ৯৯টি প্রতিষ্ঠান উঠে গেল। ছোট ছোট শিল্পের অবস্থা এ থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে তাদের মালিকদের দশজনের মৃত্যুর হিসাব নিলে দেখা গেছে যে ৯ জনই দেউলিয়া হয়ে মারা গেছে। কিন্তু তাদের দেউলিয়া অবস্থার কথা কাগজে প্রকাশিত হয় না, কারণ তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না, তাতে কোনো লাভ নেই। এই কারণেই অনেক ছোট ছোট শিল্প মানুষের দৃষ্টির অগোচরেই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে!

তারপর যারাও বা পুঁজির গ্রাস থেকে কোনোমতে আত্মরক্ষা করতে পারছে, তারা আবার মাঝে মাঝেই অতিরিক্ত মজুত মালের সংকটে পড়ছে, বৃহৎ শিল্প-গুলির উৎপাদনের ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত উৎপাদন হতে থাকে। অন্ধভাবে উৎপাদন করেই চলে। তাই ঘন ঘন সংকট দেখা দেয়। ছোট ও মাঝারি শিল্পগুলি বৃহৎ বৃহৎ শিল্পের এই অতি উৎপাদনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে ওঠে না।

অতি উৎপাদনের কারণ হল এই যে প্রত্যেকটি জিনিসের উৎপাদন পরিকল্পনা মানুষের প্রকৃত চাহিদা ও প্রয়োজন অনুসারে নেওয়া হয় না। প্রথমতঃ ক্রেতারা সর্বত্র ছড়িয়ে থাকে, তাদের ক্রয় ক্ষমতা অনেকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এগুলি সব ব্যক্তিগতভাবে কোনো ব্যবসায়ীর মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ তার মতো আরো অনেক ব্যবসায়ী আছে। তারা সকলে যে কোন মালের কতটা

দ্রব্য উৎপাদন করছে তাও ব্যক্তিগতভাবে কোনো ব্যবসায়ীর পক্ষে অনুমান করা সম্ভব নয়। তারা প্রত্যেকেই যত রকমে পারে প্রতিযোগিতায় অন্যকে জড়াতে চেষ্টা করে। এই ভাবেই আমাদের সমস্ত উৎপাদনই ব্যক্তিগত মালিকদের বিচার বিবেচনা ও অনিশ্চিত অবস্থার উপর নির্ভর করে থাকে।

কিন্তু এই ধরনের ব্যবস্থার জন্য কখনো বা সুবিধা হয় কখনো আবার অসুবিধা হয়। প্রত্যেকটি ব্যক্তিগত মালিকের পক্ষে অন্ততঃ ন্যূনতম কিছু কিছু দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় না হলে তারা টিকে থাকতে পারে না। কিন্তু তারা চেষ্টা করে যায় ক্রমশঃ তাদের বিক্রয় বাড়াতে, যাতে তাদের মুনাফা বাড়ে, এবং ক্রমশঃ তাদের প্রতিযোগীদের ঘায়েল করে বাজার দখলের দিকে এগোতে পারে। সাময়িকভাবে তাদের বিক্রি ভালভাবে চলে ও বেড়েও যায়। মালিকরা তখন তাদের ব্যবসা বাড়াবার জন্য আরো চেষ্টা করে, উৎপাদন বাড়িয়ে চলে। কিন্তু এই সুদিন যখন আসে তখন কোনো একজন মালিকের আসে না, অনেকেরই আসে। সব ব্যবসাদাররাই তখন প্রতিযোগিতায় নেমে যায় ও উৎপাদন বাড়িয়ে চলে। তারপর হঠাৎ দেখা যায় যে উৎপাদনের পরিমাণ অতিরিক্ত হয়ে গেছে, মজুত মাল জমে গেছে। বিক্রি পড়ে যায়। দাম নেমে যায়। উৎপাদন ঢিলে হয়ে যায়। কোনো দিক থেকেই উৎপাদন কমানো মানে শ্রমিকদের সংখ্যা কমানো, মজুরি কমানো। আর যারা এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাদের ক্রয় ক্ষমতাও কমে যায়। ফলে অন্যান্য দিকের উৎপাদন ও বাজারের ক্ষেত্রে মন্দা দেখা দেয়। ছোট ছোট কারিগর, ব্যবসাদার, হোটেল-ওয়ালা, রুটি ব্যবসায়ী, মাংসের দোকানী প্রভৃতি সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কারণ যে শ্রমিকরা তাদের কাছ থেকে কেনাকাটা করে তাদের হাতে পয়সা থাকে না।

একটা শিল্প আর একটা শিল্পকে কাঁচা মাল সরবরাহ করে। একটার উপর একটা নির্ভর করে, তার ফলে একটাতে মন্দা দেখা দিলে অন্যটাতেও মন্দা দেখা দেয়। ক্রমশঃই যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ক্রমশঃই সংকট বেড়ে চলে। মজুত মাল প্রচুর জমে গেলে যন্ত্রপাতিগুলোও অকেজো হয়ে যায়। তারপর মজুত মাল জলের দামে ছাড়া হতে থাকে। সব মালিকরাই তখন উৎপাদন মূল্যের চেয়ে কম দামে বাজারে মজুত মাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। অতিরিক্ত উৎপাদনের সময় উৎপাদনের প্রণালীগুলির অনবরত উন্নতি হতে থাকে যাতে বাজারের প্রতিযোগিতায় দাঁড়ানো যায়, আবার তারই ফলে নতুন করে অতিরিক্ত মজুতমাল জমা হতে থাকে, এই প্রতিযোগিতার ফলে যে কোনো মূল্যে বাইরে জিনিস ছেড়ে, ছোট ছোট কারিগর ব্যবসায়ীদের ধ্বংস করে, উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত করে। এক সময় আবার ধীরে ধীরে সমাজে একটু একটু করে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসতে দেখা যায়। চাহিদা বাড়তে থাকে, এরপর উৎপাদন বাড়তে থাকে। আবার সেই পুরানো অবস্থা ফিরে আসে। সংকট দেখা দেয়। সব ব্যবসায়ীরাই

সংকটের হাত থেকে বাঁচতে চেষ্টা করে। কিন্তু ঐ একই নিয়মে সংকট আরো বেড়ে চলে। তারপর প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রও বেড়ে চলে। ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের মধ্যেই শুধু প্রতিযোগিতা সীমাবদ্ধ থাকে না, সমস্ত দেশের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়ে। বাজার দখলের সংগ্রাম দেশের মধ্যে চলে। তারপর বিশ্বের বাজার দখল চলে, এ সংগ্রাম ক্রমশঃ উগ্র হয়ে ওঠে ও ক্ষতির পরিমাণও বিপুল হয়। আর দেখা যায় যে যখন একদিকে বিশাল পরিমাণে মজুত প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও খাদ্য সামগ্রী জমে উঠেছে, তখন ব্যাপক জনগণের অভাব অনটন ক্ষুধায় কষ্ট পাচ্ছে।

এইরূপ অবস্থায় অধিকাংশ ব্যবসাদাররাই তাদের নিজেদের কথা বলে থাকে ঃ "আমাদের প্রতিযোগীদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। তাদের মধ্যে অর্ধেকের ধ্বংস হয়ে যাওয়া দরকার, যাতে বাকী অর্ধেক বাঁচতে পারে"। এই বলে প্রত্যেক ব্যবসায়ী ধার্মিক খৃষ্টানের মতো মনে করে যে তার প্রতিদ্বন্দ্বী থেকে যাবে ও সে নিজে বেঁচে যাবে। সংবাদপত্রের মন্তব্যগুলো থেকেও এই চিত্র বোঝা যায়। ইউরোপের সুতাকলের কথাই ধরা যাক। সেখানে অন্ততঃ দেড় কোটি সুতাকল আছে, তার অনেকগুলোই ধ্বংস না হয়ে গেলে বাকী বাঁচতে পারে না। আর লোহা ও কয়লার কারখানা যে-কটা ভালভাবে দাঁড়ানো সম্ভব তার চেয়ে দ্বিগুণ সংখ্যক হয়ে গেছে। এদের কথা অনুযায়ী আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য উৎপাদন মজুত মাল সবই অতিরিক্ত হয়ে গেছে। অথচ সকলেই অভাবের অভিযোগ করে। এর থেকেই কি দেখা যায় না যে আমাদের সমাজব্যবস্থার গুরুতর ত্রুটি রয়েছে? যখন মানুষের প্রয়োজন যথেষ্ট রয়েছে, অভাব যথেষ্ট রয়েছে, তখন অতি-উৎপাদনের প্রশ্ন কেমন করে আসে? স্পষ্টই বোঝা যায় যে এইরূপ দুর্বিসহ পরস্পর বিরোধী অবস্থার জন্য দায়ী কোনো উৎপাদন নয়—দায়ী উৎপাদনের পদ্ধতি. এবং তারও চেয়ে দায়ী উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর বিলি ব্যবস্থা।

* * *

মানব সমাজে প্রত্যেকটি ব্যক্তি পরস্পরের সঙ্গে হাজারো সূত্রে আবদ্ধ থাকে। দেশের সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই যোগসূত্রগুলি বেড়ে চলে। একটা বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে সমাজের সমস্ত মানুষেরই গায়ে লাগে। বর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থা ও দ্রব্যসামগ্রীর বিলিব্যবস্থা ও তার ব্যবহার যেভাবে হয় সেগুলি সব পরস্পরের সঙ্গে জড়িত। আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় ক্রমশঃই মুষ্টিমেয় মালিকের হাতে সমস্ত শিল্প জড় হতে থাকে, ছোট ছোট শিল্প নষ্ট হয়ে যায় এবং অল্প সংখ্যক বৃহৎ বৃহৎ শিল্প বেড়ে ওঠে। আর বিলি ব্যবস্থায় ঠিক উল্টো হয়। ব্যবসায় বাজারে প্রতিযোগিতায় যে সব ছোট ছোট ব্যবসাদার হেরে যায় তাদের দশজনের মধ্যে নয় জনই চেষ্টা করে বড় ব্যবসাদার ও ক্রেতাদের মাঝখানে ঢুকে পড়ে সেই দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে বিক্রি করার একটা ব্যবসা ফেঁদে নিজে-

দের অস্তিত্ব কোনোমতে রক্ষা করবার। এই কারণেই নানা রকম ঠিকেদার, এজেণ্ট, দোকানদার, ফড়ে, দালাল, ফেরিওয়ালা প্রভৃতির সংখ্যা অসম্ভব বেড়ে যায়। এদের মধ্যে অনেক ছোট ছোট দোকানের মালিক প্রভৃতি মহিলাও থাকে, যাদের অবস্থা খুবই শোচনীয় দেখায়। অনেকেই নেহাৎ আত্মরক্ষা করার জন্য মানুষের সবচেয়ে ইতর প্রবৃত্তি নিয়েও ব্যবসা শুরু করে। তাই মানুষের যৌন কামনা উদ্রেক করার জন্য অশ্লীল বিজ্ঞাপন দেওয়ার মতো ন্যক্কারজনক ব্যবস্থাও রয়েছে।

একথা অস্বীকার করা যায় না যে আধুনিক সমাজে ভোগবিলাসের আকাঙ্ক্ষা অনেক বেড়ে গেছে। সকলেই জীবনের প্রয়োজনগুলি পূর্ণ করার পরিতৃপ্তি লাভ করতে চায়। মানুষ ভাবতে শুরু করেছে যে সকলেরই ভালভাবে খেয়ে পরে বেঁচে থাকবার অধিকার আছে, এবং সামাজিক জীবনের মান উন্নয়ন করতে চায়। কিন্তু সমাজে ধন সম্পদ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আভিজাত্যও বেড়ে গেছে। পূর্বের যে কোনো সময়ের থেকে এখন ধনী দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য অনেক বেশি। অপর দিকে চিন্তাধারা ও আইন কানুনের দিক থেকে সমাজ অনেকটা গণতান্ত্রিক হয়েছে।* জনগণ শুধু আনুষ্ঠানিক দাবি হিসাবেই নয়, বাস্তব ক্ষেত্রেই অধিকতর সমান অধিকার চায়। আর তাই সব দিক না বুঝে শুনেই সাধারণ মানুষ অভিজাত শ্রেণীর মানুষদের নকল করতে থাকে, নানা রকম আমোদ ফুর্তি করতে থাকে। হাজারো রকমের প্রলোভনে তারা পড়ে, আর কুফল সর্বত্রই দেখা যায়। মানুষের সাধারণ প্রবৃত্তির চরিতার্থ করার ন্যায্য অধিকার আছে। কিন্তু পরিস্থিতি অনুযায়ী তার জন্য অনেক সমস্যা ও অপরাধ দেখা দেয়। আর শাসক-শ্রেণী তখন সে সব বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে তাদের সুবিধা মতো পথ নেয়, কারণ তা না হলে তাদের নিজেদেরই বিপদে পড়তে হয়।

দালালদের সংখ্যাও প্রতিদিনই বেড়েই চলেছে ও তার থেকে আরো ক্ষতি হচ্ছে। যদিও এই শ্রেণীর লোকেদেরও অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয় ও কঠিন জীবন যাপন করতে হয়, তবুও তারা এক শ্রেণীর পরগাছাই। তাদের কাজকর্ম উৎপাদনশীল নয়, আর তারাও পুঁজিপতিদের মতোই অন্যের শ্রমের উৎপাদনের উপর নির্ভর করে জীবন কাটায়।

অবশ্যম্ভাবী রূপেই অন্নবস্ত্রের মূল্য অত্যধিক বেড়ে যেতে থাকে। ক্রেতা দের কাছ থেকে উৎপাদকরা দ্বিগুণ বা তিনগুণ দাম আদায় করার চেষ্টা করে।**

* অধ্যাপক এ্যাডলফ ওয়াগনার (Prof. Adolf Wagner) এই একই মতামত প্রকাশ করেছেন তাঁর "Rau's Lehrbuch der Politichen O Ekonomic" (Handbook of Political Economy) পুস্তকের নূতন সংস্করণে। এই পুস্তকের ৩৬১ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন: "সামাজিক প্রশ্নে অর্থনৈতিক বিকাশের ও সাম্য ও স্বাধীনতার নীতি অনুযায়ী সামাজিক বিকাশের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব রয়েছে তা সকলেই স্বীকার করে থাকেন।"

** ডা: ই সাচ (Dr. E. Sachs) তাঁর Die Hous industries in Thuringen

আর তারপর যখন কোনোমতেই আর দাম বাড়ানো সম্ভব না হয়, তখন দেখা দেয় মন্দা, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যে ভেজাল দেওয়ার কারবার, মাপে ও ওজনের কারচুপি—মুনাফা ঘটাবার এই সব পন্থা।* এইভাবেই সর্বদা প্রতারণা ঠিক পতিতাবৃত্তির মতোই একটা সামাজিক বিধিতে দাঁড়িয়ে যায়। তারপর রাষ্ট্রের কতগুলি নিয়মকানুন, যেমন অত্যধিক পরোক্ষ কর, অর্থকর প্রভৃতি সেগুলিকে বাড়িয়ে দেয়। খাদ্যে ভেজালের বিরুদ্ধে কোনো আইনই কোনো কাজে লাগে না। প্রথমতঃ কড়াকড়ি নিয়মের ফলে ভেজালকারীরা আরো ধূর্ত হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়তঃ বর্তমান অবস্থায় ভেজালের বিরুদ্ধে কড়াকড়ি নজর রাখাও সম্ভব হয় না। শঠতা ও প্রতারণার জালের সংগে শাসকশ্রেণী জড়িত থাকে। সেই জন্যই ভেজালের বিরুদ্ধে সব আনুষ্ঠানিক বিধি ব্যবস্থাগুলি কার্যকরী হতে পারে না। আর যদি কখনো ভেজালের বিরুদ্ধে প্রকৃতই ব্যবস্থা নেওয়া হয় তাহলে ভেজালহীন দ্রব্যগুলির দাম অস্বাভাবিক বেড়ে যায়, কারণ একমাত্র ভেজাল দেওয়ার ফলেই সেই সব জিনিসগুলির দাম কমানো সম্ভব হয়ে থাকে।

সমবার সমিতিগুলি কোনো কাজের হয় না। সেগুলির পরিচালনা ব্যবস্থা সাধারণতঃ খুব খারাপ। আর সেগুলির দ্বারা যাদের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণী, তাদের কোনো উপকারই হয় না। তথাকথিত গৃহিনীদের সংস্থাগুলিও নির্ভেজাল সস্তা জিনিস দেবার জন্য যে অনেক পরিমাণে জিনিস ক্রয় করে থাকে, তাও কখনও কখনও ঠিক ঐ এক রকমই হয়ে থাকে। এর থেকে শুধু এইটুকু বোঝা যায় যে বহুসংখ্যক মহিলারা মনে করছেন যে ব্যবসাদাররা খুব ক্ষতি করছে। নিশ্চিতই বলা যায় যে আদর্শ সমাজ ব্যবস্থায় ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রী যথাসম্ভব সোজাসুজিই জনগণের কাছে পৌঁছবে। তার পরবর্তী

(Domestic Industry in Thringen)-য়ে লিখেছেন যে ১৮৮৯ সালে ২৪·৪ কোটি শ্লেট পেনসিল বানাতে খরচ পড়েছিল ১২২,০০০ থেকে ২০০,০০০ ক্লরিন (১০,৩৭০ থেকে ১৭০০০ পাউণ্ড), কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেগুলি বিক্রি করে পাওয়া গিয়েছিল ১,২০০,০০০ ক্লরিন, অর্থাৎ অন্ততঃ ছয় গুণ লাভ হয়েছিল।

* রাসায়নিক কেভেলার (Chevalier) বলেছেন যে খাদ্যদ্রব্যে যত রকমের ভেজাল দেওয়া হয়ে থাকে তার মধ্যে তাঁর জানা আছে কফিতে ৩২ রকমের, মদের জন্য ৩০ রকমের, চকলেটের ২৮ রকমের, ময়দার ২৪ রকমের, ব্রাণ্ডির ২৩ রকমের, রুটির ২০ রকমের, দুধের ১৯ রকমের, মাখনের ১০ রকমের, অলিভ অয়েলের ১৯ রকমের, চিনির জন্য ৬ রকমের ভেজাল ইত্যাদি ইত্যাদি। ১৮৭০ সালে ওয়েস্ট চেম্বার অব কমার্স-এর রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে ছোট ছোট দোকানে ওজনের ফাঁকির কারবার চলে। তারা এক পাউণ্ডে ৩০ আউন্সের জায়গায় ২৪ বা ২৬ আউন্স দিয়ে থাকে, এবং সেভাবেই তারা দাম কমিয়েও দ্বিগুণ লাভ করে থাকে। শ্রমজীবী গরিব মানুষ যারা বাকিতে কিনতে বাধ্য হয়, তারা এই ফাঁকি চোখের সামনে দেখেও কিছু বলতে পারে না। রুটির কারবারীদের মধ্যে এই ওজনে ফাঁকি দেওয়া ও ভেজাল দেওয়ার কাজ খুব বেশি চলে।

ধাপে শুধু সর্বসাধারণের জন্য জিনিসপত্র সোজাসুজি ক্রয় করা হবে তাই নয়, তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলি ব্যাপকভাবে উৎপাদনও করা হবে।

* * *

উপরোক্ত সমালোচনাগুলি শুধু শিল্প বাণিজ্যের বিষয়েই করা হল। কৃষি ব্যবস্থার বিষয়ে বলা হয়নি। কৃষিক্ষেত্রেও আধুনিক সমাজের প্রভাব পড়েছে। ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে যে সংকট দেখা দিয়েছে তার প্রভাব শহর ও গ্রাম উভয় ক্ষেত্রেই পড়েছে। কৃষকদের পরিবারের অনেকেই আংশিকভাবে অথবা সম্পূর্ণভাবেই ব্যবসায়ে বা কলকারখানায় কাজ করে। এই ধরনের কাজ ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে। বড় বড় জমির মালিকরা তাদের নিজেদের লাভের জন্যই কৃষিজাত দ্রব্যের একটি বড় অংশকে শিল্পজাত দ্রব্যে পরিণত করে। প্রথমতঃ তারা কাঁচা-মালগুলিকে অনেক দূরে নিয়ে যাবার খরচ বাঁচায়। যেমন, আলু থেকে স্পিরিট, বিটরুট থেকে চিনি, শস্য থেকে ময়দা বা ব্রান্ডি বা মদ ইত্যাদি বানায়। দ্বিতীয়তঃ শহর বা শিল্প নগরগুলি থেকে গ্রামাঞ্চলে কম মজুরিতে শ্রমিক পাওয়া যায়। শহর বা শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকদের থেকে তাদের উপর কর্তৃত্ব করাও মালিকদের পক্ষে সোজা হয়। কারখানার ভাড়া, সুদ ও করের হার কম থাকে। গ্রামাঞ্চলের জমির মালিকরাই একাধারে আইন কানুন তৈরীর ও প্রয়োগেরও কর্তা থাকে। পুলিসও তাদের হাতেই থাকে। এজন্যই গ্রামাঞ্চলে বছর বছর কারখানাগুলি বেড়ে উঠেছে, এবং কৃষি ও শিল্পের সংগে সম্বন্ধ অনেক ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। আর বর্তমানে এই পরিবর্তন থেকে লাভ করছে বড় বড় জমির মালিকরা।

এইভাবে বড় বড় জমির মালিকরা যখন তাদের লাভের অঙ্ক বাড়াতে থাকে, তাদের প্রতিবেশী ছোট ছোট জমির মালিকদের সম্পত্তির উপর তাদের লোভ বাড়তে থাকে। ছোট ছোট কুটির শিল্পগুলিকে যেমন ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা নষ্ট করে দেয়, ঠিক তেমনিই ছোট ছোট জমির মালিকদের বড় বড় জমির মালিকরা ক্ষতিগ্রস্ত করে।

তদুপরি আমাদের এই সুদূর অঞ্চল পর্যন্ত সভ্যতার অগ্রগতির ছোঁয়া লেগেছে। আমরা আগেই বলেছি যে যখন একজন চাষীর ছেলে তার গ্রাম ছেড়ে সুদূর শহরে বা ব্যারাকে তিন বছর কাটিয়ে আসে, যেখানকার নৈতিক আবহাওয়া মোটেই ভাল না, সে তখন প্রায়ই সংগে নিয়ে আসে যৌন ব্যাধি এবং তা সে গ্রামের মধ্যে ছড়ায়। সংগে সংগে আবার সে নিয়ে আসে নতুন নতুন চিন্তাধারা, সভ্যসমাজের নতুন প্রয়োজন বোধ তার হয়, সেগুলি পূরণ করবার জন্যও সে যথাসাধ্য চেষ্টা করে থাকে। যানবাহনের উন্নতি ও ব্যাপকতাও সভ্যতার বিস্তৃতির অন্যতম কারণ। গ্রামের লোকেরা বহির্বিশ্বের কথা জানতে পারে ও নতুন নতুন ধ্যানধারণার সংগে পরিচিত হয়। তারপর আবার কৃষকরা সরকারী করের বোঝা

অনুভব করতে থাকে। যেমন ১৮৪৯ সালে প্রাশিয়ার গ্রামাঞ্চলে যে সাম্প্রদায়িক কর ছিল ৮,৪০০,০০০ 'থ্যালার' (১,২৬০,০০০ পাউন্ড), ১৮৬৭ সালে তা বেড়ে হয়েছে ১১৮,০০০ 'থ্যালার' (৩,৪৬৬,৫০০ পাউন্ড)। ঐ সময়ের মধ্যে শহর ও গ্রামের জেলা ও অঞ্চলগুলির থেকে মোট করের বোঝা বেড়েছে ১৬,০০০,০০০ 'থ্যালার' থেকে ৪৬,০০০,০০০ 'থ্যালার' (২,৪০০,০০০ পাউন্ড থেকে ৬,৯০০,০০০ পাউন্ড)। স্থানীয় ব্যয়ের গড়পড়তা বৃদ্ধি হয়েছে মাথাপিছু ২'৯৬ মার্ক (২ শিলিং ১১¼ পেন্স) থেকে ৭'০৫ মার্ক (৭ শিলিং ১ পেন্স) আর তারপর থেকে এই ব্যয় রীতিমত বেড়েই চলেছে।

একথা ঠিক যে এই সময়ের মধ্যে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যও বেশ বেড়েছে, কিন্তু তার তুলনায় সুদ ও করের হার বেড়েছে অনেক বেশি। তদুপরি, শহরে যে দামে চাষীর জিনিস বিক্রি হয়, সে-দাম সে পায় না, প্রকৃতপক্ষে বড় বড় জমির মালিকদের চেয়ে সে অনেক কম দাম পায়। যে সব ব্যাপারীরা বিশেষ বিশেষ দিনে বা বিশেষ বিশেষ মরশুমে শহরে মালপত্র বিক্রির জন্য নিয়ে যায়, তারাও তাদের মুনাফা রাখে। বড় বড় জমির মালিকদের চেয়ে ছোট ছোট চাষীদের অল্প পরিমাণে বিক্রির জন্য জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়াও অনেক অসুবিধা। এইসব নানা কারণে চাষী তার ন্যায্য মূল্য পায় না। চাষী তার চাষের উন্নতির জন্য আবার তার জমির একাংশ বন্ধকী দিয়ে দেয়। জমি বন্ধকী কার কাছে দেবে তা বাছবারও বিশেষ সুযোগ সে চাষীর কাছে থাকে না। ধার শোধ দেবার নির্দিষ্ট সময় ও চড়া সুদের হারের জন্য চাষীকে সর্বদাই উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটাতে হয়। একবার যদি চাষ ভাল না হয় বা তার আশানুরূপ যখন না হয় তবে তাকে একেবারেই ধ্বংসের মুখে পড়তে হয়। প্রায়ই দেখা যায় যে একই লোকের কাছে ঋণের জন্য চাষীকে বারবার শরণাপন্ন হতে হয়। সমস্ত গ্রামের ছোট ছোট চাষীদের মাত্র কয়েকজন মুষ্টিমেয় উত্তমর্ণের উপর নির্ভর করতে হয়—যেমন দক্ষিণ জার্মানীর বড় বড় শস্য আঙুর বা তামাকের উৎপাদকদের উপর বা রাইনের তরিতরকারী উৎপাদকদের উপর। জমিজমা বন্ধক দেবার পর চাষীরা প্রকৃতপক্ষে তাদের অধিকার হারিয়ে নামে মাত্র তার মালিক থাকে। ধনতান্ত্রিক রক্তশোষকরা চাষীদের হাত থেকে জমি একেবারে নিয়ে নিজেরা চাষ করা বা বিক্রি করার চেয়ে এইভাবে বন্ধকী নিয়ে তাদের শোষণ করাটাকেই বেশি লাভজনক মনে করে। এইভাবে সরকারী হিসাবের খাতায় হাজার হাজার জমির মালিকের নাম লেখা থাকলেও তারা আর প্রকৃতপক্ষে মালিক থাকতে পারে না। এ কথাও ঠিক যে অনেক বড় বড় জমির মালিকও, যারা তাদের ব্যবসা ঠিক বুঝতে পারে না, তারাও পর্যন্ত রক্তপিপাসু পুঁজিপতিদের শিকার হয়ে যায়। পুঁজিপতিরা জমি মালিক হয়ে বসে। জমিগুলোকে ছোট ছোট প্লটে ভাগ করে দেয়। তাতে

তাদের লাভ হয় দ্বিগুণ। কারণ একটা বড় জমির থেকে ছোট খণ্ড খণ্ড জমি থেকে তাদের লাভ হয় বেশি। ঠিক তেমনিই শহরের বাড়িগুলিতে ছোট ছোট অনেকগুলি ভাড়াটে বসালে তারা অনেক বেশি ভাড়া পায়। সব সময়েই কিছু কিছু ছোট মালিকও এর সুযোগ নিয়ে থাকে। লাভকারী পুঁজিপতি চাষীদের অল্প কিছু টাকা শোধ দিলেই তাদের জমি চাষ করতে ফিরিয়ে দেয়, বন্ধকীর বাকী টাকাটা ক্রমশঃ ক্রমশঃ আদায় করে। এই হল তাদের লেনদেনের রহস্য। যদি কোনো ছোট জমির মালিক সৌভাগ্যক্রমে ভাল ফসল ফলাতে পারে বা কখনো অন্য কারো কাছ থেকে অল্প সুদে টাকা ধার পেতে পারে, সে হয়তো কোনো-ক্রমে বেঁচে যায়, নইলে তার ভাগ্যেও ঐ দুর্দশা হয়ে থাকে।

ভেড়া বা গরু মারা গেলেও তাদের প্রচণ্ড ক্ষতি হয়ে থাকে। মেয়ের বিয়ে হলে দেনা বাড়ে, তাছাড়া সস্তায় খাটাবার দাসীও চলে যায়। যদি ছেলের বিয়ে হয়, তবে সে তার নিজের জমি দাবি করে। জমির কোনো উন্নতিই সম্ভব হয় না। গরু ভেড়াগুলো যদি যথেষ্ট সার উৎপাদন না করে তবে ফসল খারাপ হয়। সার কেনার ক্ষমতা তার নেই। ভাল বীজও কেনার ক্ষমতা তার নেই। চাষের কাজে যন্ত্র ব্যবহারের ক্ষমতা তার নেই। জমির অবস্থা অনুযায়ী নতুন নতুন ফসল বোনা প্রায়ই তার সাধ্যের বাইরে থাকে। বিজ্ঞান ও গবেষণার ফলে পশুদের উন্নতির যে সব ব্যবস্থা বলা হয়ে থাকে তার সুবিধাও সে নিতে পারে না। পশুর খাদ্য, আস্তানা ও উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা কিছুই সে করে উঠতে পারে না। মাঝারি ও গরিব চাষীরা ক্রমশঃ দেনায় ডুবে যায়, বৃহৎ বৃহৎ জমির মালিকরা তাদের শোষণ করতে করতে ক্রমশঃ একেবারে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়।

অনেকে অঙ্কের হিসাব দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে জমি মুষ্টিমেয় লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে না, বরং বহু লোকের হাতে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে কথা আসলে ঠিক নয়। প্রথমত, দেখা গেছে যে যাদের হাত থেকে জমি হাতছাড়া হয়ে গেছে, তাদের নাম মালিক হিসাবেই রেজিষ্ট্রি করা আছে। তাছাড়া জনসংখ্যার বৃদ্ধি, এবং মালিকের মৃত্যুর ফলে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে জমি ভাগ ভাগ হয়ে যায়। এর থেকে একটা মালিকের সংখ্যার বৃদ্ধি দেখানো হয়। কিন্তু জমিগুলি টুকরো টুকরো হয়ে ভাগ হয়ে যাবার ফলেই আবার তার মালিকরা ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়। জমি যত বেশি ছোট ছোট টুকরো টুকরো হয়, তাই তার উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে ওঠে। ব্যবসা বাণিজ্যের স্বাধীনতা হবার থেকে বহু রকমের ছোট ছোট ব্যবসাদার হয়েছে, কিন্তু তাই বলে তাদের যে খুব উন্নতি হয়েছে তা নয়। বরং তাদের পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে বড় বড় পুঁজিপতিদের সুবিধে হয়ে যায়, তারা ছোট ছোট ব্যবসাদারদের গ্রাস করে ফেলে।

সুতরাং পূর্বে যেখানে একজন জমির মালিক ছিল, সেখানে যদি বর্তমানে দুই তিনজন মালিক হয়ে যায়, তাহলে যে তাদের অবস্থার উন্নতি হয় তা নয়। বরঞ্চ উল্টোটাই হয়ে থাকে বলে ধরে নেওয়া যায়। এই ভাবেই ছোট ছোট জমির মালিকরা দ্রুত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়। তদুপরি বড় বড় শহরের উপকণ্ঠে অনেক জায়গায় চাষের জমিগুলোকে টুকরো টুকরো করে উদ্যান বা বাড়ি তৈরীর জমিতে পরিণত করা হয়। এককভাবে কোনো কোনো জমির মালিকের পক্ষে এটা সুবিধাজনক হতে পারে, কিন্তু এই ধরনের পরিবর্তনে জনগণের পক্ষে কোনো সুবিধা হয় না। তারপর আবার এই ধরনের জমি মালিকদের হাত থেকে প্রায়ই ফাটকাবাজারী পুঁজিপতিদের হাতে চলে যায়।

একথা স্পষ্টই বোঝা যায় যে এই ধরনের বিধিব্যবস্থা গ্রামাঞ্চলের নারীদের জন্য কোনো সুবিধাই দেয় না। তাদের সামনে যে পথ খোলা থাকে তা হল স্বাধীন জমির মালিক বা গৃহিনীর পদ থেকে দাসীর পদে চলে যাওয়া অথবা ক্ষেতে বা কারখানায় সস্তা মজুরের কাজ করা। নারী হিসাবে তাদের শহরের চেয়ে, শহরের কারখানার চেয়ে এখানে প্রভুদের যৌন কামনার শিকার বেশি হতে হয়। যদিও সেখানেও এখন খ্রীষ্টান মধ্য ইউরোপের মধ্যেও 'টারকিশ হারেম' বা রক্ষিতালয় স্থাপন করার পদ্ধতি চালু হয়ে গেছে। আর শ্রমের উপর অধিকার প্রায়ই শ্রমিক নারীর দেহের উপর অধিকার পর্যন্ত বেড়ে যাচ্ছে। গ্রামাঞ্চলের নারীরা শহরের নারীদের চেয়ে অনেক বেশি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে। আইন আদালত তাদের মালিকদের বা তাদের সাকরেদদের পক্ষে থাকে, সংবাদ-পত্র বা জনমত তাদের কথা বলে না যে সেই নারীদের কেউ সহায় হয়ে দাঁড়াবে। আর শ্রমজীবী পুরুষরা নিজেরাই অত্যন্ত অবমাননাকর দাসত্বের মধ্যে থাকে। তাদের কাছে 'স্বর্গ বহু ঊর্ধ্বে আর জার অনেক দূরে'।

কিন্তু আমাদের সমগ্র সভ্যতার উন্নতির পক্ষে গ্রামাঞ্চলের ও কৃষির অবস্থার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি ; সর্বপ্রথম, সমস্ত মানুষই জমি ও তার উৎপাদনের উপর নির্ভর করে, জমিকে ইচ্ছামতো বাড়ানো যায় না। তাই সে জমিতে চাষবাসের কতখানি উন্নতি করা যায় আর তার থেকে কতখানি সুবিধা পাওয়া যায় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন খুবই বেশি। ইতিমধ্যেই আমরা এমন একটা অবস্থায় এসে পেঁছেছি যে প্রতি বছরই আমাদের বেশ কিছু রুটি ও মাংস বিদেশ থেকে আমদানী করতে হচ্ছে। ইতিমধ্যেই মূল্যবৃদ্ধি যেমন বেড়ে চলেছে, তাকেও ঠেকানো দরকার।

গ্রামাঞ্চলের কৃষিজীবী ও শিল্পপ্রধান নগরীর অধিবাসীদের মধ্যে পরস্পর বিরোধী স্বার্থ রয়েছে। শিল্পপ্রধান শহরের মানুষেরা চায় কম দামে খাদ্য সামগ্রী পেতে। শুধু শহরের অধিবাসীদের জন্যই নয়, ব্যবসা বাণিজ্যের জন্যও

এই চাহিদা থাকে। প্রত্যেক সময়েই খাদ্যসামগ্রীর দাম বাড়লেই জনসাধারণের বৃহৎ অংশের পুষ্টি কমে যায়, বা মজুরি কমে যায় আর তার ফলে শিল্পজাত দ্রব্য সামগ্রীর দামও এতো বেড়ে যায় যে বিদেশী ব্যবসাদারদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার ফলে তার দাম পড়ে যায়। চাষীদের ক্ষেত্রে আবার ঠিক অন্য একটা দিক আছে। শিল্পের মালিকরা যেমন তাদের কারখানা থেকে যতদূর সম্ভব মুনাফা বের করতে চায়, কৃষির ক্ষেত্রেও মালিকরা তেমনি তাদের জমি ও মজুরের থেকে যথাসম্ভব লাভ করতে চায়। আর যে জিনিস উৎপাদন করলে তার লাভ বেশি হয় সেই জিনিসই উৎপাদন করতে চায়। যদি বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য ও মাংস আমদানির ফলে তার খাদ্যশস্য ও মাংসের ব্যবসা থেকে লাভ কমে যায় তবে সে সেই খাদ্য-শস্য উৎপাদন ও মাংসের জন্য জীবজন্তু পালনের কাজ ছেড়ে দিয়ে, তার জমিতে যে জিনিসের চাষ করলে লাভের অংক বাড়বে সেই জিনিসের চাষ করবে। সে চিনি উৎপাদনের জন্য বীটরুট বুনবে, স্পিরিটের জন্য আলু ও রাইশস্য বুনবে, কিন্তু রুটির জন্য রাই বুনবে না। তার সবচেয়ে উর্বর জমিতে সে তরিতরকারী খাদ্যশস্য উৎপাদন করার বদলে সেখানে তামাক উৎপাদন করে থাকে। তারপর হাজার হাজার একর জমিকে ঘোড়া চরাবার জমিতে পরিণত করবে, কারণ ঘোড়া-গুলো সৈন্যবাহিনীর কাজে লাগে বলে তার থেকে লাভ বেশি হয়। এদিকে বিশাল চাষযোগ্য ভূখণ্ডে অভিজাত ভদ্রলোকদের শিকারের প্রমোদের জন্য জঙ্গল রেখে দেওয়া হয়। আশেপাশের জায়গায় বৃষ্টিপাতের ক্ষতি না করেই বহু বিস্তৃত ভূখণ্ড পরিষ্কার করে চাষের জমিতে পরিণত করা যায়।

সম্প্রতি বনবিভাগের গবেষণার যে ফল দেখা গেছে, তাতে আবহাওয়ায় আর্দ্রতার উপর অরণ্যের প্রভাবের কথা যত ফলাও করে বলা হয়ে থাকে তাতে সন্দেহ জাগিয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে সব অঞ্চলে শস্য ভাল জন্মায় না অথবা যে সমস্ত পার্বত্য অঞ্চলের চাষ আবাদের সুবিধার জন্য কিছু বন সংরক্ষণ করতে হয় যাতে অত্যধিক বেগে জলধারা না নেমে আসতে পারে কেবল সেই সমস্ত অঞ্চলেই বন রক্ষা করার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। যদি একথা সঠিক হয়, তবে জার্মানীতে এখনো বহু সহস্র বর্গ কিলোমিটার জমিকে ফলপ্রসু চাষের জমিতে পরিণত করা যায়। কিন্তু তা করা হয় না কারণ তাতে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের স্বার্থরক্ষা হয় না, ব, বড় বড় জমির মালিকদের শিকার ও আমোদ প্রমোদের ব্যাঘাত হয়।

নিম্নলিখিত তথ্য থেকে বিশেষ করে জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার অবস্থাটা বোঝা যাবে। ১৮৬১ সালে পুরাতন প্রাশিয়ার প্রদেশগুলির অবস্থা ছিল নিম্নরূপ :—

অথবা ততোধিক-

১৮২০৯ এস্টেট ঃ ৬০০	'মর্গেন' * এর	মোট=৪০,৯২১,৫৩৬ মর্গেন
১৫০৭৬ „ ঃ ৩০০-৬০০	„	মোট=৬,০৪৭,৩১৭ „
৩৯১,৫৮৬ „ ঃ ৩০-৩০০	„	মোট=৩৫,৯১৪,৮৮৯ „
৪২৪,৮৭১ „		৮২,৮৮৩,৭৪২

অপর পক্ষে ঃ

৬১৭,৩৭৪ এস্টেট ঃ	৫'৩০ 'মর্গেন' ঃ	মোট=৮,৪২৭,৪৭৯ মর্গেন
১০৯৯,১৬১ "	ঃ ৫ মর্গেনের কম	মোট=২,২২৭,৯৮১ "
১৭১৬,৫৩৫		১০,৬৫৫,৪৬০ "

সুতরাং দেখা যায় যে ৪২৪৮৭১ জন জমির মালিক-এর হাতে ছিল ১,৭১৬,৫৩৫ জন জমির মালিকের সম্পত্তির ৮ গুণের বেশি জমি।

এই হিসাবের মধ্যে ১,১৫৬,১৫০ মর্গেন বনভূমির মালিকানার হিসাব বাদ দেওয়া হয়েছে। আর ওয়েষ্টকেলিয়া প্রদেশের ১৪৩,৪৯৮টি শহর ও গ্রামের হিসাব এবং ২,৯৫০,৮৯০ মর্গেন এর হিসাবও বাদ দেওয়া হয়েছে। এই তথ্য চিত্র থেকে দেখা যায় এশিয়ার বড় বড় ও মাঝারি জমির মালিকদের সংখ্যা কত বেশি। সারা দেশের বেশির ভাগ জমিই তাদের হাতে। এই বিলি ব্যবস্থা ১৮৬৬ সালে সংশোধন করে বড় বড় ভূস্বামীদের পক্ষেই আরো সুবিধা করে দেওয়া হয়। ১৮৬৭ সালে হ্যানোভার প্রদেশে অন্ততঃ ১৩.১০০টি এস্টেট ছিল যার প্রত্যেকটিই ১২০ মর্গান এর বেশি। শুধু শ্লেসউইগ-হলস্টেন (Schleswig Holstein) এই ৩০০টি এস্টেটই ছিল যার মালিক ছিল অভিজাত পরিবারগুলি। এর মধ্যে ধনী কৃষকদের জমির হিসাব ধরা হয়নি। ১৮৬০-৭০ সালে স্যাকসনিতে (saxony) ২২৮,৩৬ বর্গমাইল** জমি ব্যক্তিগত মালিকদের হাতে ছিল। ৯৪২টি অভিজাত পরিবারের হাতে ছিল ৪৩'২৪ বর্গমাইল জমি, অর্থাৎ সমগ্র অঞ্চলের প্রায় এক পঞ্চমাংশ জমিই তাদের হাতে ছিল। এ হিসাবের মধ্যেও চাষীদের জমি ধরা হয় নাই। মেকলেনবার্গ-শেরইন (Mecklenburg-schwerin)-এর অবস্থা ছিল আরো খারাপ। ২৪৪ বর্গমাইল ভূমির মধ্যে জোতদার এবং সাতটি মঠের হাতে ছিল ১০৭'৭৮ বর্গমাইল, ৪০টি শহরাঞ্চল ও সরকারী জমির পরিমাণ ছিল ২৬'৪৫ বর্গমাইল। ১৫,৬৮৫ জন জমির মালিকদের মধ্যে (৬০০০ হাজারের উপর উত্তরাধিকার সূত্রে এবং ৬০০০ হাজারের উপর ঘরবাড়ির অধিবাসী), মাত্র ৬৩০ জনের স্বাধীন মালিকানা। বোহেমিয়াতে (Bohemia)

* প্রাশিয়ার এক 'মর্গেন'=৩৯১৭ হেক্টর।

** জার্মানীর ভূমি মাপের ১ মাইল=৭'৪ কিলোমিটার।

চার্চের হাতেই ১০৬,০০০ 'অক' * এর অধিক জমি আছে। আর ১২৬৯ জন বৃহৎ সামন্ততান্ত্রিক মালিকদের হাতে আছে ৩,০৫৮,০৮৮ 'অক' অর্থাৎ সমগ্র দেশের এক তৃতীয়াংশ ভূখণ্ড। তবুও তারা কিন্তু ভূমি কর বাবদ মাত্র ৪০ লক্ষ মুদ্রা দিয়ে থাকে যার মূল্য ১৪০ লক্ষ 'ফ্লোরিন' (১,১৯০,০০০ পাউন্ড)। অভিজাত পরিবারগুলির হাতে যে সব জমি আছে তার অর্ধেকেরও বেশি মাত্র ১৫০ জন মালিকের মধ্যে বিভক্ত। প্রিন্স সরেনবার্গ (Prince schwarzenberg) এর একারই রয়েছে ২৯১ বর্গ মাইল জমি। দেশের বনভূমির পরিমাপ হল ২৬০ বর্গমাইল, এবং ২০০ বর্গমাইল রয়েছে অভিজাত পরিবারগুলির হাতে। সেগুলি তাদের নাম করা উৎকৃষ্ট শিকারের ক্ষেত্র। অনুরূপ অবস্থাই দেখা যায় সাইলেসিয়া, পোল্যান্ড, প্রাশিয়া প্রদেশ প্রভৃতি জায়গায়। দলে দলে মানুষ দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে, বিশেষ করে বোহেমিয়া ও জার্মান প্রদেশ থেকে বাল্টিকে। এই লোকেরা বেশির ভাগই গরিব। আর এদিকে উর্বর জমি পড়ে থেকে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, কারণ সেই জমির মালিকরা সেগুলি হেলায় নষ্ট করছে। অন্য মালিকরা আবার চাষের কাজে মেসিন ব্যবহার করে মজুরদের ছাঁটাই করে দিচ্ছে, অথবা চাষের জমিকে চারণভূমিতে পরিণত করছে।

কৃষিক্ষেত্রে এবং শিল্পক্ষেত্রে কিভাবে মজুরদের কাজ যাচ্ছে তা ১৮৮১ সালের ব্রানসউইক কারখানা পরিদর্শকের রিপোর্ট থেকে দেখা যায়। এই রিপোর্টে দেখা হয়েছে যে চিনির উৎপাদন অনেক বেশি বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও শ্রমিকদের সংখ্যা কমে গেছে ৩০০০ হাজারেরও বেশি। এর কারণ কেবল মাত্র উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতি। কৃষিক্ষেত্রেও ঠিক এই অভিজ্ঞতাই দেখা যায়। ক্রমশঃ যন্ত্রপাতির অধিক ব্যবহার, ব্যাপক ক্ষেতমজুর একই শস্যের চাষের ব্যবস্থার দরুন মজুরদের কাজের সময় অনেক কম লাগে। ফলে ক্ষেত খামারের কাজের জন্য এবং পশুপালনের জন্য নেহাৎ যে কজন মজুরের প্রয়োজন তাদের রেখে বাকীদের মালিকরা ছাঁটাই করে দেয়। ফসল কাটার সময় দেশের সর্বত্র থেকে আবার দিন মজুরদের ডেকে আনা হয়, তারা সাময়িক কয়েকদিনের জন্য অত্যাধিক পরিশ্রম করে কাজ করে দেয় তারপর আবার তাদের ছাঁটাই করে দেওয়া হয়। এইভাবে ঠিক ইংলন্ডের মতই জার্মানীতেও একদল গ্রাম্য সর্বহারা সৃষ্টি হচ্ছে, যাদের অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয়। এই মজুররা যদি সাময়িক কাজের জন্য কিছু বেশি মজুরি চায় তা অবজ্ঞায় প্রত্যাখ্যান করা হয়। আর তারপর ছাঁটাই হয়ে যাবার পর তারা যখন ক্ষুধার্ত হয়ে কাজের খোঁজে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় তখন বলা হয় তারা ভবঘুরে, তাদের গালাগালি দেওয়া হয়, কুকুর দিয়ে বাড়ির সীমানা

---

* অস্ট্রিয়ার Joch (yoke)—০.৫৭ হেক্টর।

থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়, অলস কর্মবিমুখ বলে পুলিসে ধরিয়ে দেওয়া হয় ; এবং 'ওয়ার্ক হাউস' বা কর্মকুটিরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কি চমৎকার ব্যবস্থা !

কৃষিক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রয়োগের ফলে অন্য দিক দিয়ে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থারই সংকট দেখা দেয়। যেমন, আমাদের বহু জমির মালিক বহু বৎসর ধরে বীটরুট ও চিনি উৎপাদন করে প্রচুর লাভ করেছে। তাছাড়া, কর* আদায়ের ব্যবস্থার ফলেও তাদের পক্ষে শোষণ করবার সুবিধে হয়। এজন্য তারা বারবার এই পথ নিয়েছে। বহু শত সহস্র হেকটর শস্য ও আলু চাষের জমিকে তারা বীটরুট চাষের জমিতে পরিণত করেছে, সর্বত্র কারখানা খুলে দিয়েছে, আর এখনো খুলছে, আর তার ফলে এক সময় মজুদ বেড়ে যাবেই। তারপর আবার বীটরুটের চাষের জন্য জমির দাম বেড়ে যায়, ফলে অনেক ছোট ছোট জমির মালিককে প্রতিযোগিতার বাজারে জমি হারাতে হয়। এইভাবে জমিগুলি ভালভাল শিল্পপতিদের মুনাফার কাজে লাগানো হয়, আর শস্য ও আলু চাষের জন্য থাকে খারাপ জমিগুলি। ফলে ক্রমশঃই বাইরে থেকে খাদ্যদ্রব্য আমদানি বাড়তে থাকে, চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে সরবরাহ বাড়তে থাকে। বিদেশী জিনিসের আমদানি ক্রমেই প্রচুর বাড়তে থাকে, আমদানির খরচও কমিয়ে দেওয়া হয়। এই প্রতি-যোগিতার বাজারে দেশের মধ্যের ছোট ছোট জমির মালিকরা ধার দেনায় ডুবে গিয়ে নানা অসুবিধায় পড়ে আর টিকে থাকতে পারে না। তার পরবর্তী ধাপে বিদেশী দ্রব্যের উপর কর ধার্য করা হয়, যাতে ধনী চাষীদেরই লাভ হয়। ছোট ছোট চাষীদের কোনো লাভই হয় না। মুষ্টিমেয় মানুষের লাভ হয় আর বহু লোকের অবস্থার অবনতি হতে থাকে। তাদের জন্যও কোনো সুবিধাই হয় না। ক্রমশঃ বড় বড় জমির মালিকরা ছোট ছোট জমির মালিকদের কিনে নেয়। সাইলেথানিয়ান অস্ট্রিয়ায় (Cisleithanian Austria) ডালমাটিয়া ও ভোরালবার্গ বাদে (Dalmatia and Vorarlberg) ১৮৭৪ সালে ৪৭২০ গুলি জমি মালিকদের দেউলিয়া হয়ে যাবার দরুন বিক্রি হয়ে গেছে। ১৮৭৭ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৯৭৭, এবং ১৮৭৯ সালে আরও অনেক বেড়ে হয়ে যায় ১১,২৭২। এর মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগই ছিল খামার। ১৮৭৪ সালে সাইলেথানিয়ান অস্ট্রিয়ায় ৪৪১৩টি চাষীদের সম্পত্তি দেউলিয়া হয়ে যাবার দরুন বিক্রি হয়ে গেছে, যাদের প্রত্যেকের দেনার পরিমাণ ছিল গড়ে ৩১৩৬ ক্রোনর (২৬৬ পাউন্ড)। এই ভাবেই ১৮৭৮ সালে ১০১০টি সম্পত্তি বিক্রি হয়ে গেছে যেখানে চাষীদের প্রত্যেকের দেনার পরিমাণ ছিল গড়ে ৪২৯০ ক্রোনর (৩৭৪ পাউন্ড)। ১৮৭৪ সালে বন্ধক দেওয়া জমির মূল্য ছিল ৪,৬৭৯,৭৫৩ ক্রোনর (৫৯৭,৭৭৯ পাউন্ড) যা কিনা সমগ্র

* বাইরে রপ্তানীর জন্য যে চিনি বরাদ্দ করা হয় তার চেয়ে দেশের মধ্যে ব্যবহারের জন্য বরাদ্দ চিনির উপর শুল্ক ধরা হয় বেশী।

দেনার ৩৩'৮৭। ১৮৭৮ সালে এই ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২০, ৩৬৬,১৭৩ ক্লেরিন (১,৭৩১,১২৮ পাউন্ড) বা সমগ্র দেনার ৫২'২৭। হাঙ্গেরীতে ১৮৭৬ সালেই দেউলিয়া হয়ে যাবার জন্য চাষীরা অন্তত ১২,০০০টি জমি বিক্রি করে ফেলেছে। আর কৃষিজীবী জনসংখ্যা ১৮৭০ সালে যেখানে ছিল ৪,৪১৭, ৫৭৪ জন, সেখানে ১৮৮০ সালে সেই সংখ্যা নেমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৩.৬৯৯,১১৭ জনে, অর্থাৎ দশ বছরে এই সংখ্যা কমেছে ৭৪৮,৪৫৭ জন বা ১৭%। আর এ অবস্থা হয়েছে যখন ঠিক এই সময়ের মধ্যেই অনেক বেশি বিস্তীর্ণ জমিতে চাষ আবাদ করা হয়েছে। জমিগুলি বড় বড় ধনিক, পুঁজিপতিদের কাছে হস্তান্তরিত হয়ে গেছে। তারা জমিতে নিয়োগ করেছে মানুষের বদলে যন্ত্রকে, মানুষ হয়ে পড়েছে তখন অনাবশ্যক, অবস্থাটা ঠিক আয়র্ল্যান্ডের মতো।

১৮৮১ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারীর ব্যাভেরিয়ার সংসদের অর্থমন্ত্রীর রিপোর্টে দেখা গেছে যে ১৮৭৮ সালে ২৭,০০০ টাগওয়ার্কেন * এর ৬৯৮টি জমি নিলামে বিক্রি হয়ে যায়। অর্থাৎ এই জমিগুলিতে চাষ করে তার খরচ ওঠেনি। ১৮৮০ সালে ব্যাভেরিয়াতে নিলামে বিক্রির জমির সংখ্যা ছিল ৩৭২২টি, যার মধ্যে চাষযোগ্য জমি ছিল ৫০০০ হেকটার। এই অবস্থার মধ্যে বহু জমি পড়ে থাকে যেখানে চাষ করাই হয় না। যেমন দেখা যায় ব্যাভেরিয়াতে ১৮৭৯ সালে ৬৯৮টি জমি যার আয়তন ছিল মোট ৮০৪৩ হেক্টর আর ১৮৮০ সালে ৯৫৩টি জমি যার আয়তন ছিল মোট ৬০০০ হেকটর—সেগুলিতে একেবারেই চাষ করা হয়নি। একথা বলাই বাহুল্য যে বন্ধক দেওয়া জমিগুলির প্রতি মোটেই দৃষ্টি দেওয়া হয় না।

কিন্তু জমির মালিক তার জমি নিয়ে কি করবে না করবে তা তার নিজস্ব ব্যাপার, কারণ জমির উপর রয়েছে তার ব্যক্তিগত অধিকার—এই "পবিত্র" ব্যক্তিগত সম্পত্তির যুগে এই হল নিয়ম। সমাজ এবং কল্যাণের জন্য তার মাথা ব্যথা নেই। সে শুধু তার নিজের স্বার্থই দেখবে—সে রাস্তা পরিষ্কার রয়েছে। উৎপাদনকারীরাও ঠিক একই নিয়মে কাজ করে – যখন তারা অশ্লীল ছবি ও বই প্রকাশ করে, বা সমগ্র কারখানাই তৈরী করে খাদ্যে ভেজাল দেবার জন্য। এই ধরনের অনেক জায়গার কাজই সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক। তাতে নৈতিকতার অধঃপতন হয় ও দুর্নীতি পুষ্ট হয়। কিন্তু তাতে কি এসে যায়? উন্নত ছবি, বিজ্ঞান-সম্মত পুস্তক প্রকাশ করা, বা সৎভাবে ভেজালহীন খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করার চেয়ে এভাবেই তারা বেশী টাকা উপার্জন করতে পারে। উৎপাদনকারীরা টাকা করতে চায়, আর যতক্ষণ তারা পুলিশের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে চলতে পারে, ততক্ষণ তারা শান্তিতে তাদের অসৎ ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারে,

---

* টাগওয়ার্কেন = ২,৯০৫ হেক্টর।

আর একথাও তারা নিশ্চিতই জানে যে যেভাবেই হোক টাকা হলেই তারা সমাজে ঈর্ষা ও শ্রদ্ধার পাত্র হবে। ফাটকা বাজার ও ব্যবসাকেন্দ্রগুলোতেই আমাদের যুগের ধনদেবতার উপাসনার চরম অবস্থা দেখা যায়। কাঁচামাল, শিল্পজাত জিনিস, যানবাহন, রাজনৈতিক আবহাওয়া, প্রাচুর্যের অভাব, মারামারি, দুর্ঘটনা, সরকারী ঋণ, নতুন নতুন আবিষ্কার, স্বাস্থ্য, বিখ্যাত ব্যক্তিদের অসুখ-বিসুখ ও মৃত্যু, যুদ্ধ ও যুদ্ধের গুজব—এ সবই টাকার প্রয়োজনে তৈরী করা হয়ে থাকে, এরকম আরও বহু জিনিসই ফাটকা বাজারের মতো প্রতারণার কাজে লাগিয়ে, নানা রকম প্রবঞ্চনার মাধ্যমে টাকা উপায় করার কাজে লাগানো হয়ে থাকে। এখানে বিভিন্ন গোষ্ঠীর পুঁজির লড়াই-এর ফল সমগ্র সমাজের উপরই পড়ে। মন্ত্রী, সরকার—সবাইকেই শেয়ার বাজারের কাছে নত হতে হয়। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে শেয়ার বাজারই রাষ্ট্রকে চালায়, রাষ্ট্র শেয়ার বাজারকে চালায় না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও মন্ত্রীদের এই বিষবৃক্ষকে লালন পালন করে যেতে হয়।

এসব জিনিসই প্রতিদিন যেমন বেড়ে চলেছে, তার কুফলও তেমনি প্রতিদিনই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছে, আর লোকে তার প্রতিকারের জন্য সোচ্চার হয়ে উঠছে। কিন্তু আধুনিক সমাজ এর প্রতিকার করতে অপারগ। কোনো কোনো জন্তু যেমন পর্বতের সামনে অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে* তার উল্লঙ্ঘনের ক্ষমতা নেই বলে, বর্তমান সমাজও তেমনি এসব সমস্যার সামনে অপারগ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কলুর বলদের মতো ঘুরতে থাকে—অসহায়, উদ্দেশ্যবিহীন, শোচনীয় অক্ষমতার প্রতিমূর্তি। যারা এ অবস্থার সুরাহা করতে চায়, তাদের শক্তি খুবই কম, যাদের চাওয়া উচিত তারা প্রকৃত অবস্থাটা অনুধাবন করতে পারে না, আর যাদের শক্তি আছে তারা তা ভাল কাজে লাগায় না!

লোকে চিৎকার করে বলে: "কিছু একটা বলুন, কি করলে আমরা এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাব।" এ খুব সমস্যার কথা। আমরা পরিত্রাণের যে রাস্তা বলব তাতে অনেকে বাধা দেবে। কারণ প্রথমেই দরকার সুবিধাভোগী ও একচেটিয়া পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া, আর মুখে লোকে যতই বলুক না কেন, ঠিক এই জায়গায়ই মানুষ বাধা দিয়ে থাকে। হ্যাঁ, একথা ঠিকই যে যদি শুধু আবেগ ও প্রতিশ্রুতি দিয়েই দুনিয়ার ব্যাধি সারানো যেত, কিন্তু তা যায় না।

এর সবচেয়ে ভাল উদাহরণ আমরা দেখতে পাই জার্মানীর 'সমাজ সংস্কার' এর ব্যাপারটা থেকে, সেখানে কি সামান্য সংস্কারের কথা প্রস্তাব করা হয়েছিল? বর্তমানে যার তাৎপর্য খুবই কম। কিন্তু তাতে শাসক শ্রেণীর টাকার থলিতে

---

* Wie die Ochsen am Berge—'Like the oxen at the foot of the hill'—জার্মান প্রবাদ বাক্য।

হয়তো সামান্য ছিদ্র হয়ে যেত। তাই বহুদিন পরেও দেখা গেল যে কোনো কাজই হয় না। এবং আমরা প্রায় যেখানে ছিলাম সেখানেই আছি। সামাজিক সমস্যার সমাধান করতে হলে অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয়, আত্মত্যাগ করতে হয়।

কোন সময়ের জন্য কি কাজ করা দরকার তা উপযুক্ত সময়েই বিবেচনা করতে হবে। আগে থেকে তা নিয়ে নিরর্থক বাক-বিতণ্ডা করে লাভ নেই। সবচেয়ে বিচক্ষণ ব্যক্তিকেও অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিতে হয়, এবং পরবর্তী বৎসরে যে তার কি করতে হবে তা জানে না।

> আমি মনে করি যে কিছু সময়ের মধ্যেই যে সব ক্ষতিকর বিষয়ের কথা বলা হল সেগুলি এমন পর্যায়ে পৌঁছবে অধিকাংশ জনগণই সে সব বুঝতে পারবে এবং তাদের কাছে অবস্থা অসহ্য মনে হবে, সে অবস্থার পরিবর্তনের জন্য একটা সর্বজনীন অপ্রতিরোধ্য আকাঙ্ক্ষা সর্বত্র দেখা যাবে, এবং অতি দ্রুত এই অবস্থার পরিবর্তন হবে।

সুতরাং যদি আমাদের একথা সঠিক হয় যে সমাজের সমস্ত অশুভ শক্তির মূলেই রয়েছে সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে, যে সমাজ ব্যবস্থা বর্তমানে পুঁজিবাদের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে উৎপাদনের উপায়গুলি সব ব্যক্তিগত সম্পত্তিবিশেষ—অথাৎ জমি, কলকারখানা, যন্ত্রপাতি, যানবাহন ব্যবস্থা, খাদ্য উৎপাদনের উপায়গুলি, এবং খাদ্য সামগ্রীগুলিও পর্যন্ত ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থার আওতার রয়েছে—

> তাহলে সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে আইন করে দখল করে সর্বসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত করতে হবে।

"পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যেই পুঁজি কেন্দ্রিভূত হতে থাকার মধ্যেই অন্তর্হিত রয়েছে ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে সামাজিক সম্পত্তিতে পরিণত করার ব্যবস্থা। একজন পুঁজিপতি সব সময়ই অন্য অনেক পুঁজিপতিকে শেষ করে দেয়। মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের দ্বারা বহু পুঁজিপতিকে গ্রাস করে নেবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দেয় শ্রম নিয়োগের সমবায় প্রথা, সচেতনভাবে বিজ্ঞানসম্মত যন্ত্রপাতির প্রয়োগ, জমির ক্ষেত্রে সুশৃংখল উৎপাদন ব্যবস্থা, যন্ত্রপাতির উন্নতি, সমবেতভাবে সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস, বিশ্ববাজারের সংগে সমস্ত মানুষের জড়িত হয়ে যাওয়া, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে পুঁজিবাদী রাজত্বের আন্তর্জাতিক চরিত্র। বড় বড় পুঁজিপতিরা যতই ছোট ছোট পুঁজিপতিদের গ্রাস করতে থাকে, পুঁজিপতিদের সংখ্যা ক্রমশঃ কমতে থাকে, আর সেই মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিরাই একচেটিয়াভাবে সমস্ত সুযোগ সুবিধা লুটতে থাকে। তার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে জনগণের দুঃখ দুর্দশা,

দাসত্ব, অবমাননা, শোষণ, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে আবার দেখা দেয় শ্রমিক শ্রেণীর বিদ্রোহ। শ্রমিক শ্রেণী ক্রমশঃই বৃদ্ধি পেতে থাকে, এবং উৎপাদনের ব্যবস্থার জন্যই তারা সুশৃংখল, একতাবদ্ধ, সংগঠিত হয়ে ওঠে। একচেটিয়া পুঁজিবাদের ফলেই আবার উৎপাদন ব্যবস্থার অগ্রগতি ব্যাহত হতে থাকে। উৎপাদনের উপায়গুলি কেন্দ্রিভূত হতে এবং শ্রমনিয়োগের ব্যবস্থা সামাজিকী-করণ হতে হতে অবশেষে এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছোয় যখন উৎপাদনের পুঁজিবাদী বহিরাবরণ আর পেরে ওঠে না, সেই বহিরাবরণ ফেটে পড়ে। পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রথার মৃত্যু ঘণ্টা বেজে ওঠে। দখলকারদের সব দখল হয়ে যায়"।*

সমাজ তখন সমস্ত অধিকার ও দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং সমস্ত জিনিসটা এমন করে নিয়ন্ত্রিত করে যাতে সমগ্র সমাজের স্বার্থে কাজে লাগে! তখন আর সমাজের স্বার্থের সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বার্থের কোনো সংঘাত লাগে না।

* কার্ল মার্কস : ক্যাপিটাল, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৭৯২-৭৯৩, ইংরেজী সংস্করণ, মস্কো ১৯৬৪, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৭৬৩।

সমাজের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর

ব্যক্তিগত মালিকানার হাত থেকে সমাজের সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে নেবার সংগে সংগে সমাজের ভিত্তিই বদলে যায়। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে শ্রমিকদের অবস্থা, শিল্প, কৃষি, যানবাহন, শিক্ষা, বিবাহব্যবস্থা, বিজ্ঞান, শিল্প, পারস্পরিক সম্বন্ধ—সবদিক থেকেই মানুষের জীবন একেবারেই বদলে যায়। ক্রমশঃ রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত্তিও নষ্ট হয়ে যেতে থাকে। রাষ্ট্র হলো এমনই একটি সংগঠন, যা কিনা সম্পত্তির ভিত্তিতে বর্তমান পারস্পরিক সম্বন্ধ ও সামাজিক নিয়মকানুনকে বজায় রাখার জন্য শক্তি প্রয়োগ করে থাকে। কিন্তু বর্তমান সম্পত্তি প্রথার বিলোপের সংগে সংগে মানুষের সংগে মানুষের প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধও আর থাকে না, তাই সেই সম্বন্ধের রাজনৈতির অভিব্যক্তিরও আর কোনো অর্থ থাকে না। শাসক-শ্রেণীর বিলুপ্তির সংগে সংগে রাষ্ট্রেরও বিলোপ হয়। ঠিক যেমন অলৌকিক শক্তির অস্তিত্ব ও তার ক্ষমতার উপর বিশ্বাস চলে যাবার সংগে সংগে ধর্মেরও বিলোপ হয়ে যায়। ভাষাকে তো কোনো চিন্তাধারাকেই প্রকাশ করতে হবে। অন্তঃসারশূন্য হলে তার কোনো মানে হয় না, কোনই কাজে লাগে না।

ধনতান্ত্রিক ভাবধারায় অভ্যস্ত কোনো পাঠক হয়তো চমকে উঠে বলবেন ঃ "হ্যাঁ, ভাল কথা, কিন্তু সমাজের কি অধিকার আছে এই পরিবর্তন নিয়ে আসার?" অধিকার বরাবরই যেমন ছিল, এখনও ঠিক তেমনিই আছে— যখনই জনগণের কল্যাণের জন্য সমাজের পরিবর্তন ও সংস্কারের কথা বলা হয়েছে। এই অধিকারের উৎস রাষ্ট্র নয়, সমাজ। রাষ্ট্র শুধু অধিকারকে কাজে লাগাবার একটি যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। এতদিন পর্যন্ত সমাজ বলতে শুধু একটি সংখ্যালঘু ক্ষুদ্র অংশকে বোঝাতো। কিন্তু তারা বৃহত্তর সমাজের জনগণের পাশেই শুধু নিজেদেরই সমাজ বলে চালিয়েছে। যেমন চতুর্দশ লুই (Louis XIV) নিজেই রাষ্ট্র উপাধি নিয়েছিল। আমাদের সংবাদপত্রগুলি যখন বলে ঃ "নতুন ঋতুর সূচনায় সকলেই শহরে আসতে শুরু করেছে," অথবা "মরসুম শেষ হল, সকলে গ্রামে ফিরে যাচ্ছে" আর তার দ্বারা তারা সমগ্র দেশবাসীর কথা মনে করে না, মনে করে শুধু উপরতলার হাজার দশেক মানুষকে, সংবাদপত্রগুলির কাছে তারাই হল "সকলে", কারণ ঐ উপরতলার মুষ্টিমেয় লোকই রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করে। আর দেশ হল সমগ্র জনগণ। তার ফলে রাষ্ট্র এবং সমাজ 'সকলের

ভালোর জন্য' যে কিছু করে এসেছে, তা শুধু শাসকশ্রেণীর ভালোর জন্যই করেছে, তাদেরই স্বার্থ রক্ষার জন্য আইন কানুন তৈরি করা হয়েছে ও প্রয়োগ করা হয়েছে। রোমের সংবিধানের একটি বিখ্যাত মূল নীতি হল এই: "সমাজের কল্যাণই যেন সর্বোচ্চ আইন হয়"। কিন্তু রোমের সেই সমাজ কাদের নিয়ে তৈরি হয়েছে? পদানত জাতিগুলি নিয়ে? লক্ষ লক্ষ দাসদের নিয়ে? না, অত্যন্ত সংখ্যালঘু মুষ্টিমেয় রোমান অধিবাসীদের নিয়ে, প্রধানতঃ অভিজাতদের নিয়ে, যারা কিনা পদানত শ্রেণীর মানুষদের শোষণ করে এসেছে।

মধ্যযুগে যখন অভিজাত ও রাজপুরুষরা সাধারণের সম্পত্তি চুরি করতো, তখন বলা হতো সমাজের কল্যাণের জন্য তাদের সে অধিকার দেওয়া হয়েছে। ফরাসী বিপ্লবের সময় যখন অভিজাত এবং পুরোহিতদের সম্পত্তি নিয়ে নেওয়া হলো, তাও সমাজের কল্যাণের নাম করে নেওয়া হয়েছিল, আর তার ফলেই দেখা গেছে আধুনিক বুর্জোয়া ফ্রান্স-এর সমর্থনে জমির মালিক হিসাবে ৭০ লক্ষ কৃষককে। সমাজের কল্যাণের নাম করেই স্পেন বারে বারে গির্জার সম্পত্তি দখল করেছে এবং ইতালী তা একেবারেই বাজেয়াপ্ত করেছে। আর এ সবের জন্য তারা সম্পত্তির অকাট্য অধিকারের প্রবক্তাদের কাছ থেকে প্রশংসাই পেয়েছে। অভিজাত ইংরেজরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইংরেজ ও আইরিশ জনগণের সম্পত্তি লুঠ করে আসছে এবং ১৮০৪ থেকে ১৮৩১ সালের মধ্যে তারা অন্ততঃ ৩,৫১১,৭১০ একর সাধারণের জমি "আইনসংগত"ভাবে দখল করেছে। আবার যখন বৃহত্তর উত্তর আমেরিকার "মুক্তি যুদ্ধের" সময় লক্ষ লক্ষ ক্রীতদাসকে যাদের টাকা দিয়ে কেনা হয়েছিল এবং যারা সম্পত্তি বলেই পরিগণিত হতো— বিনা খেসারতে মুক্তি দেওয়া হল, তাও করা হয়েছিল সমাজের কল্যাণের নামে। আমাদের সমগ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীই বেড়ে উঠেছে বেদখল করা ও বাজেয়াপ্ত করার একটানা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। যেখানে শিল্পপতি উৎখাত করেছে কুটির শিল্পকে, বৃহৎ ভূস্বামী উৎখাত করেছে কৃষককে, ব্যবসায়ী উৎখাত করেছে দোকানদারকে এবং অবশেষে একজন আর একজন পুঁজিপতিকে—এক কথায়, ছোটরা সব বড়দের শিকারে পরিণত হয়েছে। আর আমাদের বুর্জোয়ারা বলে থাকে: "এ সবই করা হয়েছে সাধারণের ভালোর জন্য", "সমাজের কল্যাণের জন্য।" অষ্টাদশ ব্রুমায়ার ও ২রা ডিসেম্বরে নেপোলিয়ান সমাজকে "রক্ষা" করেছিলেন এবং সমাজ তাকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। ভবিষ্যতে সমাজ যদি কখনও নিজেকে রক্ষা করতে পারে, তবে সে তার প্রথম যুক্তিসংগত কাজকে সম্পূর্ণ করবে, কারণ সে তখন একের স্বার্থে অপরকে শোষণ করবে না। সকলকে জীবন ধারণের জন্য সমান অধিকার দেবে, সকলের জন্য সুন্দর সুখী সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলবে। সে-ই হবে মানব সমাজের সবচেয়ে পবিত্র সুন্দর ব্যবস্থা।

এখন যদি আমরা প্রশ্ন করতে থাকি যে সমাজের এই রূপান্তর ঠিক কেমন ভাবে হবে, তবে একেবারে সঠিকভাবে বলা যাবে না যে কোন্ কোন্ দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সম্মুখীন হতে হবে, আর ঠিক কি কি নিয়মে অগ্রসর হতে হবে। ভবিষ্যতের পক্ষে যা সবচেয়ে উপযোগী হবে আগে থেকে তা বিস্তারিত ভাবে নির্দিষ্ট করে রাখা যায় না। যেমন প্রকৃতির ক্ষেত্রে তেমনি সমাজের ক্ষেত্রেও নিয়ত পরিবর্তন চলছে। এক পরিস্থিতি চলে যায় অন্য পরিস্থিতি আসে। পুরাতন ও জীবনহীনের স্থলে আসে নবীন ও জীবনশক্তিপূর্ণ। চতুর্দিকে নানাবিধ আবিষ্কার, উন্নতি এগিয়ে চলেছে, সংগে সংগে মানুষের রীতিনীতি, সমাজ—সবকিছুরই পরিবর্তন হচ্ছে।

সুতরাং আমরা শুধু সাধারণ নীতির কথাই বলতে পারি, যা অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে এবং ভবিষ্যতের পথ নির্দেশ করতে পারে। এমনকি বর্তমানেও সমাজ এমন অবস্থায় এসেছে যে কারও ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছার দ্বারা সমাজ পরিচালিত হতে পারে না যদিও কখনো কখনো মনে হয়েছে যে সমাজ বুঝি কোনও কোনও ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। আসলে ব্যক্তিই সমাজের স্রোতের মুখে চলেছে। সমাজ-দেহের বিকাশেরও একটি নির্দিষ্ট, অন্তর্নিহিত রীতি আছে। অতীতেও সেই রীতি অনুযায়ী সমাজের বিকাশ হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে। সমাজ তার নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করবার সূত্রটি আবিষ্কার করবে, নিজের বিকাশের ধারা বুঝতে পারবে এবং সচেতনভাবে সেই ধারা প্রয়োগ করে অগ্রসর হয়ে যাবে।

*　　　*　　　*

সমাজ যখন সমগ্র উৎপাদনের উপায়গুলির অধিকারী হবে, তখন সমাজ-তান্ত্রিক সমাজের প্রথম মূল নীতিই হবে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে শ্রমের দায়িত্ব দেওয়া। শ্রম ছাড়া মানুষের প্রয়োজন মেটানো যায় না এবং কোনও সুস্থ ব্যক্তিরই এরকম মনে করার অধিকার নেই যে তার জন্য অপরে কাজ করে দেবে। সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে যারা অপপ্রচার করে থাকে তারা বলে যে সমাজতন্ত্র-বাদীরা নাকি কাজ করতে চায় না, প্রকৃতপক্ষে কাজকর্ম তুলে দিতে চায়। তাদের এ প্রচার সম্পূর্ণ মিথ্যা। অলস ব্যক্তিরা ততক্ষণই বেঁচে থাকতে পারে যতক্ষণ অন্যেরা তাদের জন্য কাজ করে থাকে। বর্তমানে আমরা এমনিই একটা অবস্থায় আছি, আর যারা এই অবস্থা থেকে সবচেয়ে বেশি লাভবান হয় তারাই হল সমাজতন্ত্রের পাকা শত্রু। বরং সমাজতন্ত্রবাদীরা বলে থাকে যে, যে কাজ করবে না, তার খাবারও অধিকার নেই। কিন্তু কাজ বলতে তারা যে কোনো রকমের কর্মকেই বোঝে না, কার্যকরী উৎপাদনশীল কাজ বোঝে। সুতরাং নতুন সমাজ দাবি করবে যে তার প্রতিটি অধিবাসীই কিছু উৎপাদন করার কাজ করবে,

হস্তশিল্প বা চাষের কাজ করবে, যাতে কিনা সমাজের প্রয়োজন মেটাতে প্রত্যেকেরই কিছু অবদান থাকে। কাজ ছাড়া ভোগ নেই, আর ভোগ ছাড়াও কাজ নেই।

কিন্তু যখন কাজ করা সকলের পক্ষেই বাধ্যবাধকতা হবে, তখন সকলের স্বার্থেই কাজের জন্য তিনটি শর্ত মানতে হবে। প্রথমতঃ, কাজের পরিমাণ স্বাভাবিক হওয়া চাই। অতিরিক্ত কাজ বা অতি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কাজ করা চলবে না। দ্বিতীয়তঃ, নানা ধরনের কাজ থাকা চাই, যেখানে প্রত্যেকে তার উপযোগী কাজ পেতে পারে। তৃতীয়ত, কাজ যতদূর সম্ভব উৎপাদনশীল হওয়া দরকার, কারণ তার দ্বারাই ভোগের মাত্রা নির্দিষ্ট হবে। এ সবই নির্ভর করছে সমাজের ভাণ্ডারে কতখানি এবং কী ধরনের উৎপাদনশীল শক্তি আছে এবং কী ধরনের সমাজজীবন গড়ে উঠবে তার উপর। সমাজতান্ত্রিক সমাজ তো মানুষের সর্বহারা জীবন যাপনের জন্য তৈরি হয় না, তৈরী হয় অধিকাংশ মানুষের জীবনের সর্বহারা অবস্থার অবসানের জন্য, সকলেই যাতে ভালভাবে বাঁচার সুযোগ-সুবিধা পায় তার জন্য, তাই প্রশ্ন আসে, তাদের সে চাহিদা সমাজ কতখানি মেটাতে পারবে।

এই প্রশ্নের সমাধান করতে হলে প্রয়োজন সামাজিক শ্রমের প্রতিটি শাখার সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠান গঠন করা। এর জন্য কমিউন প্রথা উপযোগী। বৃহত্তর এলাকা হলে সুবিধা অনুযায়ী জেলা হিসাবেও ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে, কমিউনের প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্ক সভ্য নারী বা পুরুষ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে এবং কাদের উপর কার্যভার দেওয়া হবে তা ঠিক করবে। স্থানীয় কার্যনির্বাহক প্রতিষ্ঠানের উপর থাকবে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক প্রতিষ্ঠান। মনে রাখা দরকার এ কিন্তু সরকার নয়, উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কিছু, শুধু কার্যনির্বাহের জন্য। এই কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক প্রতিষ্ঠান কে নিয়োগ করবে সে সব দিয়ে আমাদের কোনো কাজ নেই। কারণ এসব পদ কোনো বিশেষ সম্মান বা অর্থ উপার্জনের জন্য নয়, যে বিশ্বস্ত, সুযোগ্য কাজের লোক, সে নারী বা পুরুষ হোক, সেই একাজ করতে পারে। এই পদগুলি প্রতিনিধিদের দ্বারা সাময়িকভাবে পূরণ করা হবে, এ কোনো স্থায়ী সরকারী আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার মতো নয়। সেজন্যই এই স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের মাঝামাঝি আরো কোনো প্রতিষ্ঠান থাকবে কিনা তা নিয়ে মাথা ঘামানোরও কোনো প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন বোধে সে রকম প্রতিষ্ঠান রাখা হবে বা তুলে দেওয়া হবে। বাস্তব প্রয়োজন অনুযায়ীই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ক্রমশ অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন ব্যবস্থা অকেজো হয়ে গেলেই তাকে পরিবর্তন করতে হবে, তাতে কারও ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত থাকবে না, তাই অনায়াসেই সব ব্যবস্থার পরিবর্তন আনা যাবে। স্পষ্টই দেখা

যায় যে সে ব্যবস্থার সঙ্গে আমাদের বর্তমান সমাজব্যবস্থার আকাশ পাতাল তফাৎ। এখন প্রশাসনের সামান্য পরিবর্তন করতে হলেও দেখা দেয় সংবাদপত্রের কত দ্বন্দ্বযুদ্ধ, সংসদে কত বাকবিতণ্ডা। আর অফিস দপ্তরে স্তূপীকৃত হয়ে ওঠে কতই না রাশি রাশি নথিপত্র।

আমাদের প্রধান প্রশ্ন হল আমাদের কাছে কতখানি ও কি ধরনের শক্তি আছে। কতখানি ও কি ধরনের উৎপাদনের উপায় আছে, যেমন কলকারখানা, জমি, তার পূর্বেকার উর্বরতা, বর্তমান মজুত। তারপর হিসাব করতে হবে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য সামগ্রীর কতটা প্রয়োজন, জনসমষ্টির গড়ে কতটা প্রয়োজন হয়। এই সব ক্ষেত্রেই সংখ্যাতত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশি। সংখ্যাতত্ত্ব নতুন সমাজে বিজ্ঞানের আনুসঙ্গিক কাজ করে থাকে।

সংখ্যাতত্ত্ব অনুরূপ ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সমগ্র দেশের, রাজ্যের বা স্থানীয় বাজেটগুলি তৈরি করার জন্য সংখ্যাতত্ত্বকে কাজে লাগানো হয়ে থাকে। দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও চলতি প্রয়োজনের কিছুটা স্থায়ীত্ব থাকলে অগ্রসর হতে সুবিধা হয়। তাছাড়া, প্রত্যেকটি বড় কারখানার মালিক এবং প্রত্যেক ব্যাপারী, স্বাভাবিক অবস্থা থাকলে, ঠিক করতে পারে আগামী তিন মাসে তার কতটা সামগ্রী প্রয়োজন এবং সেই অনুযায়ী উৎপাদনের বা ক্রয়ের ব্যবস্থা করতে পারে। কোনো অস্বাভাবিক পরিস্থিতি না দেখা দিলে তারা অনায়াসেই তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করে যেতে পারে।

বাজারের চাহিদা কত, আর কত মাল মজুত আছে এসবের হিসাব না জেনে অন্ধভাবে উৎপাদন করে যাবার দরুনই মজুত মাল অতিরিক্ত জমে যায়। সাধারণ বাজারের প্রয়োজনের ভিত্তিতেই বিভিন্ন দেশের লোহার কারবারীরা মিলিতভাবে কাজ করেছে, সংখ্যাতত্ত্বের হিসাব অনুযায়ী উৎপাদনের ব্যবস্থা করেছে। এই নিয়মের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম তারা করতে পারে না। মালিকরা তাদের নিজেদের স্বার্থেই চুক্তিবদ্ধ হয়ে থাকে, কিন্তু শ্রমিকদের কথা চিন্তাই করে না। শ্রমিকরা প্রথমে অতিরিক্ত কাজের চাপে ভারাক্রান্ত হয়, তার পরে একেবারেই ছাঁটাই হয়ে যায়। এইভাবে ব্যবসা ক্ষেত্রেও সংখ্যাতত্ত্ব ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সপ্তাহে সপ্তাহে ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র থেকে মজুত পেট্রোল, কফি, তুলা, চিনি, শস্য-কণা প্রভৃতির রিপোর্ট ছাপা হয়ে থাকে। যদিও অনেক সময়ই সে রিপোর্ট ভুল থাকে, কারণ মালিকরা তাদের নিজেদের স্বার্থেই সত্য গোপন করে, তবুও মোটামুটিভাবে মজুত মালের একটা হিসাব পাওয়া যায়, যা থেকে ব্যাপারীরা বাজারের অবস্থা সম্বন্ধে একটা আন্দাজ করে নিতে পারে। সমস্ত অগ্রসর দেশই ফসলের হিসাবের জন্যও সংখ্যাতত্ত্ব ব্যবহার করে থাকে। কারণ যদি জানা যায় যে কতটা বীজে কতটা জমি চাষ করা যায়, আর তা থেকে কত শস্য

উৎপন্ন হতে পারে তবে কি দামে তা বিক্রি করা যেতে পারে সে সম্বন্ধেও একটা মোটামুটি হিসাব করা যায়।

সমাজের সমাজতন্ত্রীকরণ হলে প্রত্যেকটি জিনিসই সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খলভাবে করা হবে। প্রত্যেকটি ব্যবহার্য জিনিসের জন্য কত চাহিদা তার হিসাব সহজেই পাওয়া যাবে। আর কিছুদিনের অভিজ্ঞতার পরই সমস্ত ব্যবস্থাটা নির্দিষ্ট ঘড়ির কাঁটার মতো চলতে থাকবে।

প্রতিদিন গড়ে কতটা সামাজিক শ্রমের প্রয়োজন হবে তা জানা যাবে সমাজের প্রকৃত উৎপাদনশীল শ্রমশক্তি কতটা আছে তার সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ের চাহিদার হিসাবের তুলনা করে।

প্রত্যেকেই তার নিজের ইচ্ছামত বিভাগে কাজ নিতে পারবে, কারণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহুমুখী কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হওয়ার দরুন সকলেই সে সুযোগ পাবে। যদি কোথাও শ্রমিকের সংখ্যা উদ্বৃত্ত আবার কোথাও ঘাটতি হয়ে যায়, তবে তার সামঞ্জস্য করে ভাগ করে দেবার দায়িত্ব থাকবে কর্মীদের উপর। যতই মানুষ নিজের নিজের কর্তব্যকর্মে অভ্যস্ত হতে থাকবে, ততই সমস্ত ব্যবস্থাটা সুশৃঙ্খলভাবে চলতে থাকবে। প্রতিটি শাখা ও বিভাগ তাদের মুখ্য প্রতিনিধি নির্বাচিত করবে। এই মুখ্য প্রতিনিধিরা এখনকার মতো দাসসুলভ মনোবৃত্তি নিয়ে অন্য সকলের উপর খবরদারী করে চলবে না, সকলের উৎপাদনশীল কাজকে সুসংহতভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবার কাজ করবে। সুতরাং তখন এটাও কিছু অসম্ভব হবে না যে সাংগঠনিক ও শিক্ষা-কৃষ্টির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এসব কাজও নারী বা পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই করতে পারবে।

স্পষ্টই দেখা যায় যে শ্রমশক্তি যদি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক সমান অধিকারের নীতিতে সংগঠিত করা যায়, যেখানে ব্যক্তি সমষ্টির প্রতিনিধিত্ব করবে, তাহলে মানুষের মধ্যে জাগবে সবচেয়ে উন্নত সংহতিবোধ, কর্মপ্রেরণা এবং প্রতিযোগিতা যা কিনা আজকের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় হতে পারে না। তার ফলে শ্রমের উৎপাদনশীলতাও বেড়ে যাবে, আর উৎপাদনেরও উন্নতি হতে থাকবে।

তদুপরি, যদি ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়েই উভয়ের জন্য কাজ করতে থাকে, তাহলে শুধু কাজেরই উন্নতি হবে না, কাজের সময় কমাবার চেষ্টা করা হবে, নতুন নতুন উৎপাদনের কাজ করা হবে, আরো উন্নত উৎপাদনের পথ খুলে যাবে। তাতে সকলের চেষ্টা হবে কিভাবে উৎপাদন ব্যবস্থাকে আরো সহজ, দ্রুত ও উন্নত করা যায়। নতুন নতুন উদ্ভাবনা ও আবিষ্কারের জন্য মানুষ উদ্বুদ্ধ হবে ও পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে অগ্রসর হয়ে যাবে।*

* "অন্যের কাছ থেকে স্বীকৃতি ও প্রশংসা পাবার জন্য মানুষ প্রাণপণে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে থাকে, তা সে কোনো সামান্য ব্যাপারেও করে, এমনকি সে জিনিস যদি

এইভাবে সমাজতান্ত্রিক সমাজে বুর্জোয়া সমাজের ঠিক বিপরীত ব্যবস্থাই হবে। বুর্জোয়া দুনিয়ায় কত উদ্ভাবনী শক্তি নষ্ট হয়ে যায়! কতজনকে তারা একদিকে ঠেলে ফেলে দেয়। যদি মেধা ও প্রতিভার কথা ধরা যায় তবে বুর্জোয়া দুনিয়ায় বহু সংখ্যক মালিকদের থেকে তাদের শ্রমিক, ফোরম্যান, টেকনিক্যাল অ্যাসিসটেন্টস্, ইঞ্জিনিয়ার, কেমিস্ট প্রমুখকে প্রাধান্য দিতে হবে। এঁরাই শতকরা একশোভাগের মধ্যে নিরানব্বই ভাগ ক্ষেত্রে নতুন নতুন উদ্ভাবনী, আবিষ্কার ও উন্নতি করে থাকে আর মালিকরা শুধু জানে কেমন করে মুনাফা লুটতে হয়। কত সহস্র আবিষ্কারক টাকার অভাবে তাদের কাজে সফল হতে পারেনি; কতশত জন তাদের দৈনন্দিন জীবনের সামাজিক দুর্দশার নিচে নিষ্পৃষ্ট হয়ে গেছে? এ সব জিনিসের কোনো হিসাব নেই। এখানে যাদের টাকা আছে তারাই দুনিয়া চালায়, চিন্তা বা যুক্তি দিয়ে চলে না। অবশ্য একথাও অস্বীকার করা যাবে না যে কখনও কখনও বিত্ত ও চিন্তাশক্তির সমন্বয় দেখা যায়, তবে সে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র।

যাদের বাস্তব জীবনের কোনো অভিজ্ঞতা আছে তারাই জানে যে উৎপাদন ব্যবস্থার কোনো উন্নতি, কোনো নতুন আবিষ্কার হলেই শ্রমিকরা কত আস্থা হারিয়ে ফেলে এবং তারা সঠিকভাবেই তা করে। কারণ তা থেকে শ্রমিকদের কোনো লাভ হয় না, লাভ হয় শুধু মালিকদের। শ্রমিকদের মনে সঠিকভাবেই আতংক জাগে যে যন্ত্রপাতির কোনো নতুন উন্নতি হলে অবিলম্বে উদ্বৃত্ত বলে শ্রমিকদের ছাঁটাই শুরু হবে। তাই নতুন নতুন আবিষ্কার, যা কি না মানুষের পক্ষে সম্মানের ও উন্নতির ধাপ মনে হবার কথা, শ্রমিকরা তার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে ও তাকে অভিশাপ বলে মনে করে। এই হল পারস্পরিক স্বার্থের, দ্বন্দ্বের স্বাভাবিক ফল।*

জনগণের কোনো উপকারে না আসে তবুও প্রতিযোগিতা করে থাকে। সাধারণের ভালোর জন্য যে কোনো বিষয়ে প্রতিযোগিতা করাকে সমাজতন্ত্রবাদীরা অগ্রাহ্য করে।"—জন স্টুয়ার্ট মিল, (John Stuart Mill) : Political Economy।

* ভন থুনেন (Von Thunen) : Der Isolirte Staat (The Isolated State)-এ বলা হয়েছে: "স্বার্থের দ্বন্দ্বই সর্বহারা ও মালিকদের মধ্যে এমন বিরোধ বাধিয়ে রাখে যা মেটানো সম্ভব নয়। একথা সত্য যে মালিকদের অবস্থার উন্নতিই জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির একমাত্র কারণ নয়। কখনো কখনো শিল্পের ক্ষেত্রে নতুন নতুন আবিষ্কার, বড় বড় রাস্তা তৈরী রেললাইন তৈরী, ব্যবসা বাণিজ্যের নতুন যোগাযোগ ইত্যাদির জন্যও জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের বর্তমান সামাজিক পদ্ধতির জন্য এসব কিছুতেই শ্রমিকদের অবস্থার কোনো উন্নতি হয় না। শ্রমিকদের অবস্থা যা ছিল তাই থেকে যায়, আর লাভ হয় শুধু মালিক, পুঁজিপতি, ভূস্বামীদের"। এই শেষ কথাই কি ১৮৬৪ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গ্ল্যাডস্টোন যা বলেছিলেন ঠিক সেই রকম নয়? গ্ল্যাডস্টোন বলেছিলেন: "সম্পদ ও ক্ষমতার এই প্রচণ্ড বৃদ্ধি (ইংলণ্ডে বিগত বিশ বৎসরের মধ্যে যা হয়েছে) শুধুমাত্র বিত্তবান শ্রেণী

সমাজতান্ত্রিক সমাজে এ অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে যায়। প্রত্যেকেই তার নিজস্ব গুণাবলী বিকশিত করতে পারে এবং তার দ্বারা সে সমাজেরও মঙ্গল সাধন করতে পারে। আজকের দিনে ব্যক্তিগত অহমিকা ও সাধারণের কল্যাণের মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক সংঘাত, একে অপরের বিরুদ্ধে যায়। নতুন সমাজে এই সংঘাতের অবসান হয়ে যাবে। ব্যক্তিস্বার্থ ও সমাজের কল্যাণের মধ্যে পার্থক্য থাকবে না, উভয় উভয়ের সহায়ক হবে।*

সেই সমাজব্যবস্থায় নৈতিক উন্নতি যে কতদূর হতে পারে তা বোঝা যায়। শ্রমের উৎপাদন শক্তি বহুল পরিমাণে বেড়ে যাবে, এবং তার দ্বারা মানুষের প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হবে।

তাছাড়া কাজের পরিবেশও সুষ্ঠু হবে। কারখানার মধ্যে যাতে বিপদ-আপদ দুর্ঘটনা না হয়, স্বাস্থ্যকর সুন্দর পরিবেশ থাকে তার জন্য ব্যবস্থা করা হবে।

প্রথম প্রথম নতুন সমাজ পুরাতন সমাজের কাছ থেকেই যে সব যন্ত্রপাতি বা উৎপাদনের উপায়গুলি পাবে তা দিয়েই কাজ করতে থাকবে। কিন্তু এখন সে যন্ত্রপাতি যতই উন্নত মনে হোক না কেন নতুন সমাজের প্রয়োজনে তা যথেষ্ট হতে পারবে না। [illegible] কারখানার সংখ্যাও শ্রমিকের সংখ্যার তুলনায় অনেক কম হবে, যন্ত্রপাতিরও অনেক [illegible] উন্নতি সাধন করার প্রয়োজন হবে।

সুতরাং ভবিষ্যতে সবচেয়ে জরুরী প্রয়োজন [illegible] বড় বড়, খোলামেলা আলো-বাতাস ভরা [illegible] সুন্দর [illegible] কল্যাণ [illegible] হবে। যাতে উৎপাদনের সমস্ত সুব্যবস্থা থাকে।

মধ্যেই দাম বদ্ধ রয়েছে"। ভন থুনেন (Von Thunen) তাঁর 'Isolated State' এর ২০৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: "যারা উৎপাদন করছে এবং যা কিছু উৎপাদন করছে তার মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে তার থেকেই সব সংকট দেখা দিচ্ছে।"

প্লেটো তাঁর রিপাবলিকে (Republic) বলেছেন: "শ্রেণীবিভক্ত হলে রাষ্ট্র আর একটি থাকে না, দু'টি হয়ে যায়। গরিবরা হয় একটা রাষ্ট্র, ধনীরা আর একটা। আর উভয়ে পাশাপাশি থেকে পরস্পরের অবস্থা দেখতে থাকে। শেষ পর্যন্ত শাসক শ্রেণী লড়াই করতে পারে না, কারণ লড়াইয়ের জন্য তাদের [illegible] জনগণের, যে জনগণের হাতে অস্ত্র দিলে তাদের ওরা শত্রুর চেয়েও বেশি ভয় করতে থাকে।"

মরেলি (Morelly) Principles of Legislation এ বলেছেন: "সম্পত্তি আমাদের দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করে—গরীব ও বড়লোক। ধনীরা তাদের সম্পত্তিকে ভালবাসে, এবং দেশ রক্ষার জন্য তাদের মাথাব্যথা নেই। গরিবরা তাদের দেশকে ভালবাসতে পারে না, কারণ দেশের কাছ থেকে তারা দুঃখ কষ্ট ছাড়া আর কিছু পায় না। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজে প্রত্যেকেই তার দেশকে ভালবাসে, কারণ সেখানে তারা পায় তাদের জীবন ও সুখ।"

* কমিউনিজম-এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলির হিসাব করে জন স্টুয়ার্ট মিল তাঁর 'পলিটিক্যাল ইকনমি' গ্রন্থে বলেছেন: "সে রকম মনোভাব তৈরী করবার পক্ষে কমিউনিস্ট সমাজই সবচেয়ে ভাল হবে, কারণ তখন মানুষের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, শারীরিক, মানসিক শক্তি—যা কিনা এখন পৃথক পৃথক ভাবে ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে—সব কিছুই সমাজের কল্যাণের জন্য কাজে লাগানো হবে।"

শিল্প, যান্ত্রিক দক্ষতা, বুদ্ধি এবং হাতের কাজ—এ সবই প্রয়োগ করবার ব্যাপক ক্ষেত্র মিলবে ; যন্ত্রপাতি তৈরির প্রতিটি শাখাতেই শ্রমিকরা কাজ পাবে ; স্থাপত্য-শিল্পসমৃদ্ধ অট্টালিকা, আলো, বাতাস, উত্তাপ, সর্বপ্রকার যান্ত্রিক সুব্যবস্থা, জলসরবরাহ প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি কাজে লাগাতে পারবে।

কারখানাগুলি এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হলে যন্ত্রশক্তি, তাপবিদ্যুৎ, সময়, জীবনধারণের ও কাজের সুবিধা, সব দিক থেকে সাশ্রয় হয়। বাসস্থানগুলি হবে কলকারখানা থেকে পৃথক ও সেখানকার অসুবিধাগুলি থেকে মুক্ত। অবশ্য কলকারখানাগুলিও যাতে পরিচ্ছন্ন ও রোগজীবাণুমুক্ত হয় তাও দেখা হবে। আমরা জানি যে যান্ত্রিক উন্নতির জন্য ইতিমধ্যেই কিছু কিছু অত্যন্ত বিপজ্জনক কাজের ক্ষেত্রে উন্নতি হয়েছে, যেমন খনি শ্রমিকদের বিপজ্জনক কার্যক্ষেত্রের কথা বলা যায়। আর এ বিষয়েও সন্দেহ নেই যে খনি শ্রমিকদের আরো বহু রকমের উন্নতি করা সম্ভব। রাসায়নিক ও যান্ত্রিক উপায়ের মাধ্যমে ধোঁয়া, ঝুলকালি, ধুলো, দুর্গন্ধ থেকে রক্ষা পাবার ব্যবস্থা করা গেছে। ভবিষ্যৎ সমাজের কলকারখানাগুলির, সে মাটির নিচেই হোক আর উপরেই হোক, অবস্থা বর্তমানের থেকে এতই তফাৎ হবে যেন অন্ধকার থেকে আলোয় পৌঁছবে, বর্তমানে এ সমস্ত জিনিসই ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রথা ও অর্থের সঙ্গে জড়িত। প্রথমেই চিন্তা করা হয় এ ব্যবসায় চলবে কি? এর থেকে কি লাভ হবে? যদি লাভ না হয়, তবে শ্রমিককে ছাটাই কর, যেখানে মুনাফা নেই সেখান থেকে পুঁজি সরে দাঁড়ায় ; লেনদেনের বাজারে মানবতার কোনো বিনিময় মূল্য নেই।

টাকার থলির স্বার্থে মানুষের জীবন নিয়ে যে কতদূর ছিনিমিনি খেলা যায় তা জাহাজ ও জলযানের ব্যবসার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। ১৮৭০ সালেই ইংরাজ পুঁজিপতিদের ভয়াবহ বেপরোয়া কার্যকলাপ দেখে দুনিয়া শিউরে উঠেছে। কিন্তু তবুও অন্যত্র সেই একই ঘটনা ঘটছে। শুধু ইংরাজ পুঁজিপতিরাই বিবেকের বালাই জলাঞ্জলি দিয়ে ব্যবসায় মুনাফা লুঠতে পারে তা নয়।* কিন্তু তার জন্য এখন পর্যন্ত রাষ্ট্র কি করেছে? নদীতে পোতাশ্রয়ে ঢুকবার মুখে কয়েকটি বিপজ্জনক স্থলে মাত্র লাইট হাউজ ও সিগনাল জাহাজ

* একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকায় সমালোচনায় পুঁজির দুর্বলতার কথা বলা হয়েছে। তা সঠিক নয়। পুঁজি কোনো মুনাফাই বন্ধ দেয় না, যেমন প্রকৃতির কোথাও শূন্য থাকে না। মুনাফা দ্বারা পুঁজি শক্তিশালী হয়। শতকরা দশ ভাগ মুনাফা হলেই যে কোনো জায়গায় পুঁজি খাটানো হয়ে থাকে। শতকরা বিশভাগ মুনাফা হলে, আগ্রহ আরো বাড়ে, ৫০ ভাগ হলে কথাই নেই, শতকরা একশ' ভাগ লাভ হলে এখন আর কোনো আইন কানুন মানবারই প্রয়োজন হয় না। আর যদি শতকরা ৩০০ ভাগ মুনাফা হয় তবে এমন কোনো অপরাধ নেই যা সে করতে পারে না, এমন কোনো ঝুঁকি নেই, যা সে নিতে পারে না, এমনকি তাতে যদি

রাখার ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া সমগ্র উপকূল ভাগই অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে। বাকিটা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে কিছু কিছু লোকের ব্যক্তিগত বদান্যতার উপর, যারা অনেকগুলি লাইফ-বোট স্টেশন তৈরি করেছে এবং অনেক জীবনকেও রক্ষা করে থাকে। কিন্তু এ ব্যবস্থা খুব অল্প জায়গায়ই আছে। আর সমুদ্রের মধ্যে হঠাৎ জাহাজডুবির হাত থেকে রক্ষা পাবার ব্যবস্থাও নেই। আমাদের এখান থেকে যে সব জাহাজ বাইরে যায় তার দিকে তাকালেই অবস্থাটা বোঝা যাবে। যাবার সময় জাহাজগুলিতে ১০০০ থেকে ১৩ শতের মত যাত্রী বোঝাই থাকে। তার সঙ্গে নৌকো যদি থাকে সেগুলিতে বড়জোড় ২০০ থেকে ২৫০ যাত্রী ধরে। যদি খুব তৎপরতার সঙ্গেও সেগুলি কাজ করতে পারে তবুও বড়জোড় এক-চতুর্থাংশ বা একপঞ্চমাংশ যাত্রীর প্রাণ রক্ষা করতে পারে। তাও অবশ্য সব সময় প্রায় অসম্ভব মনে করা যেতে পারে। বলতে গেলে চার ভাগের তিন ভাগ বা পাঁচ ভাগের চার ভাগ যাত্রীদের জন্য তথাকথিত সাঁতার কাটার বেল্ট ছাড়া আর কিছুই থাকে না, যেগুলি কিনা যাত্রীরা জীবিত থাকলে অন্ততঃ কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত তাদের জলের উপরে রেখে দিতে পাবে। দুর্ঘটনা যদি রাত্রে ঘটে, তবে সে বেল্টগুলি কোনো কাজেই আসে না। আর দিনে ঘটলেও কোনো কাজেই আসে না যদি না কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেদিক দিয়েই অন্য কোনো জাহাজ এসে গিয়ে তাদের না উদ্ধার করে। কারণ দূরের কোনো জাহাজ থেকে জলে ভাসা মানুষের মাথা প্রায় দেখাই যায় না। এই অবস্থায় দুর্ঘটনায় পড়লে যাত্রীদের জীবন-মরণ সন্ধিক্ষণে মহা সঙ্কটে প্রতি মুহূর্তে কাটাতে হয়। যখন ১৮৮৩ সালের জানুয়ারিতে "কিমব্রিয়া"র (Cimbria) ভয়ংকর দুর্ঘটনা হল, তখন সারা দুনিয়া চিৎকার করে বলেছিল যে এরকম দুর্ঘটনার বিরুদ্ধে যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেওয়া হ'ক। কিন্তু তার জন্য প্রকৃত ব্যবস্থা তো নেওয়া হয়নি—প্রয়োজন মতো দুর্ঘটনার সময় নৌকোয় করে যতজন যাত্রীকে রক্ষা করা যায়, তার চেয়ে বেশি যাত্রী কোনো জাহাজে তোলাটাই বেআইনী ঘোষণা করার প্রয়োজন ছিল। অর্থাৎ না হয় যাত্রীদের সংখ্যা কমাতে হবে, অথবা তাদের জীবন বাঁচাবার জন্য যাতে আরো বেশি নৌকো নিয়ে যেতে পারে তার জন্য জাহাজের আয়তন আরো বাড়াতে হবে। এই উভয় প্রস্তাবই পুঁজির স্বার্থের বিপরীত, তাহলে পুঁজিপতিদের কাছে জাহাজের ব্যবসায়ে পুঁজি খাটালে লাভজনক হবে না, তাই বুর্জোয়া সমাজে কখনো সে সব পরিকল্পনা নিতে পারে না। বলা-

---

সেই পুঁজির মালিককে ফাঁসিতেও ঝুলতে হয় তা-ও সই। মুনাফার জন্য ঝগড়া, দ্বন্দ্ব সব কিছুই করতে পারে। চোরাকারবারী ও দাসব্যবসা থেকেই তার যথেষ্ট প্রমাণ মিলেছে।" —T. J. Dunning, কার্লমার্কস তাঁর ক্যাপিটাল গ্রন্থে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। (Karl Marx, Das Kapital, Second Edition, note 250 (See Capital, Volume I, Moscow, 1954, Footnote 4, P. 760).

বাহুল্য উপরোক্ত ব্যবস্থা ছাড়াও মানুষের জীবন রক্ষা করবার জন্য আরো অনেক ব্যবস্থাই করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে সমস্ত সভ্য দেশগুলিই প্রভূত উন্নতি করতে পারবে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে মুনাফার প্রশ্নটাঃ আর থাকবে না। সে সমাজের সব ব্যবস্থাই জনগণের কল্যাণের দিকে তাকিয়ে হবে। যাতে জনগণের উপকার হবে, তাদের স্বার্থ রক্ষা হবে তাই করা হবে, আর যাতে তাদের ক্ষতি হবে তা করা হবে না। কোনো মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে কখনই কোনো বিপজ্জনক কাজে নিয়োগ করা হবে না। যদি কোনো কাজে বিপদের আশংকা থাকে তবে অনেকে নিজে থেকেও সে কাজে যোগ দিতে ইচ্ছুক হবে. বিশেষ করে সে কাজের উদ্দেশ্য যদি ধ্বংসমূলক না হয়ে সভ্যতার বিস্তারের সহায়ক হয়।

যন্ত্রপাতির উন্নতি, তার উন্নত প্রয়োগ ব্যবস্থা, মানুষের মধ্যে সুষ্ঠু কর্মবিভাগ ও শ্রমশক্তিগুলির যথোচিত সমন্বয়ের ফলে ক্রমশঃ প্রয়োজনের ব্যবহারিক জিনিসপত্র উৎপাদন করতে অনেক কম সময় লাগবে। পুঁজিপতিরা এমনকি উৎপাদন অতিরিক্ত হয়ে গেলেও, যখনই পারে কাজের সময় বাড়িয়ে দেয় যাতে তারা শ্রমিকদের আরো বেশি বেশি শোষণ করে কমদামে জিনিস বিক্রি করতে পারে। সমাজতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে সকলেই তার সুবিধা পায় আর কাজের সময়ও কমিয়ে দেওয়া হয়। সর্বরকম চালিকা শক্তিগুলির মধ্যে বিদ্যুৎ শক্তির প্রাধান্যই সবচেয়ে বেশি। বুর্জোয়া সমাজ ইতিমধ্যেই সবদিক থেকে এর ব্যবহার শুরু করেছে। এই বিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহার যত ব্যাপকভাবে ও যত সফলভাবে করা যায় ততই ভাল। সবচেয়ে শক্তিমান এই প্রাকৃতিক শক্তি বুর্জোয়া দুনিয়ার শৃংখল চূর্ণ করে সমাজতন্ত্রের পথ পরিষ্কার করে দেবে। কিন্তু বিদ্যুৎ শক্তির পূর্ণ বিকাশ ও তার ব্যাপক প্রয়োগ সমাজতান্ত্রিক সমাজেই হবে। মানুষের অবস্থার উন্নতি বিধানে এই শক্তি প্রভূত কাজ করবে। অন্যান্য চালিকা শক্তির চেয়ে বিদ্যুৎ শক্তির প্রাধান্য এইখানেই যে এই শক্তিকে গ্যাস, বাষ্প প্রভৃতির মতো তৈরি করতে হয় না, প্রকৃতির মধ্যেই সর্বত্র এই শক্তি বিদ্যমান থাকে। জলের গতি, সমুদ্রের স্রোত, বায়ু—এগুলিকে ঠিকমত কাজে লাগাতে পারলে অসংখ্য অশ্বশক্তি পাওয়া যায়। নানা প্রকার আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতে কত যে উন্নতি সাধন হতে পারে তা কিছু কিছু ধারণা করতে পারলেও এখন তার সম্যক উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

সুতরাং ভবিষ্যতে কত পরিমাণে, কত প্রকারের এবং কত উন্নত ধরনের দ্রব্য সামগ্রী প্রস্তুত করা যেতে পারে এবং মানুষের সুখ সুবিধার জন্য ও ভবিষ্যত বংশধরদের জন্যও যে করা যেতে পারে তা আমরা ধারণা করতে পারি।

মানুষ স্বভাবতই চায় তার নিজের কাজ বেছে নেবার কর্মক্ষেত্র পরিবর্তন

করার স্বাধীনতা। ঠিক যেমন খুব ভাল খাবারও যদি একইভাবে রোজ রোজ খাওয়া যায় তবে তা ভাল লাগে না, ঠিক যেমনি একই কাজ করতে করতে একঘেয়ে লাগে। মানুষ তাহলে উৎসাহ ও আনন্দ ছাড়াই দায়ে পড়ে কাজ করে যায়। মানুষকে তার নিজের যোগ্যতা ও মানসিক ঝোঁক অনুযায়ী কাজ দিতে পারলে সে কাজও ভাল হয়, আর তার নিজস্ব সত্তারও বিকাশ লাভ করতে পারে। সমাজতান্ত্রিক সমাজে মানুষ সেই সুযোগ পেতে পারে। উৎপাদক শক্তির প্রভূত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন পদ্ধতিরও উন্নতির ফলে মানুষের কাজের সময় যেমন কমে যাবে তার দক্ষতাও তেমনি বেড়ে যাবে।

পুরানো শিক্ষানবিশী ধরন এমন কিছু কিছু কারিগরী শিল্পের ক্ষেত্র ছাড়া আর চলে না। নতুন সমাজের নতুন ব্যবস্থায় সে সব ক্ষেত্রেই নতুন পদ্ধতিও চালু হবে। এখনই প্রত্যেকটি কারখানায় দেখে থাকি যে শ্রমিকদের মধ্যে খুব কম সংখ্যাই আছে যারা আগে যে কাজে শিক্ষানবিশী করছে এখনও সেই কাজই করছে। শ্রমিকদের মধ্যে নানা রকমের লোক আছে। অল্প সময়ের মধ্যেই তারা বিভিন্ন প্রকারের কাজে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। একথা ঠিক যে বর্তমান কাজের পদ্ধতিতে তারা একঘেয়ে যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে ও অবশেষে নিজেরাই যেন যন্ত্রে পরিণত হয়ে যায়। কিন্তু ভিন্ন ধরনের সাংগঠনিক পদ্ধতিতে এ অবস্থার পরিবর্তন হয়ে যাবে। দক্ষতার সঙ্গে ও নিপুণতার সঙ্গে কাজ সম্পন্ন করার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে। যুবা বৃদ্ধ সকলেই নানা ধরনের হাতের কাজ অনায়াসেই শিখবার সুযোগ পাবে। বৈজ্ঞানিক শিক্ষার জন্য ল্যাবরেটারী ও উপযুক্ত শিক্ষক ও কর্মপদের ব্যবস্থা থাকবে। তখনই মানুষ বুঝতে পারবে যে এই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা মানুষের কি বিরাট সৃজনীশক্তিকে একেবারে নষ্ট করে ফেলেছে বা খর্ব করে রাখছে।

সুতরাং এই সমাজের পরিবর্তন যে শুধু বাঞ্ছনীয় তাই নয়, এই পরিবর্তনের উপরই যে আবার প্রতিটি ব্যক্তিরও সামগ্রিক উন্নতি নির্ভর করছে সেকথাও বোঝা দরকার। এখন মানুষের মুখ দেখেই বোঝা যায় সে কি ধরনের কাজ করে—কোনো একঘেয়ে কাজ করে, বা অলস বিলাসে দিন কাটায়, বা জবরদস্তি করে তাকে দিয়ে কাজ করানো হয়ে থাকে—সে অবস্থাও ক্রমে ক্রমে বদলে যাবে। বর্তমানে এ রকম লোক খুব কমই আছে যারা কাজের ধারা কিছু বদলাতে পারে বা বদলে থাকে।**

---

* "অন্যান্য স্থানের মত ইংলণ্ডের শ্রমিকদেরও নিজেদের ইচ্ছামত কর্মসংস্থানের কোনো সুযোগ নেই। তাদের একটা বাঁধা ধরা নিয়মের মধ্যে, অপরের ইচ্ছামত কাজে লাগতে হয়। প্রকৃত পক্ষে দাসত্বের অবস্থা ছাড়া আর সর্বত্রই তাদের ঐ এক অবস্থা।"—জন স্টুয়ার্ট মিল।

** একজন ফরাসী শ্রমিক সানফ্রানসিস্কো থেকে বাড়ি ফিরবার পথে লিখেছিল: আমি কখনো ভাবতে পারিনি যে কালিফোর্নিয়ায় বিভিন্ন ব্যবসায়ে আমি যেভাবে কাজ করেছি তা

কচিৎ কখনো এরকম মানুষ দেখা যায় যারা দিনের শারীরিক পরিশ্রমের শেষে কোনো মানসিক কাজের মধ্যে অবসর বিনোদন করে থাকে। অপরপক্ষে আমরা কিন্তু কখনো এরকম মানুষ দেখতে পাই যারা মানসিক পরিশ্রম করে থাকে, তারা কিছু কিছু শারীরিক পরিশ্রম, যেমন বাগান করা ইত্যাদি করে থাকে। স্বাস্থ্যের পক্ষে যে শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার কাজের সামঞ্জস্য দরকার তা সকলেই স্বীকার করবেন।

ভবিষ্যৎ সমাজে বহু প্রকারের এবং বহু সংখ্যক বিদ্বান ও শিল্পী থাকবে, যারা প্রতিদিন কিছু কিছু শ্রমসাধ্য শারীরিক পরিশ্রম করবে এবং বাকি সময় তারা নিজেদের রুচি অনুসারে অধ্যয়ন ও শিল্পকর্মে নিযুক্ত থাকতে পারবে।*

বর্তমানে শারীরিক ও মানসিক কাজের মধ্যে পরস্পর বিরোধিতা রয়েছে। শাসকশ্রেণী তাদের নিজেদের একচেটিয়া স্বার্থে সমস্ত বুদ্ধিজীবীদের কাজে লাগানোর জন্য যতদূর সম্ভব চেষ্টা করে থাকে। ভবিষ্যৎ সমাজে তা পারবে না, শারীরিক ও মানসিক কাজের মধ্যে দ্বন্দ্বের অবসান হয়ে যাবে।

এর থেকেই বোঝা যায় যে ভবিষ্যৎ সমাজে অতিরিক্ত উৎপাদন ও কাজের অভাবের সমস্যা থাকবে না। আমরা দেখেছি যে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুঁজিপতিদের ব্যক্তিগত মুনাফার দিকে তাকিয়েই উৎপাদন করার ফলে কোনো কোনো জিনিসের অতিরিক্ত উৎপাদন হয়ে যায়, যার জন্য আবার বাজার পাওয়া যায় না। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যেভাবে উৎপাদনের কাজ চলে, তাতে জনগণের ক্রয় ক্ষমতার উপর তার বিক্রয় নির্ভর করে। এই ক্রয় ক্ষমতা অধিকাংশ মানুষেরই খুব কম

কখনো আমার দ্বারা সম্ভব হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আমি ছাপার কাজ ছাড়া আর কোনো কাজেরই যোগ্য নই......কিন্তু এই দুঃসাহসিক অভিযানের দুনিয়ার মধ্যে পড়ে, যে দুনিয়ার মানুষ কিনা যত তাড়াতাড়ি তাদের গায়ের জামা বদলায়, তারও চেয়ে তাড়াতাড়ি ব্যবসা বদলাতে থাকে, আমিও অন্যদের মতই কাজ করেছি। খনির কাজে যখন লাভ ভাল হল না, আমি সে কাজ ছেড়ে দিয়ে শহরে চলে গেলাম, আমি টাইপ বসাবার কাজ করেছি, টালি বসাবার কাজ, লেড বসানোর কাজ ইত্যাদি একের পর এক করে গেছি।"
Cf. English Edition, Moscow, 1954, Foot note 2, P. 487.

* অনুকূল পরিস্থিতি হলে মানুষ যে কতদূর উন্নতি করতে পারে তা লিওনার্ডো দা ভিনচির (Leonardo da Vinci) উদাহরণ থেকে দেখা যায়, যিনি ছিলেন একাধারে একজন বড় চিত্রকর, প্রথম সারির ভাস্কর ও স্থপতি, নামকরা ইঞ্জিনিয়ার, সুদক্ষ সামরিক নেতা, বাদ্যকর এবং রচয়িতা। বেনভেনুটো সেলিনি (Benvenuto Cellini) ছিলেন একজন নামকরা স্বর্ণকার, মূর্তি নির্মাতা, উত্তম ভাস্কর, বিখ্যাত সামরিক কারিগর, প্রথম সারির সৈনিক, এবং একজন সুদক্ষ বাদ্যকর। একথা বললে ভুল হবে না যে অধিকাংশ মানুষই তাদের যোগ্যতা অনুসারে কাজ পায় না, কারণ তারা যে যে কর্মে নিযুক্ত হয় তা তাদের স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না, পরিস্থিতির চাপে পড়েই যে কোন কাজ তাদের নিতে হয়। এমন অনেক বাজে অধ্যাপক আছে যাদের জুতো বানাতে দিলে ভালো হত, আবার এমন অনেকে আছে যারা জুতো বানাচ্ছে, কিন্তু অধ্যাপনার কাজ পেলে তারা অনেক ভাল করতে পারত।

থাকে, কারণ তারা তাদের শ্রমের জন্য খুবই কম মজুরি পায়। আর যখনই তারা তাদের উদ্বৃত্ত শ্রম দিয়ে মালিকদের জন্য আর মুনাফা সৃষ্টি করতে পারে না, তখনই তাদের কাজ চলে যায়। সুতরাং মানুষের প্রয়োজন ও ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকে দুস্তর ব্যবধান। লক্ষ লক্ষ মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের প্রয়োজন অপূর্ণ থেকে যায়। ওদিকে বাজারে উদ্বৃত্ত দ্রব্যসামগ্রী মজুত থাকে, কিন্তু এদিকে ক্ষুধার্ত মানুষের প্রয়োজন মেটে না। আর বেকার শ্রমিক কাজ পায় না। পুঁজিপতিরা বলেঃ "তোমরা মর বাঁচ, জাহান্নামে যাও, ভবঘুরে বা দুর্বৃত্ত হয়ে যাও—আমি পুঁজিপতি, তার কি করব?" তাদের স্বার্থের দিক থেকে তারা ঠিকই বলে।

নতুন সমাজে এই সব দ্বন্দ্ব থাকবে না। আর টাকা জিনিসটাও এভাবে থাকবে না। টাকা জিনিসটা তো অন্যান্য পণ্যদ্রব্যেরই প্রতিভূ। নতুন সমাজে পণ্যদ্রব্য থাকবে না। আসবে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী, সামাজিক প্রয়োজনে যা কিছু উৎপাদন করা হবে। সেই সব দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করতে যতটা কাজের সময় লাগবে সেই অনুযায়ীই সেগুলির সামাজিক মূল্যের পরিমাপ পাওয়া যাবে। কোনো একটি বিভাগের দশ মিনিটের কাজ অপর একটি বিভাগের দশ মিনিটের সঙ্গেই বিনিময় করা যেতে পারে, তার চেয়ে বেশিও না, কমও না। কারণ সমাজের তো আর রোজগার করার ধান্দা থাকবে না, থাকবে মানুষের মধ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী সমমূল্যের জিনিসপত্রের আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করার কাজ। যেমন, সমাজ যদি দেখে যে প্রয়োজনীয় উৎপাদন করতে দিনে তিন ঘণ্টা কাজের প্রয়োজন, তবে দিনে তিন ঘণ্টা কাজেরই ব্যবস্থা করবে।* যদি সমাজ এগিয়ে যায়, আর উৎপাদনের পদ্ধতির এত উন্নতি হয় যে দিনে দুই ঘণ্টা কাজ করলেই সমগ্র প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী উৎপন্ন করা যায়, তবে দিনে দুই ঘণ্টা কাজের সময়ই নির্ধারিত করা হবে। আবার অধিকাংশ মানুষ যদি মনে করে যে তাদের উচ্চতর প্রয়োজন মেটাবার জন্য ২।৩ ঘণ্টা কাজ যথেষ্ট নয়, তবে তারা চার ঘণ্টা কাজের সময় ঠিক করবে। মানুষ নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী চলার স্বর্গসুখ ভোগ করতে পারবে।

প্রতিটি দ্রব্য উৎপাদন করতে কতটা সামাজিক কাজের সময় প্রয়োজন তার হিসাব করাও সহজ হবে।** সেই অনুযায়ী সামগ্রিক কাজের সময়ের সঙ্গে

* আমাদের মনে রাখতে হবে যে তখন উৎপাদনের যন্ত্রপাতি উন্নততর শীর্ষে উঠবে, এবং সমগ্র সমাজ উৎপাদনের কাজে লাগবে। সেই অবস্থায় দিনে তিনঘণ্টা খাটুনির কথাটা বরং খুব কম সময়ের চেয়ে খুব বেশি সময়ই মনে হতে পারে। ওয়েন (Owen) তাঁর সময়ে হিসাব করে দেখিয়েছিলেন—এই শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশে দু'ঘণ্টা কাজই যথেষ্ট হবে।

** "প্রতিটি উৎপাদনের মধ্যে কতখানি সামাজিক শ্রম আছে, তা তখন ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে দেখানোর দরকার হবে না। প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার থেকেই সোজাসুজি দেখা যাবে গড়ে

আংশিক কাজের সম্বন্ধও ঠিক করা হবে। মানুষ প্রয়োজন মতো কাজের সময় বাড়াতে বা কমাতে পারবে। মানুষ ইচ্ছা করলে আর একজনের জন্য কাজ করে দিতে পারবে, কিন্তু তাই বলে কেউ তাকে অন্যের জন্য কাজ করতে বাধ্য করতে পারবে না, বা তার কাজের বিনিময়ে তার প্রাপ্য দাবি থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না। যদি একটা ভাল পোশাকের মূল্য হয় কুড়ি ঘন্টা সামাজিক শ্রম, আর কেউ যদি চায় আঠার ঘন্টা সামাজিক শ্রমের মূল্যের একটি পোশাক তবে সে তার ইচ্ছে মতো তাই নিতে পারবে। এই ভাবেই মানুষ তার ইচ্ছে মতো চলতে পারবে। প্রত্যেকেই তার নিজের নিজের ন্যায্য প্রয়োজন মেটাতে পারবে, কিন্তু তার জন্য অন্য লোককে বঞ্চিত করতে হবে না। প্রত্যেকে সমাজের কাছ থেকে নিজের শ্রমের বিনিময়ে যোগ্য প্রতিদান পাবে, তার বেশিও না, কমও না।

"আর পরিশ্রমী ও অলসদের মধ্যে, বা বুদ্ধিমান ও বোকাদের মধ্যে যে তফাৎ আছে তার কি হবে?" এ প্রশ্নও শোনা যায়। সে সব তফাৎ থাকবে না, কারণ যে পরিস্থিতিতে ঐ সব তফাৎ সৃষ্টি হয়, সেই পরিস্থিতিই থাকবে না। বুর্জোয়া সমাজে পরিশ্রমের পুরস্কার ও অলসদের সাজার যে পদ্ধতি আছে, তাতে এই সমাজের মাপকাঠিতে বুদ্ধিমত্তার অবস্থাও বোঝা যায়। এই সমাজের কথা ধরলে অলস ব্যক্তি তাকেই বলা হয়, যাকে তার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই কর্মহীন করে, ভবঘুরে হয়ে যেতে বাধ্য করা হয়েছে। আর যে কিনা চতুর্দিকে দুর্নীতির মধ্যেই বেড়ে উঠে নিজেই জাহান্নামে গেছে। কিন্তু যে ভদ্রলোক ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিক হয়ে বিলাসিতার মধ্যে আলস্যে দিন কাটায় তাকে 'অলস' বললে খুবই দোষের হয়ে যাবে, তাকে বলা হয়ে থাকে "খুবই ভাল মানুষ"। আর বুদ্ধিমত্তার বিষয়টা যে কি ভাবে বিচার করা হয়ে থাকে, তা আমরা আগেই বলেছি।

মুক্ত সমাজের অবস্থাটা তাহলে কি দাঁড়াবে? প্রত্যেকেই সম্পূর্ণ সাম্যের

কতটা শ্রমের প্রয়োজন সমাজ তখন সহজেই মেনে দেখতে পারবে একটা স্টীম ইঞ্জিন তৈরী করতে কত ঘন্টা শ্রমের প্রয়োজন, ফসলের সময় এক বুশেল গম তুলতে কত ঘন্টা শ্রমের প্রয়োজন, অথবা কোনো বিশেষ ধরনের একশত বর্গগজ বস্ত্র তৈরী করতেই বা কত ঘন্টা শ্রমের প্রয়োজন। এইভাবে কোনো একটি জিনিসের উৎপাদনের চেয়ে অন্য জিনিসের উৎপাদনে কত বেশি বা কম পরিমাণের শ্রমের প্রয়োজন বা সময়ের প্রয়োজন তা সোজা-সুজিই জানতে পারা যাবে...সমাজ তখন উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, বিশেষতঃ শ্রমশক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, উৎপাদনের পরিকল্পনা করতে পারবে। কোন দ্রব্যের ব্যবহারিক প্রয়োজন কতখানি, আর তার জন্য কতটা শ্রমের প্রয়োজন সেই হিসাব অনুযায়ী উৎপাদন পরিকল্পনা করা যাবে। মানুষ তখন প্রত্যেকটি বিষয়েই অতি সহজে ব্যবস্থা করতে পারবে, 'মূল্য" নিয়ে এত বাগাড়ম্বরের দরকার হবে না।— F Engels, Herr Engen Duhring's Revolution in Science. (Cf. Anti-Duhring, English Edition, Moscow, 1962, P. 425).

ভিত্তিতে তার নিজের রুচি ও যোগ্যতা অনুযায়ী সামাজিক শ্রমে নিযুক্ত হবে, কাজের গুণগত পার্থক্য খুবই কম থাকবে। সমাজের নৈতিক আবহাওয়া পরস্পরের মধ্যে কর্মোদ্যোগ এনে দেবে ও পার্থক্য দূর করবে। কেউ যদি দেখে যে একটা বিশেষ কোনো শাখায় সে অপরের মতো কাজ করতে পারছে না, তাহলে অন্য যে জায়গায় গেলে সে ভাল কাজ করতে পারবে, সেখানেই যাবে। সেই পরিস্থিতিতে কারও অন্যের চেয়ে বেশি সুবিধাভোগী হবার অধিকারই থাকবে না। আর যদি কেউ জন্মগতভাবেই এমন অপারগ হয় যে শত সদিচ্ছা সত্ত্বেও সে অন্যদের মতো কাজ করে উঠতে পারছে না, তবে প্রকৃতির দোষের জন্য সমাজ তাকে দায়ী করতে পারে না। আবার যদি কেউ স্বভাবতই অন্যদের চেয়ে অনেক বেশী মেধাবী হয়, তাহলেও সমাজ তাকে পুরস্কৃত করতে বাধ্য নয়, কারণ সে তার নিজস্ব কোনো বাহাদুরি নয়।

গোটে (GOETHE) রাইন-এ যাবার সময় কলোন্ ক্যাথিড্রাল (COL-ONGNE CATHEDRAL) সম্বন্ধে পড়াশুনা করে পুঁথিপত্র থেকে আবিষ্কার করেছিলেন যে, প্রাচীন কালের এই সব বৃহৎ নির্মাণ কাজে ভাল কাজ পাবার জন্য সমস্ত শ্রমিকদের শুধু কাজের ঘন্টা হিসাবেই মজুরি দেওয়া হত। বুর্জোয়া সমাজই ফুরনের চুক্তিতে কাজের মান নষ্ট করে দেয়, আর তাদেরও পণ্যদ্রব্য হিসাবে কিনে নেয়। ফুরন-এর চুক্তি অনুযায়ী মজুরি দেবার প্রথা প্রবর্তন করে বুর্জোয়া সমাজ শ্রমিকদের অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে বাধ্য করে। আর শ্রমিকদের কম পয়সা দিয়ে মজুরি হ্রাস করিয়ে দেবার জন্যই বুর্জোয়ারা এ রকম করে থাকে। যাঁরা শারীরিক শ্রম করে তাঁদের মতো তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের বেলাতেও ঠিক একই জিনিস দেখা যায়। প্রত্যেকেই তার সমসাময়িক কাল ও পরিবেশের সৃষ্টি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে গোটে যদি একই অনুকূল পরিবেশের মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে না জন্মে চতুর্দশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করতেন, তাহলে তিনি একজন মহান কবি ও দার্শনিক না হয়ে একজন মস্ত বড় গীর্জার ধর্মযাজক হয়ে যেতেন এবং হয়তো সেন্ট আগস্টিনকেও ছাড়িয়ে যেতেন। আর গোটে অষ্টাদশ শতাব্দীতেই যদি অভিজাত ধনীর ছেলে হয়ে না জন্মে ফ্রাংকফুর্টের এক গরিব মুচির ছেলে হয়ে জন্মাতেন, তাহলে তিনি আর ওয়েমার (Weimar)-এর মস্ত বড় ডিউক হতে পারেতন না এবং বোধহয় সারা-জীবন তাঁর জুতো সেলাই করেই কাটত এবং একজন সম্মানিত সুদক্ষ মুচি হিসাবেই তাঁর মৃত্যু হতো। যদি প্রথম নেপোলিয়ান আর দশ বছর পরে

* সমস্ত সুসংবদ্ধ মনুষ্যই প্রায় একই ধরনের বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে জন্মায়, কিন্তু 'শিক্ষা', 'আইনকানুন' এবং 'পরিবেশের' দরুন পরে তাদের মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয়। ব্যক্তির স্বার্থ, প্রকৃত পক্ষে সর্বজনীন স্বার্থ বা সমাজের স্বার্থের সঙ্গে মিলে যায়।" **Helvetius : Ueber den Monschen and dessen Brziihung. (Man and his Education).**

জন্মাতেন, তাহলে তিনি কখনই ফ্রান্সের সম্রাট হতে পারতেন না। যদি বুদ্ধিমান মা-বাপের বুদ্ধিমান শিশুকেও জংলীদের মধ্যে ফেলে রাখা যায়, তবে বুদ্ধিমান হওয়া সত্ত্বেও সে জংলী হয়ে যাবে। যে যেমন তাকে সমাজই তেমনি তৈরি করেছে। ধ্যানধারণা শূন্য থেকে জন্মায় না, কোনো ব্যক্তিগত মানুষের মস্তিষ্কের সৃষ্টিও নয়, অথবা কোনো স্বর্গময় প্রেরণা থেকেও আসে না। ধ্যান-ধারণা মানুষের সামাজিক জীবন ও কর্ম থেকে তৈরি হয়, সমকালের প্রেরণা থেকে আসে। এ্যারিস্টটলের পক্ষে ডারউইন-এর চিন্তাধারা সম্ভব ছিল না এবং ডারউইন-এর পক্ষেও এ্যারিস্টটলের থেকে ভিন্ন চিন্তাধারাই অপরিহার্য ছিল। প্রত্যেকেই তাদের সমসাময়িক ভাবধারা ও পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়। সেজন্যই দেখা যায় যে বহু দূরে দূরে থাকা সত্ত্বেও ভিন্ন ভিন্ন মানুষ একই রকম চিন্তা করছে; একই রকম উদ্ভাবন বা আবিষ্কারের কাজ করছে, আবার দেখা যায় যে কোনো কোনো ধ্যানধারণা যদি অর্ধশতাব্দী আগে থেকেই প্রকাশিত হয়ে থাকে, তবে তা এখন মানুষের মধ্যে প্রেরণা সৃষ্টি করতে পারে না, কিন্তু অর্ধশতাব্দী বাদে ঠিকমত প্রয়োগ করতে পারলে সেই চিন্তাধারা থেকেই সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে থাকে। সম্রাট সিগিসমান্ড (Sigismund) ১৪১৭ খ্রীস্টাব্দে 'হাস' (Huss)-এ সাহস করে তাঁর কথা বলেছিলেন বলেই কনস্টান্স (Constance)-এ তাঁকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল আর অনেক বেশি গোঁড়া হওয়া সত্ত্বেও পঞ্চম চার্লস কিন্তু ১৫২১ খ্রীস্টাব্দে ওয়ারমুস (Worms)-এর ভোজসভা থেকে লুথারকে নির্বিঘ্নে যেতে দিয়েছিলেন। ধ্যানধারণাও সামাজিক ঘটনাবলীর সমন্বয়ে উৎপাদিত হয়ে থাকে। আধুনিক সমাজ ছাড়া আধুনিক চিন্তাধারা হতে পারে না। সে কথা স্পষ্ট এবং তর্কাতীত। তাছাড়া, নতুন সমাজব্যবস্থায় সভ্যতা কৃষ্টির উপায়গুলি প্রত্যেকেই ব্যবহার করবে। সেগুলি হবে সমগ্র সমাজের সম্পত্তি। আর তার জন্য সমাজ যা পাবে তার থেকে অধিক মূল্য দিতে পারে না, সে হল সমাজেরই সৃষ্টি।

শারীরিক শ্রম ও তথাকথিত মস্তিষ্কের কাজ সম্বন্ধে এই পর্যন্তই বলা যায়। এই একইভাবে আমরা একথাও বলতে পারি যে শারীরিক শ্রমের মধ্যেও উচ্চস্তরের ও নিম্নস্তরের শ্রম হিসাবে তফাৎ করা যায় না। যেমন বর্তমানে একজন মেকানিক মনে করে যে সে সাধারণ শ্রমিক, যারা রাস্তার কাজ করে বা ঐ ধরনের অন্য কাজ করে তাদের থেকে সে অনেক উচ্চস্তরের কাজ করে থাকে। যতক্ষণ সমাজ তার নিজের প্রয়োজনে কোনো কাজ করবে ততক্ষণ সে সমস্ত কাজেরই সমান মূল্য থাকবে। যে সব অপ্রীতিকর কাজ যান্ত্রিক সাহায্যে বা রাসায়নিক পদ্ধতিতে করা সম্ভব নয়, যা হয়তো ভবিষ্যতে সম্ভব হবে, সে সব কাজই কিছু কিছু করে ভাগ করে করা সমাজের সকলেরই কর্তব্য। প্রয়োজনীয়

শ্রমের ক্ষেত্রে মিথ্যে মর্যাদাবোধ বা নির্বোধ বা ঘৃণা পোষণ করার কোনো মানে হয় না। এসব জিনিস আমাদের এই পরগাছাদের সমাজেই সম্ভব। যেখানে অলস ব্যক্তিদের সৌভাগ্যবান বলে ঈর্ষা করা হয়ে থাকে, আর শ্রমিকদের অবজ্ঞার চোখে দেখা হয়ে থাকে। শ্রমিকদের কাজ যতই কঠিন শ্রমসাধ্য ও অপ্রীতিকর হয়ে থাকে, ততই দেখা যায় যে সে কাজ সমাজের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়। বাস্তবিক আমরা ধরেই নিতে পারি যে যে শ্রমিকের কাজ সবচেয়ে অপ্রীতিকর তাদের মাইনেও সবচেয়ে কম। এর কারণ, উৎপাদন প্রণালীর যেমন ক্রমশঃ বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে, ততই একটা মস্ত বড় বেকার বাহিনীও তৈরি হচ্ছে। বেকার শ্রমিকরা কোনো মতে জীবনধারণ করার তাগিদে যৎ-সামান্য মজুরিতে কাজ করে থাকে। তাই বুর্জোয়া দুনিয়ার পক্ষে সে সব কাজের ক্ষেত্রে উন্নত যান্ত্রিক পদ্ধতির বদলে এই বেকার বাহিনীকে জিইয়ে রাখাই লাভজনক। যেমন পাথর ভাঙার কাজ। এ কাজ হল সবচেয়ে অপ্রীতিকর, এবং এর জন্য মজুরি দেওয়া হয় সবচেয়ে কম। কিন্তু যন্ত্রের সাহায্যে অতি সহজেই পাথর ভাঙা যায়, যেমন উত্তর আমেরিকায় করা হয়ে থাকে কিন্তু আমাদের এখানে এত সস্তাতেই মজুর পাওয়া যায় যে মেশিনের চেয়ে কম খরচ লাগে। যুক্তির দিক থেকে দেখতে গেলে যে শ্রমিক রাস্তায় ময়লার কূপ পরিষ্কার করে মানুষকে বিষাক্ত গ্যাস থেকে বাঁচায়, সে সমাজের অনেক উপকার করে থাকে। আর যে অধ্যাপক ছাত্রদের শাসক শ্রেণীর স্বার্থে মিথ্যে ইতিহাস পড়ায় বা যে ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি অতি-প্রাকৃতিক ও অলৌকিক তত্ত্ব দ্বারা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে আচ্ছন্ন করে দেয় সে ব্যক্তি সমাজের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। বর্তমানে যে শ্রেণীর বিদ্বানরা আমাদের চাকরিগুলো দখল করে বসে আছে, তাদের মধ্যে অধিকাংশই বিজ্ঞানের নাম করে শাসকশ্রেণীর আধিপত্য বজায় রাখবার, তাকে সঠিক প্রমাণ করবার ও সমাজের পক্ষে তা ভাল ও প্রয়োজনীয় প্রমাণ করার জন্য বেতনভোগী হিসাবে কাজ করে থাকে। এইভাবে তারা মিথ্যে বিজ্ঞান প্রচার করে, মানুষের চিন্তাকে বিষাক্ত করে দেয় ও সমাজের শত্রু হিসাবে কাজ করে। আত্মিক গুণগুলিকে তারা বুর্জোয়া ও তাদের মক্কেলদের স্বার্থে বিক্রি করে দেয়।* যে সমাজে এই ধরনের সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর অস্তিত্ব অসম্ভব হয়ে যাবে, সেই সমাজেই হবে মানবতার মুক্তি।

অপরপক্ষে প্রকৃত বিজ্ঞানের কাজও অনেক সময় অপ্রীতিকর হয়ে থাকে, যেমন চিকিৎসককে মানুষের পচাগলা মৃতদেহ পরীক্ষা করতে হয়, পুঁজ ভর্তি

---

*"পণ্ডিতদের মধ্যে যেমন প্রগতি দেখা যায়, তেমনি অজ্ঞতাও দেখা যায়" Buckle: *History of ivilization.*

ফোঁড়া কাটতে হয়, বা কোনো কেমিস্টকে যখন কোনো নোংরা জিনিস পরীক্ষা করে দেখতে হয়। সুতরাং আমরা দেখতে পাই যে অনেক ক্ষেত্রেই সবচেয়ে অপ্রীতিকর কাজই সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায়। তাই কোন্ কাজটা প্রীতিকর আর কোন্ কাজটা অপ্রীতির সে সম্বন্ধে আমাদের বর্তমানের অনেক ধারণার মতো সে ধারণাটাও ভুল, তার উপরও তার কোনো মূল ভিত্তি নেই।

* * *

নতুন সমাজ ব্যবস্থায় সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থা বদলে যাবে। উৎপাদন করা হবে পণ্যের জন্য নয়, সমাজের প্রকৃত প্রয়োজনের জন্য। মুনাফার জন্য ব্যবসা আর থাকবে না। নানা বয়সের বিপুল সংখ্যক নারী ও পুরুষ তখন মুক্ত হয়ে যাবে উৎপাদনশীল শ্রমের জন্য। লক্ষ লক্ষ লোক, যারা অন্যের শ্রমের উপর পরগাছার জীবন যাপন করছে, তারা নিজেরাই উৎপাদনের কাজ করবে। সমাজ মানুষকে যেমন তৈরি করেছে, তার জন্য কোন মানুষই ব্যক্তিগতভাবে দায়ী নয়। এখন যে সব অসংখ্য দোকানপাট, ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্র সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে, তার বদলে গড়ে উঠবে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বড় বড় কেন্দ্র, যার জন্য কর্মী সংখ্যা অনেক কম লাগবে। পূর্বেকার সমস্ত ব্যবস্থার মধ্যেই বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে। ব্যবসাবাণিজ্য সব কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হবার সঙ্গে সঙ্গে যানবাহন ব্যবস্থায়ও পরিবর্তন আসবে।

ডাক-তার, রেল, ট্রাম, সমুদ্র ও নদীতে জলযান বা অন্য সমস্ত প্রকার সামাজিক যানবাহনই সমাজের সম্পত্তি। আর যেহেতু বর্তমানেই ডাক-তার, অধিকাংশ রেল রাষ্ট্রের হাতে রয়েছে, সেহেতু সেগুলিকে সামাজিক সম্পত্তিতে পরিণত করা সহজ হবে। এ সব ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থে আঘাত লাগার প্রশ্ন আসবে না। এদিক থেকে রাষ্ট্র যত অগ্রসর হতে পারে, ততই ভাল। কিন্তু এই রাষ্ট্রীয় প্রশাসন সমাজতান্ত্রিক প্রশাসনের থেকে অনেক তফাৎ। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয়করণ হলেও, ঐ সব প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানগুলির মতোই শোষণ চালিয়ে যায়। কর্মচারীরা বা শ্রমিকরা তার থেকে কোন সুবিধাই পায় না। রাষ্ট্র তাদের প্রতি ব্যক্তিগত মালিকদের মতোই ব্যবহার করে থাকে। যেমন দেখা গেল যে 'ইম্পিরিয়াল ম্যারাইন' নিয়ম জারি করল যে চল্লিশ বছরের অধিক বয়স্কদের চাকরির জন্য দরখাস্ত করার দরকার নেই। রাষ্ট্র যখন নিজেই মালিক হিসেবে এ রকম ফতোয়া জারি করে তখন তা ব্যক্তিগত মালিকদের কাছ থেকে আসা ফতোয়া থেকে বেশি ক্ষতিকারক হয়। কারণ ব্যক্তি-গত মালিকদের কারবার ছোট। একজন কাজ না দিলে অন্য জনের কাছে যাওয়া যায়। কিন্তু রাষ্ট্রের হাতে যখন রয়েছে একচেটিয়া কারবার, তখন তার একটা আঘাতই হাজার হাজার মানুষের দুর্দশা নিয়ে আসে। সুতরাং এই রাষ্ট্রায়ত্ত

ব্যবস্থা কোনো মতেই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা নয়, সম্পূর্ণই ধনতান্ত্রিক। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের শিল্প রাষ্ট্রীয়করণের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দুস্তর ব্যবধানের কথা সমাজতান্ত্রিকরা স্পষ্ট করেই তুলে ধরে। সমাজতান্ত্রিক প্রশাসনে কেউ মালিক থাকে না, কারও প্রাধান্য থাকে না, বা কেউ শোষক থাকে না। সকলেই সমান এবং সমান অধিকার ভোগ করে থাকে।

সুতরাং নানা ধরনের ব্যবসাদার, দালাল ও ব্যক্তিগত পুঁজিপতিদের বদলে যখন বৃহৎ বৃহৎ কেন্দ্রীয় উৎপাদন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে, তখন যানবাহন ব্যবস্থাও অনেক সরল হয়ে আসবে। আলাদা আলাদাভাবে অসংখ্য রকমের মালপত্র চলাচলের বদলে কেন্দ্রীয়ভাবে এক সঙ্গে পাঠানোর ব্যবস্থা হবে। তার জন্য সময়, পরিশ্রম, খরচ সব দিক থেকেই সাশ্রয় হবে। সব জিনিসটা সুশৃংখলভাবে চললে হৈ চৈ, হট্টগোল, আওয়াজ, মানুষের ভিড়, ঠেলাঠেলি সবই কমে আসবে। সঙ্গে সঙ্গে রাস্তাঘাট তৈরি করা, পরিষ্কার রাখা, জীবন যাপন করার ধরন-ধারণ সব কিছুতেই পরিবর্তন আসবে। স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা অতি সহজেই করা যাবে যা কিনা বর্তমানে প্রায় করাই যায় না, বা গেলেও শুধু ধনীদের এলাকায় করা যায়। 'সাধারণ মানুষ' তার সুবিধা পায় না।

প্রকৃতপক্ষে যানবাহনের সুযোগ সুবিধাগুলো যথাসম্ভব বাড়ানো যাবে ও বৈজ্ঞানিক উপায়গুলোকে কাজে লাগানো যাবে। সড়ক ও রেলপথের ধমনী থেকেই সারা দেশের শরীরে রক্ত সঞ্চালন হয়, অর্থাৎ সমগ্র সমাজের উৎপাদনের আদান-প্রদান হয়, মানুষের সঙ্গে পারস্পরিক যোগসূত্র রক্ষা হয়। তাই সমগ্র সমাজের মঙ্গল ও সভ্যতার উন্নতির জন্য সড়ক ও রেলপথের ভূমিকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সুতরাং সমাজের প্রয়োজনেই পথঘাট, যানবাহনের উন্নতি মারফত যথাসম্ভব দূরাঞ্চলের সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপন করার প্রয়োজন। অন্য সব ক্ষেত্রের মতো এক্ষেত্রেও বর্তমান সমাজের চেয়ে নতুন সমাজের উপর দায়িত্ব পড়বে অনেক বেশি। যানবাহন, যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসার ও উন্নতি দ্বারা শহর ও শিল্পাঞ্চলগুলির ভিড় কমে আসবে, কারণ দূরে দূরে অঞ্চলগুলিতেও শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থাও ছড়িয়ে পড়বে। মানুষের স্বাস্থ্য, মানসিক উন্নতি ও সভ্যতার অগ্রগতির জন্য এই পরিবর্তনের তাৎপর্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মানুষের পরিশ্রম করে উৎপাদন করার ও আদান প্রদান করার অন্যতম প্রধান উপায় হল মাটি বা ভূমি। এই ভূমির উপরেই মানুষ ও সমাজ বেঁচে আছে। যে ভূমি সমাজের সূচনাতেই ছিল, তাকেই আবার সমাজ নতুন করে তৈরি করে ব্যবহার করে, আমরা দেখতে পাই যে সভ্যতার একটা স্তরে এসেই পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জন্যই ভূমি ছিল সাধারণ সম্পত্তি। এই সাধারণ সম্পত্তি ছাড়া আদিম সমাজব্যবস্থা সম্ভব হত না। ভূমির উপর নানা প্রকার প্রাধান্য ও

ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে অধিকার স্থাপন করা হয়, তার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সংগ্রাম এখনো পর্যন্ত চলে আসছে। জমি চুরি করে নিয়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করার মধ্য দিয়েই দাসত্বের উৎপত্তি হয়। তারপর থেকে সমাজের বিভিন্ন স্তরে দাসত্বের থেকে আমাদের যুগের 'স্বাধীন' শ্রমিকদের যুগ পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে। অবশেষে হাজার হাজার বছরের অগ্রগতির পর সেই গোলামরাই আবার ভূমিকে পরিণত করবে সর্বসাধারণের সম্পত্তিতে।

ভারত, চীন, ইজিপ্ট, গ্রীস, রোমের মধ্যযুগ থেকে আজ পর্যন্ত—পৃথিবীর সর্বত্রই সামাজিক সংগ্রামের মূল কথাই হল মানবজাতির অস্তিত্বের জন্য ভূমি-ব্যবস্থার স্বীকৃতি দেওয়া। এমনকি এ্যাডলফ সামটের (Adloph Samter), অধ্যাপক এ্যাডলফ ওয়াগনার (Prof. Adolph Wagner), ডাঃ শ্যাফলি (Schaffle)-র মতো ব্যক্তি যাঁরা কিনা অন্যক্ষেত্রে সমাজ সংস্কারের মাঝামাঝি ব্যবস্থায় রাজী হতে পারেন, তারাও কিন্তু জমির উপর সর্বসাধারণের অধিকারকে ন্যায্য মনে করেন।*

সুতরাং জনগণের অবস্থার উন্নতির জন্য জমিতে লাভজনক চাষবাসের একান্তই প্রয়োজন রয়েছে। সকলের স্বার্থেই জমির উর্বরতার যথাসম্ভব উন্নতি করা দরকার। আমরা আগেই দেখিয়েছি যে, জমি যতক্ষণ ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়ে থাকে ততক্ষণ ছোট, বড়, মাঝারি কোনো ধরনের জমির চাষেরই সে রকম উন্নতি

* এমনকি আগের দিনের পোপ ও গীর্জার ধর্মযাজকরাও, যখন সাধারণের একসঙ্গে সম্পত্তি থাকার প্রথার ঐতিহ্য চলে আসছিল, আর জমি চুরি বেড়ে উঠছিল তখন জোরের সঙ্গে সাম্যবাদের পক্ষেও কথা না বলে পারেননি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আর তাদের গলার সে স্বর শোনা যায় না। রোমের পোপ এখন অন্য সকলের মতই, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও, বুর্জোয়া সমাজের শাসনাধীন। পোপ ক্লেমেন (Pope Clement) বলেছেন: "এ বিশ্বের সমস্ত জিনিসই সর্বসাধারণের ভোগ্য। এ কথা বলা অন্যায় যে, 'এটা আমার সম্পত্তি, আমার নিজের, ওটা অন্য একজনের'। এর থেকেই মানুষের মধ্যে বিবাদের উৎপত্তি হয়েছে"। বিশপ এ্যাম্ব্রসিয়াস মিলান (Bishop Ambrosius Milan) ৩৭৪ সালের কাছাকাছি কোনো সময় বলেছিলেন: "প্রকৃতি সবার জন্যই সমগ্র ঐশ্বর্য সাধারণভাবে দিয়েছে, কারণ ঈশ্বর সব কিছুর সৃষ্টি করেছেন সকলের ভোগের জন্যই এবং পৃথিবীও যাতে সবারই অধিকারে থাকতে পারে; সুতরাং সর্বজনীন অধিকারই হল প্রকৃতির বিধান, এবং অন্যায় অবিচারের দ্বারাই ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের সৃষ্টি হয়েছে।" পোপ গ্রেগরি দি গ্রেট (Pope Gregory the great) ৬০০ শতাব্দীর কাছাকাছি কোনো সময় বলেছিলেন: "তাদের জানা দরকার যে, যে-পৃথিবী থেকে তাদের সৃষ্টি হয়েছে, যে পৃথিবীতে তারা গড়ে উঠেছে, সে পৃথিবী সবারই জন্য, আর সে পৃথিবী যে ফলদায়িনী, তাও সর্বসাধারণের জন্যই, তার মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই।" আর একজন আধুনিক, জাচারিয়াস (Zacharias) বলেন. সভ্য দেশগুলির যত সব খারাপ জিনিসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হচ্ছে, তার সব কিছুর মূলেই রয়েছে জমির উপর ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রথা কায়েম রাখা।"—Forty Books on the State.

হতে পারে না। তাছাড়া, চাষ-বাসের চরম উন্নতি সাধন করতে হলে তা শুধু জাতীয় সীমার মধ্যে করা যায় না, আন্তর্জাতিক সম্বন্ধেরও প্রয়োজন।

প্রথমত সমাজকে দেখতে হবে জমির ভৌগোলিক পরিস্থিতি কি—পার্বত্য ভূমি, বা সমতল, বন, নদীনালা, জলা-জংগল প্রভৃতির হিসাব নিতে হবে। ভৌগোলিক পরিস্থিতির উপর আবহাওয়া ও জমির অবস্থা অনেকটা নির্ভর করে। এই সব অনুসন্ধান করে দেখা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর মধ্যে দিয়ে নতুন কর্মোদ্যোগ খুলে যাবে ও অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হবে। এদিক থেকে রাষ্ট্র এখনও পর্যন্ত বিশেষ কিছুই করেনি। একে তো এসব সমস্যা সমাধানের জন্য রাষ্ট্র থেকে খুবই সামান্য অর্থ ব্যয় করা হয়, তারপর ইচ্ছে করলেও রাষ্ট্র থেকে কিছু করা যায় না, কারণ বড় বড় ভূস্বামীরা, আইন কানুনের পিছনে যাদের হাত সবচেয়ে বেশি, তারাই বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর হাত না দিলে বর্তমান অবস্থায় রাষ্ট্রও আর বিশেষ কিছু করতে পারে না। কিন্তু রাষ্ট্রের নিজের অস্তিত্বই যে নির্ভর করছে পবিত্র কর্তব্য হিসাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষা করার উপর। আর বড় বড় ভূস্বামীরাই রাষ্ট্রের প্রধান খুঁটি। তাই স্বভাবতঃই তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের কোনো কিছু করার ক্ষমতাও নেই, ইচ্ছাও নেই। সুতরাং নতুন সমাজকে জমির উন্নতির জন্য ব্যাপকভাবে কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

আর একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় হল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সর্বত্র নদীনালার সংযোগ ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে করা। বর্তমান সমাজে জলপথে জিনিস-পত্র আদান-প্রদান করা যায় বলে যে গুরুত্ব দেওয়া হয়, নতুন সমাজে তার প্রয়োজন হবে না। অপর পক্ষে নদী ও খালগুলি দেশের আবহাওয়ার উপর ভাল প্রভাব দেখাতে পারবে এবং জমির উর্বরতা বাড়াতে পারবে।

একথা সুবিদিত যে শুষ্ক আবহাওয়ার দেশগুলিতে জলীয় আবহাওয়ার দেশগুলির চেয়ে শীত ও গ্রীষ্ম উভয়েরই তীব্রতা অনেক বেশি দেখা যায়। যেমন সমুদ্র-উপকূলের অঞ্চলগুলিতে শীত-গ্রীষ্মের তীব্রতা দেখা যায় না, আর দেখা গেলেও তা সারা বছরের মধ্যে খুব অল্প সময়ের জন্য থাকে। শীত গ্রীষ্মের অত্যধিক তীব্রতা গাছপালা বা জীবজন্তু কারও পক্ষেই ভাল না। ব্যাপকভাবে খাল কাটার ব্যবস্থা করা গেলেও উপরোক্তভাবে গাছপালা লাগাবার ব্যবস্থা করা গেলে নিশ্চয়ই আবহাওয়া স্বাভাবিক রাখার পক্ষে সহায়ক হবে। সংগে সংগে বড় বড় জলাধারের সংগে যুক্ত এইরূপ বিস্তৃতভাবে খালকাটার ফলে নদীগুলিতে আর বরফ গলার দরুন বা বৃষ্টির দরুন জলস্ফীতি হয়ে যাতে কূল ভাসিয়ে নিয়ে না যায় তার সাহায্য করা হবে। তখন বন্যা ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে রোধ করা যাবে। আরো সম্ভবত জলের উপরিস্তর এত বিস্তীর্ণ হয়ে যাবার দরুন বাষ্প জমার ফলে বৃষ্টিপাতও নিয়মিত হবে। যে সব অঞ্চলে জমি চাষের

জন্য জলাভাব আছে, সে সব অঞ্চলে জলসরবরাহ করার জন্য জলবাহী মেশিন ও পাম্প বসানোরও সুবিধা হবে।

যে বিশাল ভূখণ্ড এতদিন পর্যন্ত প্রায় অকেজো হয়ে পড়ে আছে, সেগুলিকে কৃত্রিম সেচ ব্যবস্থার দ্বারা উর্বর জমিতে পরিণত করা যাবে। হয়তো যে সব জায়গায় এখন ভেড়াও চরে খেতে পারে না, বা যেখানে বড়জোর গোটা কয়েক পাইন গাছ মাত্র শীর্ণ ডালপালা আকাশে ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সে সব জায়গায় প্রভূত ফসল উৎপন্ন হতে পারবে, ঘন বসতি বসবে, মানুষ প্রচুর খাদ্য পাবে। তাছাড়া খাল কাটার মধ্যদিয়ে বদ্ধ জলাভূমির জল নিষ্কাশন হতে পারবে ও সেখানে চাষ বাস করা যাবে—যেমন করা গেছে পূর্ব জার্মানী ও ব্যাভেরিয়াতে। এইভাবে বহু ধারায় জলপ্রবাহের ফলে হয়তো মৎস্য চাষেরও সুবিধা হবে ও তার দ্বারা মানুষ পুষ্টিকর খাদ্য পাবে, আবার যে সব অঞ্চলে নদী নেই, সেই সব অঞ্চলের মানুষ গ্রীষ্মকালে এই খালের জলে স্নান করতে পারবে।

নিম্নোক্ত কয়েকটি উদাহরণ থেকেই বোঝা যাবে সেচের ফলে জমির উর্বরতা কতদূর বাড়তে পারে। ওয়েসেনফেল (weissenfels)-এর ৭½ হেক্টেয়ার সেচ এলাকায় জমিতে দ্বিতীয় চাষের সময় ৪৮০ হন্দর ঘাস উৎপাদন হয়, কিন্তু তার পাশেই অসেচ এলাকায় ৫ হেক্টেয়ার জমিতে মাত্র ৩২ হন্দর হয়, অর্থাৎ সেচ এলাকার ফসল প্রায় দশগুণ বেশি। স্যাকসনিতে ইসা (Elesa)-র কাছে সেচের দরুন ৬৫ একর লাভের অংক বেড়েছে ৫,৮৫০ মার্ক (২৯২ পাঃ ১০ শিঃ) থেকে ১১,১০০ মার্কে (৫৫৫ পাঃ)। জার্মানিতে এমন অঞ্চল আছে যেখানকার জমি শুধু বালি ভর্তি, এবং সেখানে কেবলমাত্র অত্যধিক বৃষ্টিপাত হলেই মোটামুটি ফসল হয়ে থাকে। সেই সব অঞ্চলের মধ্য দিয়ে খাল কেটে কেটে সেঁচের ব্যবস্থা করা যায়, তবে সেখানে খুব শীঘ্রই এখনকার চেয়ে পাঁচগুণ বা দশগুণ বেশি ফসল ফলতে পারে। স্পেনে এমনও দেখা গেছে যে সেচ এলাকার জমির ফসল অসেচ এলাকার জমির ফসলের চেয়ে ৩৭ গুণও বেশি হয়েছে। সুতরাং জল পেলে জমি থেকে খুবই ভাল খাদ্য উৎপন্ন হতে পারে।

এ সবের জন্য যেভাবে কাজ করা প্রয়োজন এবং সম্ভব তা কি কখনো ব্যক্তিগত জমির মালিকরা বা বর্তমানের রাষ্ট্রব্যবস্থা করতে পারে? বহু বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে যখন দেখি যে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়ে গেছে, তখন অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজনগুলি মেটাবার বেলাতেই কত ঢিমে তালে হিসাব নিকাশ করতে করতে এগোতে থাকে। রাষ্ট্র একরোখাভাবে সৈন্যদের জন্য ব্যারাক তৈরি করার কাজে যথেচ্ছ খরচ করে, সৈন্যবাহিনীর পিছনে অজস্র টাকা ঢালে। আর যখন তাদের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়, তখন অন্য সব লোকেরাও এসে সুযোগ-সুবিধা চায়। তখন বুর্জোয়াদের বাঁধাবুলি বলে থাকে: "আগে

তুমি নিজেকে সাহায্য কর, তারপর ঈশ্বর তোমাকে সাহায্য করবেন।" প্রত্যেকেই নিজের নিজের ধান্ধায় থাকে, সকলের জন্য কেউ ভাবে না। তার ফলে নদীগুলি থেকে বছর বছর বা বারে বারে বন্যা হতে থাকে। বিস্তীর্ণ উর্বর ভূখণ্ড প্লাবিত হয়ে যায়, অথবা বালি পাথর জঞ্জালে ভরে থাকে। গাছগুলি পড়ে যায়। বাড়ি ঘর সেতু, রাস্তাঘাট, নদীর কূল—সব ভেসে যায়। রেল পথ তলিয়ে যায়। গোরু বাছুর ডুবে যায়। মানুষের জীবনও হানি হয়। জমির উন্নতি নষ্ট হয়ে যায়। শস্যহানি হয়। তাছাড়া বন্যার কবলে পড়ার সম্ভাবনা আছে বলে অনেক ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে চাষের কাজ খুব কমই হয়, আর হলেও সামান্য কিছু ছোট-খাট জিনিস বোনা হয়, যাতে বন্যা এলে দ্বিগুণ ক্ষতি না হতে পারে।

আবার দেখা যায় যে, যেভাবে ব্যবসা বাণিজ্যের স্বার্থে সরকারী উদ্যোগে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বড় বড় নদীগুলির পলিব স্তর সাফ করা হয়ে থাকে তাতে বন্যা আরো বেড়েই যায়। তারপর প্রধানত ব্যক্তিগত মালিকরা যেভাবে পাহাড়ের উপরের গাছগুলিকে নষ্ট করে তাতে এ বিপদ আরো বেড়ে যায়। ব্যক্তিগত মুনাফার জন্য তারা যেভাবে বনসম্পদ ধ্বংস করে থাকে তার থেকে অনেক অঞ্চলের আবহাওয়া ও উর্বরতার অবনতি হয়েছে, যেমন প্রাশিয়া, পামেরানিয়া, কির্টারিয়া, ইতালী, ফ্রান্স ও স্পেনে এই অবনতি লক্ষ্য করা গেছে।

উচ্চ ভূখণ্ড থেকে গাছগুলি কেটে ফেলার দরুন বারে বারে বন্যা হয়ে থাকে। সুইজারল্যাণ্ড ও পোল্যাণ্ডের প্রধানতঃ বনভূমিগুলি ধ্বংস হয়ে যাবার জন্যই রাইন ও ভিসবুলাতে বন্যা হয়ে থাকে বলে বলা হয়। ম্যাডেইরা ফার্নিয়ান পার্বত্য অঞ্চলের বনভূমিগুলি নষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্যই ট্রিয়েটি ও ভেনিসের আবহাওয়ার অবনতি ঘটেছে, এবং সেই একই কারণে স্পেনের অনেক অংশে এবং এশিয়া দেশের যে সব অঞ্চল ছিল একদা অত্যন্ত শুকনো সেই সব অঞ্চলের উর্বরতা হ্রাস পেয়েছে।

স্বভাবতই নতুন সমাজ এই সব বড় বড় সমস্যা প্রথমেই সমাধান করে ফেলতে পারবে না, কিন্তু প্রথম থেকেই এগুলি সমাধান করবার জন্য যথাসম্ভব প্রচেষ্টা চালানো হবে। সে সমাজের লক্ষ্যই হবে এই ধরনের সমস্যাগুলির একেবারে সম্পূর্ণভাবে, কোনো ফাঁক না রেখে সমাধান করে ফেলা। নতুন সমাজ জনগণের জন্য এমন সব কাজ করে যেগুলির কথা বর্তমান সমাজ ভাবতেও পারে না।

সুতরাং নতুন সামাজিক পরিস্থিতিতে, নতুন সাংগঠনিক উদ্যোগে সমগ্র জমির চাষবাসের বহু উন্নতি হবে। জমির উর্বরতা বৃদ্ধি সম্বন্ধে যে সব কথা বলা হল তাছাড়া আরো নিম্নলিখিত কারণগুলি যোগ করা যায়ঃ—বর্তমানে বহু

বর্গমাইল* জমিতে ব্রান্ডি বা কড়া মদের জন্য আলু উৎপন্ন করা হয়ে থাকে। দুস্থ গরিব মানুষরাই সেই মদ খেয়ে থাকে। শরীর-মন চাংগা রাখবার জন্য তাদের সাধ্যের মধ্যে তারা এই মদই পেয়ে থাকে। নতুন সমাজের সভ্য মানুষের জন্য এই মদের প্রয়োজন হবে না। তাই তার জন্য এখন অতো আলু ও অন্যান্য শস্য এভাবে উৎপন্ন করার প্রয়োজন হবে না। তাতে বহু জমি ও মানুষের শ্রম মানুষের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদনের কাজে লাগানো যেতে পারবে। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি আমাদের সবচেয়ে উর্বরা শস্যক্ষেতগুলি কিভাবে বিটরুল উৎপাদনের গবেষণা করে নষ্ট করা হয়। আমাদের সেনাবাহিনীর জন্য, অসংগঠিত উৎপাদন ব্যবস্থার জন্য, যানবাহন ও কৃষি ব্যবস্থার জন্য সহস্র সহস্র ঘোড়ার প্রয়োজন হয়, আর তারই ফলে প্রয়োজন হয় বিশাল পশু চারণ ভূমির। নতুন সমাজ ব্যবস্থায় এই সব অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়ে গেলে বহু জমি ও মানুষের শ্রম সভ্যতার উন্নতির কাজে লাগানো যাবে।

ইতিমধ্যে চাষবাস নিয়ে অনেক বৈজ্ঞানিক গবেষণা শুরু হয়েছে। সব দিক নিয়েই আলোচনা চলছে। বন-সংরক্ষণ, সেচ ও জলনিকাশী ব্যবস্থা, বিভিন্ন ধরনের সব্জি, গাছপালা, ফল-ফুলের উৎপাদন ব্যবস্থা, পশু-খাদ্য, ভূমি সংরক্ষণ, পশুপালন ব্যবস্থা, জমির সার, রাসায়নিক গবেষণা, উপযুক্ত শস্য উৎপাদন ও যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা, সার, বীজ, কৃষি কাজের জন্য উপযুক্ত ঘরবাড়ি তৈরি করা, পর পর উপযুক্ত শস্য উৎপাদন, আবহাওয়ার অবস্থান—এ সমস্তই এখন বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয়বস্তু হয়েছে। প্রতিদিনই নতুন নতুন আবিষ্কার ও বিভিন্ন বিভাগের উন্নতি এগিয়ে চলেছে। জে ভি লিবিগ (J.V. Liebig)-এর সময় থেকে কৃষি একটি বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি অন্যতম প্রধান বিষয় বলে পরিগণিত হচ্ছে। অন্য যে কোনো উৎপাদনশীল কাজের তুলনায় কৃষিকার্যের প্রাধান্য ও তাৎপর্য বেড়ে গেছে। যদি আমরা এই বিষয়ে প্রভূত উন্নতিকে জার্মানির প্রকৃত কৃষি অবস্থার সংগে তুলনা করি তবে দেখা যাবে যে এই সব উন্নতির ফলে শুধু মুষ্টিমেয় ব্যক্তিগত মালিককরাই মুনাফা ভোগ করতে পারছে, জনগণের কাজে লাগছে না। শতকরা ৯০ ভাগ চাষীই এই বৈজ্ঞানিক উন্নতির কোনো সুবিধা ভোগ করতে পারছে না। এ ক্ষেত্রে নতুন সমাজ ব্যবস্থায় তত্ত্বগত এবং বাস্তবিক এই উভয় ক্ষেত্রেই প্রভূত উন্নতি করতে পারবে।

কৃষি ক্ষেত্রে কেন্দ্রিকরণের ফলে অনেক সুবিধা হতে পারে। বিচ্ছিন্ন টুকরো জমিগুলির মাঝখান থেকে বনজংগল রাস্তা ফুটপাতগুলি অপসারণ করলে অনেক নতুন জমি বেরিয়ে আসবে। পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন বিদ্যার প্রয়োগ করে চাষের

* জার্মান ভৌগোলিক মাইল =৭.৪ কিলোমিটার।

জন্য বড় বড় যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যাবে। তাতে এখন যে সব জমি অনাবাদি পড়ে আছে, সেখানে উন্নত চাষ হতে পারবে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জমির সার দেওয়া, ভাল করে লাঙল দেওয়া, সেচ ও জল ব্যবস্থা করা—এ সবের মধ্য দিয়ে সব রকমের জমি থেকেই ভাল ফসল পাওয়া যাবে। যদি শস্য বীজগুলি ঠিক মতো বেছে নেওয়া যায়, আর আগাছার হাত থেকে জমিগুলিকে ভালমত রক্ষা করা যায় তবে উৎপাদনের অনেক উন্নতি হতে পারে। আর বীজ বোনা, চারা পোতা, ফসল উৎপাদন করার সমস্ত কাজটাই করতে হবে যাতে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্যসামগ্রী উৎপাদন করা যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে। তখন ফল ও সব্জির ফলনের যে কতকগুলি উন্নতি হয়ে যাবে তা বর্তমানে ভাবাই যায় না। আস্তাবল, গোয়াল, গুদামঘর, সার রাখার ব্যবস্থা, পশুখাদ্যের উন্নতি—এসব থেকেও অনেক ভাল ফল পাওয়া যাবে, পশুপালন ও সার সংগ্রহের কাজেরও অনেক উন্নতি হবে। চাষবাসের যন্ত্রপাতিরও অনেক উন্নতি হয়ে যাবে। দুধ, ডিম, মাংস, মধু, উল প্রভৃতি যে সব জিনিস জীবজন্তু থেকে পাওয়া যায় তার ব্যবস্থাও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে করা হবে। জমিতে বীজ বোনা ও শস্য তোলার কাজগুলি সমস্ত শ্রমজীবী মানুষরা মিলিতভাবে করবে, তাই তারা আবহাওয়ার অবস্থা অনুযায়ী সুবিধামত সব কাজ করতে পারবে। শস্য শুকোবার জন্য বড় জায়গা থাকবে, যাতে আবহাওয়া খারাপ থাকলেও শস্যগুলি নষ্ট না হয়ে যায়, যেমন বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে।

সম্প্রতি রাত্রিতেও উৎপাদন করার জন্য যেভাবে বিদ্যুতের আলো ব্যবহার করার প্রচেষ্টা চলছে, তাতে নতুন একটা দিকও খুলে যাবে। বড় বড় চারাগাছের জন্য নির্মিত কাঁচের ঘরগুলিতে কৃত্রিম উপায়ে উত্তাপ সঞ্চারের মাধ্যমে ফল ও সব্জি উৎপাদনের অনেক উন্নতি হতে পারবে।

কিন্তু যেহেতু চাষের উন্নতির অনেকখানিই নির্ভর করছে জমিতে যথেষ্ট পরিমাণে সার দেবার ব্যবস্থার উপর, তাই জমির সার তৈরি করা ও তার সংরক্ষণ করাটা একটা মস্তবড় সামাজিক সমস্যায় দাঁড়িয়ে যায়*।

* "জমির উর্বরতার জন্য ও বরাবর উৎপাদন ব্যবস্থার জন্য একটা উপদেশের কথা আছে। সে উপদেশটি পালন করতে পারলে চাষের অনেক উপকার হতে পারে। এই উপদেশে বলা হয়েছে; 'চীনদেশের কুলীরা যেমন একবস্তা শস্য, বা এক হন্দর শস্য বা ক্যারট বা আলু শহরে বয়ে নিয়ে গেলে, সেই পরিমাণেই বা তার চেয়ে বেশি পরিমাণে শস্য সার বয়ে নিয়ে আসেন, ও জমিতে লাগান, প্রত্যেক চাষীকেই সে উদাহরণ অনুসরণ করা দরকার। কারণ তার জমির ফসলের জন্য সে সারের দরকার। এই সার আনবার খরচও কম হল, আর তাতে লাভও অনেক বেশি হল, ব্যাঙ্কের সুদের চেয়েও এর লাভ বেশি, এতে দশ বছরে জমির উৎপাদন দ্বিগুণ হয়ে যাবে, সে তখন অধিক সময় বা শ্রম ব্যয় না করেও অনেক বেশি শস্য, মাংস, পনির উৎপাদন করতে পারবে, আর সে চাষীর জমির উর্বরতার জন্য দুশ্চিন্তা করতে হবে না।......সমস্ত হাড়, ভুসা, ছাই, ধোওয়া বা না ধোওয়া জীবজন্তুর রক্ত, এবং

মানুষের জন্য যেমন খাদ্যের প্রয়োজন, জমির জন্য তেমনি সারের প্রয়োজন। আর প্রত্যেক মানুষের জন্য যেমন একই খাদ্য সমান উপযোগী নয়, তেমনি প্রত্যেক জমির জন্য একই রকমের সারও উপযোগী নয়। জমি থেকে একবারের শস্য যে পরিমাণে সার পদার্থ তুলে নিয়েছে, সেই পরিমাণে সারপদার্থ জমিতে আবার ফিরিয়ে দিতে হবে, আর পরের বারে যে শস্য উৎপাদন করা হবে তার উপযুক্ত সারও দিতে হবে। এই ক্ষেত্রে নতুন সমাজ ব্যবস্থায় রাসায়নিক বিদ্যার ও তার প্রয়োগের যে কতদূর উন্নতি হতে পারবে, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় তা ভাবাই যায় না।

মানুষের খাদ্য তৈরি করার জন্য আবার মানুষ ও জীবজন্তুর দেহনিঃসৃত বিষ্ঠা আবর্জনাও অনেক কাজে লাগে। তার থেকেও ভাল সার তৈরি হয়। তার জন্যও বর্তমানে কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা হয় না। ফসলের ক্ষতি হয়। ফসলের স্বল্পতার জন্য আবার দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। যে সমস্ত দেশ প্রধানতঃ ভূমি থেকে উৎপন্ন কাঁচামাল রপ্তানি করে থাকে, অথচ জমির জন্য যথেষ্ট সার পায় না তাদের ক্ষতি হচ্ছে সবচেয়ে বেশি—যেমন হাঙ্গেরী, রাশিয়া, ড্যানিউব অঞ্চল এবং আমেরিকা। একথা ঠিক যে মানুষ ও জীবজন্তুর বিষ্ঠার বদলে কৃত্রিম সার ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু দূরদেশ থেকে আমদানি করা সেই কৃত্রিম সার অধিক মূল্য দিয়ে আর কজন কৃষক কিনতে পারে? অথচ মনুষ্য ও জীব-জন্তুর বিষ্ঠা থেকে যে-সার হতে পারে তা তাদের হাতের কাছে থাকা সত্ত্বেও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কারণ এখন সেগুলি সংরক্ষণ করে কাজে লাগাবার ব্যবস্থা নেই। কৃত্রিম সারও প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট পাওয়া যায় না।

বর্তমানে জমির সারের জন্য প্রভূত পরিমাণে টাকা ব্যয় হয়ে থাকে। এ বাবদ জার্মানি প্রতি বৎসর সাত থেকে দশ লক্ষ মার্ক পর্যন্ত বিদেশে* দিয়ে থাকে। আর তার চারগুণ নষ্ট হয় দেশের মধ্যে। এটা একটা ভাববার কথা যে শহরের মানুষের মলমূত্র নদীর জলের সঙ্গে মিশে জল দূষিত করছে, অথচ, তার থেকে বহুল পরিমাণে সার উৎপাদন করা যায়। হিসাব করলে দেখা যাবে যে একটা মানুষের দেহনিঃসৃত মলমূত্র থেকে যে পরিমাণে সার উৎপাদন হতে

সবরকমের জঞ্জাল নির্দিষ্ট গুদামে সংরক্ষিত করতে হবে, এবং ব্যবহারের উপযোগী করে তৈরী করতে হবে। বিভিন্ন সরকার ও পুলিশের দেখা প্রয়োজন যে এসব জিনিসগুলি যাতে নষ্ট না হয় এবং তার জন্য উপযুক্ত ড্রেন ও গুদাম তৈরী করতে হবে'', Licleig Khemische Brefe (Chemical Letters)

* Carl Schober: Vortrag uber landwirthschaftliche, Kommunale and Volkswirthschafliche Bedentung der Stadtischen Abfallstoffe, etc."

(Lecture on agricultural, Communal and economic significance of Town Refuse, etc.) Berlin, 1877.

পারে, তাতে একটা মানুষের জন্য খাদ্য উৎপাদনের মতো সার জমিতে দেওয়া যেতে পারে। মানুষ ও জীবজন্তুর বিষ্ঠা ইত্যাদি ছাড়াও, রন্ধনশালা, কারখানা ইত্যাদি থেকে যত আবর্জনা বের হয় সে কথাও চিন্তা করে দেখা হয় না ও সেগুলিও নষ্ট করা হয়।

নতুন সমাজব্যবস্থা এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলির সমাধানের পথ নিশ্চয়ই পাবে। এখন এসব সমস্যাগুলি কোনোমতে জোড়াতালি দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা হয়ে থাকে। যেমন শহরে নালা-নর্দমা, জল নিকাশের ব্যবস্থাগুলির ব্যাপারে হয়ে থাকে। নতুন সমাজব্যবস্থায় এ সব সমস্যা সমাধানের নানা উপায় বের করা হবে। প্রথমেই চেষ্টা করা হবে বড় বড় শহরগুলি থেকে জনসংখ্যা নানা দিকে ছড়িয়ে দিয়ে সেখানকার জনসংখ্যার চাপ ক্রমশঃ হ্রাস করে দেওয়া।

শহরগুলি মস্ত বড় বড় হয়ে ওঠা মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়। বর্তমানে শিল্প ও অর্থনৈতিক পদ্ধতির জন্য ক্রমশঃ অধিক সংখ্যক মানুষ শহরের দিকে ছোটে। কারণ শহরেই আছে উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রগুলি। যানবাহনের ব্যবস্থা, রোজগারের উপায়, পুলিস, আদালত, সামরিক উচ্চ দপ্তর, সর্বোচ্চ আদালত। আবার শহরেই আছে বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়। সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলি, আমোদপ্রমোদের কেন্দ্র, ছবি প্রদর্শনী, সংগ্রহশালা, থিয়েটার হল প্রভৃতি সবকিছু। হাজার হাজার মানুষ আসে ভোগসুখের সন্ধানে, আবার হাজার হাজার মানুষ আসে সহজে উপার্জন করার ও নিজেদের পছন্দমত জীবনযাপন করার জন্য।

কিন্তু শহরগুলি যেভাবে বেড়েই চলেছে তাতে মনে হয় যেন একটা মানুষের শরীর ক্রমশঃ স্ফীত হচ্ছে আর পাগুলো ক্রমশঃ এমন ক্ষীণ হচ্ছে, যেন স্ফীতকায় শরীরের ভার আর বইতে পারবে না। শহরের চতুর্দিকে এবং তার লাগোয়া গ্রামগুলিতে—যেগুলি শহরের মতোই হয়ে উঠেছে, বেড়ে উঠেছে সর্বহারা মানুষের বিরাট সংখ্যা, সেখানকার প্রশাসন ব্যবস্থা মানুষের প্রয়োজন মেটাতে পারে না, ক্রমশঃ করের হার বাড়িয়ে চলে। এদিকে গ্রামগুলি শহরের মতো, আর শহরগুলি গ্রামের মতো বাড়তে বাড়তে গ্রামাঞ্চলের মতো একসাথে থাকে। কিন্তু তাদের কারোই অবস্থার উন্নতি হয় না, বরং অবনতিই হতে থাকে। জনগণের সমাবেশে এই কেন্দ্রগুলি বিপ্লবের কেন্দ্র হিসাবেই গড়ে ওঠে। নতুন সমাজ গড়ে ওঠার জন্য এর প্রয়োজন আছে। তারপর শহর থেকে গ্রামের দিকে মানুষ যেতে থাকবে এবং সেখানে নতুন অবস্থার উপযোগী নতুন কমিউন ব্যবস্থা গড়ে তুলবে যেখানে শিল্প ও কৃষি উভয় ক্ষেত্রেই কাজের সংস্থান থাকবে।

গ্রামের লোকেরা যখনই গ্রামে গ্রামে বর্তমান শহরের সুযোগসুবিধাগুলি পাবে, যেমন মিউজিয়াম, থিয়েটার, কনসার্ট হল, রিডিং রুম, লাইব্রেরী, ক্লাব, স্কুল ইত্যাদি, তখনই তারা গ্রামে ফিরে যেতে থাকবে। গ্রামাঞ্চলে তখন

শহরের সুযোগ সুবিধাগুলি থাকবে, অথচ তার অসুবিধাগুলি আর থাকবে না। তখন গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রা আরো স্বাস্থ্যকর ও সুখকর হবে। গ্রামের লোকেরা শিল্পজাত দ্রব্যের ও শহরের লোকেরা কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদনের কাজ ভাগাভাগি করে নেবে।

এ ক্ষেত্রেও বুর্জোয়ারা বছর বছর গ্রামাঞ্চলে শিল্পকেন্দ্র খুলে খুলে ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের পথ তৈরি করে দিচ্ছে। বড় বড় শহরের জীবনযাত্রার অসুবিধাগুলি, বেশি ভাড়া, বেশি মজুরি—এসবের দরুন মালিকরা এই পথ নিচ্ছে। আবার বড় বড় ভূস্বামীরাও কল-কারখানা খুলছে (চিনি, ব্রান্ডি, মদ, কাগজ—উৎপাদনের জন্য)।*

উৎপাদন ব্যবস্থাগুলি, খাদ্য-উৎপাদনের প্রতিষ্ঠানগুলি কেন্দ্রীভূত হয়ে গেলে সমস্ত রকম জঞ্জাল আবর্জনার সারগুলিও জমির উর্বরতা বাড়ানোর কাজে লাগানো যাবে। প্রতিটি কমিউনিস্ট যেন সভ্যতার এক একটি অঞ্চল হয়ে উঠবে, সেখানকার মানুষের নিজেদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অনেকটাই তারা উৎপাদন করতে পারবে। বিশেষ করে বাগানের কাজের খুবই উন্নতি হতে পারবে। গাছপালা, ফুলফল, শাকসব্জি ইত্যাদি যে জিনিসগুলোর জন্য বড় বড় যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় না, সেখানে মানুষ বহু কাজ করার সুযোগ পাবে।

গ্রাম ও শহরে জনসংখ্যা ছড়িয়ে যাবার দরুন যুগ যুগ ধরে গ্রাম ও শহরের মানুষের মধ্যে যে ব্যবধান চলে আসছে তা দূর হয়ে যাবে।

বর্তমানে বিচ্ছিন্নভাবে থাকার দরুন কৃষকরা সবরকম শিক্ষা সংস্কৃতির সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে যেভাবে দাসত্বের জীবন যাপন করছে তার অবসান হবে। তারা মুক্ত মানুষে পরিণত হবে, ** বড় শহরগুলো বিধ্বংস হওয়ার যে-ইচ্ছা প্রিন্স বিসমার্ক প্রকাশ করেছিলেন, তা তখন পূর্ণ হবে।

* বিসমার্ক (Bismark) তাঁর রাজ্যে একটি কাগজের কল চালু করেছেন—(অনুবাদক)।

** অধ্যাপক এ্যাডলফ ওয়াগনার (Prof. Adolph Wagner) তাঁর ইতিপূর্বে উল্লেখিত পুস্তকে মন্তব্য করেছেন: Lehbruch der politischen Ekonomic von Rau (Handbook of Political Economy by Rau): "ক্ষুদ্র চাষীদের ছোট ছোট সম্পত্তি একটা অর্থনৈতিক ভিত্তি তৈরী করে ফেলে, যা বদলানো যায় না, কারণ জনগণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, স্বাধীন কৃষক সমাজ তার মধ্যে আছে, এবং তাদের সমাজে ও রাজনীতিতে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে"। লেখক যদি ঐ জমির মালিক কৃষকদের বিষয়টি বড় করে দেখাতে চান, কারণ হয়তো তাঁর রক্ষণশীল বন্ধুবান্ধবদের কথা ভেবেই তিনি তা চান, তবুও তাঁকে স্বীকার করে নিতে হবে যে ঐ ছোট ছোট সম্পত্তির মালিকদের অবস্থাটাও দুর্ভাগ্যজনক। বর্তমান পরিস্থিতিতে কৃষকদের কাছে সংস্কৃতি পৌঁছায় না, তার অবস্থারও উন্নতি হয় না, এবং তার ফলে তারা সভ্যতার পথের বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যারা সেই অচল অনড় অবস্থাটা লাভজনক বলে সেই অবস্থাটাকেই পছন্দ করে তারা তার পক্ষে থাকতে পারে, কিন্তু যারা সভ্যতাকে ভালবাসে তারা থাকতে পারে না।

কাজ ও উৎপাদনের উপাদানের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব্যবস্থার অবসানের এবং সেগুলি সামাজিক সম্পত্তিতে পরিবর্তিত হবার সংগে সংগে আরো অনেক ক্ষতিকর বিষয় দূর হয়ে যাবে। সমগ্র সমাজই যখন নিয়োজিত থাকবে শ্রম, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের কাজে, তখন ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত ক্ষতিকর কাজগুলি রোধ করা যাবে। জালজুয়োচুরি, খাদ্যে ভেজাল দেওয়া, ফাটকা বাজারি—সব কিছুর ভিত্তি সবে যাবে। শেয়ার বাজার বন্ধক দেওয়া ইত্যাদি বন্ধ হয়ে যাবে। তখন সবাইকেই বাইবেলের প্রবাদের মতো 'মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আহার জোগাতে হবে', ("In the sweat of thy brow shalt thou eat bread",)। সেখানে আর কালো বাজারের ধনীদের সংগে সাধারণ মানুষের এমন তফাৎ থাকবে না। কিন্তু কেউই এখন অতিরিক্ত খাটুনিতে ভেঙে পড়বে না, সকলেরই স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হবে। তখন বর্তমান রাষ্ট্র-ব্যবস্থাও বিলুপ্ত হয়ে যাবে, আর তার জন্য কোন শূন্যতাও থাকবে না।

সমগ্র সমাজের সরকারী প্রতিনিধি হিসাবেই সামগ্রিক রূপে রাষ্ট্রব্যবস্থা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু তা ছিল শুধুমাত্র সেই শ্রেণীরই রাষ্ট্র, যে শ্রেণী কিনা, সাময়িকভাবে, গোটা সমাজেরই প্রতিনিধিত্ব করতে পেরেছিল। প্রাচীনকালে ছিল ক্রীতদাসদের প্রভুদের রাষ্ট্র, মধ্যযুগে ছিল সামন্ত প্রভুদের আর বর্তমানে রয়েছে বুর্জোয়াদের রাষ্ট্র। অবশেষে রাষ্ট্র যখন প্রকৃতই সমগ্র সমাজের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে, তখন রাষ্ট্রেরও প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। তখনই সমাজে এমন কোনো শ্রেণী না থাকে যাকে দমন করে রাখতে হয়। শ্রেণী শাসনের অবসানের সংগে সংগে, বিশৃংখল উৎপাদনের জন্য, ব্যক্তিগত মানুষের জীবন জীবিকা নির্বাহের জন্য সংগ্রাম ও সংঘাতের অবসানের সংগে সংগে আর দমনমূলক ব্যবস্থার প্রয়োজন থাকে না। তাই দমনমূলক বিশেষ শক্তি হিসেবে রাষ্ট্রের প্রয়োজনও ফুরিয়ে যায়। সমাজ পরিবর্তনের সংগে সংগে প্রথমেই সমগ্র সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে রাষ্ট্র যে কাজটি করে তা হল উৎপাদনের উপায়গুলিকে সব সামাজিক সম্পত্তি হিসেবে নিয়ে নেওয়া। এই কাজটিই হল স্বাধীনভাবে রাষ্ট্রের শেষ কাজ। সামাজিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে কোনো না কোনো পক্ষে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেই রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটে যায়, উৎপাদনের পদ্ধতি অনুযায়ী প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়ে যায়"*

রাষ্ট্রের বিলুপ্তির সংগে তার প্রতিনিধি মণ্ডলীরও অবসান হয়, যেমন—মন্ত্রীমণ্ডলী, সংসদ, সেনাবাহিনী, পুলিস, মিলিটারী, আইন-আদালত, সরকারী

* Frederich Engels: Herr Eugen Duhring's Umwalzung der wisse Schaft". (Mr. Eugen Duhring's Revolution of Science). (Cf. Auti-Duhring, English Edition, Moscow, 1962, pp. 384-385).

উকিল, জেলখানা, কব, ইত্যাদি সমগ্র রাজনৈতিক ব্যবস্থা। পুলিশ ফাঁড়ি, সৈন্যদের কেল্লা, জেলখানা, প্রশাসন ও আইন আদালতের স্থানগুলিতে তখন অনেক ভাল ভাল কাজ হতে পারে। তখন হাজার হাজার আইনকানুন, বিধি নিষেধের কাগজপত্রগুলো সব জঞ্জালে পরিণত হবে, সেগুলোর শুধু পুরাতন দিনের ইতিহাসের চিহ্ন হিসেবেই যা কিছু মূল্য ও মানুষের কিছু ঔৎসুক্য থাকবে। এখন যারা সংসদের মধ্যে বাকযুদ্ধ করে করে মস্ত মস্ত নেতা হয়ে বসে, আর মনে করে তারাই যেন দুনিয়াটাকে চালাচ্ছে, তাদের দিন চলে যাবে, দেখা দেবে নতুন প্রশাসন ব্যবস্থা, যার কাজ হবে কেমন করে সব চেয়ে ভাল উৎপাদন ব্যবস্থা, বিতরণ ব্যবস্থা ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা করা যায়, কেমন করে নতুন নতুন উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ করা যায়। এই সব প্রকৃত বাস্তব বিষয়গুলি নিয়ে সকলে ভাববে, কারণ তখন কেউই আর ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করবে না।

তখন হাজার হাজার মানুষ, যারা এতদিন রাষ্ট্রেব প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করছিল. তারা সমাজের উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে আত্মনিযোগ করবে। সামাজিক বা রাজনৈতিক অপরাধ বলেও আর কিছু থাকবে না। তখন সমাজে চোর থাকবে না। কারণ সকলেই নিজের নিজেব ইচ্ছামত, আর পাঁচজন প্রতিবেশির মত সৎভাবে উপার্জন করে খেতে পারবে। আর থাকবে না উচ্ছৃংখল ভবঘুরের দলও। আর খুনী ? তাই বা কেন থাকবে ? কেউ তো আর একজনকে মেরে নিজে বড় লোক হতে পারবে না। জাল জুয়াচুরি, প্রতারণা, দেউলিয়াপনা—এসব ? এসব অপরাধের পথ থাকবে না, কারণ ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রথমই দূর হয়ে যাবে। ঘরে আগুন লাগানো ? তাতে কার কি সুখ হবে ? কারণ নতুন সমাজব্যবস্থায় কেউ তো আর কাউকে ঘৃণা করবে না ? টাকাব জন্য এবং ধর্মের জন্য কলহ বিবাদও তখন থাকবে না।

এই ভাবেই নতুন সমাজে বর্তমান সমাজের সব রীতি নীতিগুলোই অলীক হয়ে যাবে। মা বাপরা এখন শিশুদের কাছে পরীর গল্প করে, তেমনি তখন তারা এই সমাজের গল্প করবে, আর শিশুরা কিছু না বুঝতে পেরে মাথা নাড়বে। সমাজ পরিবর্তনের নতুন ধ্যান ধারণার জন্য মানুষের উপর এখন যে অকথ্য নির্যাতন চলে তা শুনে মানুষ অবাক হয়ে যাবে। এখন যারা সমাজের গণ্যমান্য ক্ষমতাশালী ব্যক্তি রয়েছে তারা ইতিহাসের ছেঁড়া পাতার মত কোথায় উড়ে যাবে। মানুষ তখন মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবে।

তখন রাষ্ট্রের যে অবস্থা হবে, ধর্মেরও ঠিক সেই অবস্থাই হবে। ধর্মকে 'বিলুপ্ত' করা হবে না। ঈশ্বরকে সিংহাসনচ্যুত করা হবে না। মানুষের "হৃদয় থেকে ধর্মকে উপড়ে ফেলা হবে না" অথবা তার বদলে আর কোন বিষয় ঢুকিয়ে

দেওয়া হবে না। সোস্যাল ডিমোক্রাসির নামে নাস্তিক বলে যে সমস্ত কথা বলা হয়ে থাকে তার কিছুই করা হবে না। ওসব জবরদস্তির কাজ বুর্জোয়ারাই করে থাকে, যেমন তারা ফরাসী বিপ্লবের সময় করতে গিয়েছিল, যার জন্যে পরে পস্তাতে হয়েছে। ধর্ম নিজে থেকেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে, তার জন্য কোনো জবরদস্তি আক্রমণ করার প্রয়োজন হবে না।

ধর্মের মধ্য দিয়ে সমসাময়িক সমাজের অবস্থার একটা অলৌকিক রূপের সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। সমাজের পরিবর্তন ও অগ্রগতির সংগে সংগে ধর্মের চেহারাও পরিবর্তন হতে থাকে। শাসকশ্রেণী ধর্মের মধ্য দিয়ে নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রাখতে চেষ্টা করে। উচ্চবর্ণের লোকেরা নানাভাবে ধর্মের মাধ্যমে নিজেদের ক্ষমতা ও মর্যাদা বজায় রাখে।

সমাজের আদিম অবস্থায়, সভ্যতার প্রাথমিক স্তরে ধর্মের প্রতি মানুষের একটা অন্ধ বিশ্বাস ছিল। তার পরিবর্তনের স্তরে মানুষ বহু দেবতায় বিশ্বাস করত। তারপর ক্রমশঃ সভ্যতা সংস্কৃতির অগ্রগতির সংগে সংগে মানুষের মধ্যে একেশ্বরবাদ দেখা দিল। আসলে দেবতারা মানুষকে তৈরি করেনি, মানুষই নিজেদের জন্য দেবতাদের তৈরি করেছে। "মানুষ নিজেরই ভাবমূর্তি অনুযায়ী দেবতার সৃষ্টি করেছে, মানুষের ভাবমূর্তিতেই সে দেবতাকে তৈরি করেছে", তার উল্টোটা হয়নি। এমনকি একেশ্বরবাদও ক্রমশঃ ক্রমশঃ অবসান হয়ে আসছে, এবং তার জায়গায় দেখা দিচ্ছে সর্বেশ্বরবাদ বা ঈশ্বর ও সৃষ্টি যে অভেদ এই মতবাদ।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অগ্রগতির সংগে সংগে মানুষের অন্ধবিশ্বাস দূর হয়ে যাচ্ছে, বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধে আর অলৌকিক ধারণা থাকছে না। জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত শাস্ত্র, রসায়ন শাস্ত্রের অগ্রগতিতে মানুষ আর মহাপুণ্যকে স্বর্গ বলে মনে করছে না, নক্ষত্রমণ্ডলী সম্বন্ধে বাস্তব জ্ঞান লাভ করছে, দেবদূত বলে অন্ধ-বিশ্বাস আর পোষণ করছে না। শাসক শ্রেণী দেখছে তাদের নিজেদের অবস্থা বিপন্ন, তা দেখে ধর্মান্ধতাকে আশ্রয় করছে, বরাবরই সব শাসক শ্রেণীই যা করে এসেছে।* বুর্জোয়ারা কিছুই বিশ্বাস করে না, তারাই বিজ্ঞানের আবিষ্কার

---

* এ বিষয়ে প্রাচীন মতামত নিচের উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যাবে: "স্বেচ্ছাচারী শাসককে (প্রাচীন গ্রীসে সর্বোচ্চ শাসককে এই নামেই বলা হত) ধর্মের প্রতি অতিশয় আনুগত্য দেখাতেই হবে। কারণ জনগণ যদি তাকে ধার্মিক মনে করে তবে তার বেআইনি অত্যাচার, নিপীড়নকেও সহ্য করবে, এবং তার বিরুদ্ধে সহজে বিদ্রোহও করবে না, কারণ তারা মনে করবে তার পক্ষেই দেবতারা রয়েছে।"—Aristotle ; *Politics*. এ্যারিস্টটলের জন্ম হয়েছিল খৃঃ পূঃ ৩৮৪-তে, ম্যাসিডোনিয়ার স্ট্যাগিরাতে (Stagira), তাই তাঁকে প্রায়ই স্ট্যাগিরাইট (Stagirite) বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

"রাজপুত্রের পক্ষে সমস্ত ভাল মানবিক গুণাবলী থাকা প্রয়োজন, অন্ততঃ তাকে দেখে সে রকম গুণসম্পন্ন মনে হওয়া চাই, এবং সর্বোপরি, তাকে দেখে যেন পুণ্যবান, ধার্মিক মনে হয়।

করেছে, ধর্ম ও প্রভুত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস দূর করেছে ; তাদের লোক দেখানো ধর্ম-বিশ্বাস প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়। আর গীর্জাগুলো জেনেশুনে সেই কপট বন্ধুদের সাহায্য গ্রহণ করে কারণ তাদের সাহায্য এদের প্রয়োজন। আর বুর্জোয়ারা বলে থাকে "তবুও ধর্মটা সাধারণ মানুষের জন্য দরকার"।

নতুন সমাজব্যবস্থায় এসব ধান্দা থাকবে না। তার মূল লক্ষ হবে মানুষের অগ্রগতি আর প্রকৃত অকৃত্রিম বৈজ্ঞানিক বিকাশ, আর সেই লক্ষ্য পথেই সমাজ অগ্রসর হবে।

তারপর যারা ধর্মে বিশ্বাস রাখতে চায়, তারা অনায়াসেই নিজেদের সাথী-সংগীদের সংগে তা রাখতে পারে। সমাজ তার মধ্যে নাক গলাতে আসবে না। পুরোহিতকে অবশ্যই কোন সামাজিক শ্রমে অংশগ্রহণ করতে হবে। সেই কাজের মধ্য দিয়ে তার নতুন চেতনা জাগবে, আর হয়তো তারপর এমনও একটা সময় আসবে যখন সে বুঝতে পারবে যে, জীবনের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য হল মানুষের মত মানুষ হওয়া।

ন্যায়নীতির বিষয়টির সংগে ধর্মের কোনো সম্বন্ধ নেই। যারা এই দুটো জিনিসকে মেলাতে চায় তারা হয় নির্বোধ অথবা প্রবঞ্চক! ন্যায়নীতি নির্ধারণ করে থাকে মানুষ কেমন করে চলবে, মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধ কেমন হবে। আর ধর্ম ঠিক করে দেয় মানুষ একটা অলৌকিক কিছুর বিষয়ে কি করবে। কিন্তু ঠিক ধর্মের মতই মানুষের ন্যায় নীতির ধ্যানধারণাও তদানীন্তন সামাজিক অবস্থার থেকে উদ্ভূত।

রাক্ষসরা মানুষ খাওয়াটাকে খুব নৈতিক কাজ মনে করে। গ্রীক ও রোমানরা ক্রীতদাস প্রথাটাকে নৈতিক মনে করত। মধ্যযুগের সামন্ত প্রভুরা ভূমিদাস প্রথাকে নৈতিক মনে করত, আধুনিক যুগের পুঁজিপতিরা মনে করে যে কারখানার শ্রমিকদের মজুরি দিয়ে কাজ করানোর প্রথাটাই আসলে নৈতিক কাজ, যদিও এই প্রথা থেকে নারী ও শিশুদের কারখানার ও রাত্রির কাজ করানোর থেকে অনৈতিক ব্যবস্থাই হয়ে থাকে। সমাজের পর পর চারটি স্তরে চার প্রকারের ন্যায়নীতির ধারণা দেখা গেছে। প্রত্যেক স্তরের নৈতিক ধ্যান-

---

তাতে যদি কেউ কেউ তাকে অন্য রকম দেখতে পায় তাহলেও তারা কিছু বলবে না, কারণ রাজপুত্রকে তার রাজকীয় সম্মানেই রক্ষা করে চলবে, এবং নিজের স্বার্থের খাতিরে তারা ভিন্ন ভিন্ন মনোভাব গ্রহণ করতে পারে। জনগণের অধিকাংশই মনে করবে যে সে একজন সম্মানিত ব্যক্তি, যদিও কোনো বিশ্বাসই রক্ষা করে না, বা ধর্মের প্রতিও তার কোনো আস্থা নেই। তবুও সে শুধু সাধু ব্যক্তির ভান করেই চালিয়ে যাবে, কারণ তার জন্য তো কোনো মূল্যই দিতে হয় না। তদুপরি ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্মযাজকদের প্রতি তার বিশেষ আগ্রহ দেখতে হবে।" ম্যাকিয়াভেলির (Machliavelli) বিখ্যাত পুস্তক : *The Prince*, অষ্টাদশ অধ্যায়। ম্যাকিয়াভেলি ১৪৬৯ এফ্লোরেন্সে জন্মগ্রহণ করেন।

ধারণাই তার পূর্বতন স্তরের থেকে উন্নত, কিন্তু তার কোনো ধ্যানধারণাই সর্বোৎকৃষ্ট নয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে সর্বোৎকৃষ্ট ন্যায়নীতির আদর্শের মধ্যে আছে মানুষের স্বাধীনতা এবং সকলের সমান অধিকার, সেই নীতির প্রথম কথাই হল "তুমি অন্যের প্রতি সেইরূপ ব্যবহারই করবে, তুমি তোমার নিজের প্রতি অন্যের কাছ থেকে যেমন ব্যবহার চাও"। উন্নত সামাজিক অবস্থার মধ্যেই মানুষের পরস্পরের প্রতি সেরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করা সম্ভব হতে পারে। মধ্যযুগের মানুষের সম্মান ছিল তার টাকা, আর ভবিষ্যতে মানুষের সম্মান হবে সে নিজে। আর সেই ভবিষ্যৎ হল সমাজতন্ত্রের রূপায়ণ।

* । *

কিছুদিন পূর্বে ডাঃ লাসকার (Dr. LASKER) বার্লিনে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তার মধ্যে তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে সমাজের সমস্ত মানুষের পক্ষেই সংস্কৃতির একই স্তরে পৌঁছানো সম্ভব।

হের লাসকার ছিলেন সমাজতন্ত্র বিরোধী ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির ও পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার কড়া সমর্থক। আর বর্তমানে সংস্কৃতির বিষয়টি যে টাকার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তা স্পষ্টই দেখা যায়। এই অবস্থায় সকলের পক্ষে একই সাংস্কৃতিক স্তরে পৌঁছানো যে কেমন করে সম্ভব তা বোঝা মুশকিল। কতিপয় সুবিধাভোগী ব্যক্তি সাংস্কৃতিক উচ্চস্তরে পৌঁছতে পারে, কিন্তু ব্যাপক জনগণ যতক্ষণ পরাধীন অবস্থার মধ্যে রয়েছে ততক্ষণ তাদের পক্ষে কখনই সংস্কৃতির উচ্চস্তরে পৌঁছানো সম্ভব নয়।*

নতুন সমাজব্যবস্থায় প্রত্যেকের জীবনের মানই একরকম হবে। মানুষের রুচি ও প্রয়োজনের পার্থক্য থাকবে, কিন্তু প্রত্যেকেই তার বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে সকলের সঙ্গে সহযোগিতায় নিজের জীবনকে বিকশিত করতে পারবে। অনেকে বলে থাকে যে সমাজতন্ত্র হলে সকলকে একই ছাঁচে ঢেলে সমান করে দেওয়া হবে। এ একটা অদ্ভুত, অসম্ভব কথা। তাহলে তো সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা যুক্তিযুক্তই হতে পারবে না, সেভাবে মানুষের প্রকৃতির বিরুদ্ধে গেলে তো

---

*দার্শনিক চিন্তার বিকাশের জন্য বাইরের জগতেও কিছুটা সভ্যতা ও উন্নতির প্রয়োজন। আমরা দেখতে পাই যে যে সব দেশে দার্শনিক চিন্তার বিকাশ হয়েছে, সে সব দেশের সভ্যতা ও উন্নতিও অনেকটা এগিয়ে গেছে।" —Tennemann. Note on Buckle's *History of English Civilization,* First Vol. Page 10.

"বস্তুজগতের ও চিন্তার জগতের প্রয়োজন একসঙ্গেই চলে; একটি বাদ দিয়ে অপরটি চলে না। এ ঠিক শরীর ও মনের মত একত্রে থাকে। বিচ্ছিন্ন করতে গেলেই মৃত্যু ঘটে। V, Thunen Der Isolirle Staat (The Isolated State).

"একথা ব্যক্তির পক্ষে এবং সমগ্র রাষ্ট্রের পক্ষেই খাটে যে বাস্তব প্রয়োজন মিটলেই মানুষের গুণাবলী ভাল কাজে লাগতে পারে"—Aristoste ; *Politics.*

মানবসমাজের স্বাভাবিক বিকাশই হতে পারবে না। সে রকম জবরদস্তি করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাও যায় না, আর স্বাভাবিকভাবে জোর করে করলে তা টিকতেও পাবে না। সমাজকে তার নিজের অন্তর্নিহিত নীতি অনুযায়ী বিকশিত হতে দিতে হবে। সমাজ ও মানুষের বিকাশের ধারাগুলি বুঝতে পারলেই পারস্পরিক সমতা বজায় রেখে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হবে এবং ভবিষ্যতের অগ্রগতির ভিত্তি স্থাপিত হতে পারবে।

যে শিশুই ভূমিষ্ঠ হবে, সে পুত্র বা কন্যা যাই হোক না কেন, তাকেই সমাজ আদর করে নেবে, কারণ সেই শিশুর মধ্যেই তো রয়েছে সমাজের ধারাবাহিকতা, সমাজের দীর্ঘস্থায়ী অস্তিত্ব। সুতরাং প্রতিটি নবজাতককে যথাসাধ্য প্রচেষ্টায় পরিপূর্ণ বিকশিত করে তোলা সমাজেরই স্বাভাবিক কর্তব্য। তাই যে মা শিশুকে স্তন্যপান করান তার যত্ন নিতে হবে সবার আগে। তার জন্য চাই উপযুক্ত বাসস্থান, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, এবং মাতৃত্বের এই স্তরের জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা। প্রসূতি মাতা ও শিশুর সুষ্ঠু পরিচর্যা ব্যবস্থা করতে হবে সবার আগে। স্বভাবতঃই যতদিন সম্ভব এবং প্রয়োজন শিশুকে মায়ের কাছে থাকতে দিতে হবে। মলিসফট, সন্যারিগার প্রমুখ স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীগণ এবং চিকিৎসকগণ এই মতই প্রকাশ করেছেন যে মাতৃস্তন্যই শিশুদের পক্ষে সবচেয়ে পুষ্টিকর খাদ্য।

শিশুরা বড় হয়ে উঠলেই তাদের সমবয়সী শিশুদের সংগে খেলাধুলা করবে একই অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে। তাদের শরীর ও মনের বিকাশের জন্য মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ী যথাসম্ভব ব্যবস্থা করা হবে। খেলাধুলার জন্য প্রশস্ত হলঘর ছাড়াও তাদের জন্য থাকবে কিন্ডার গার্ডেন. তারপর থাকবে খেলা ও কাজের সমন্বয় ব্যবস্থা, প্রাথমিক স্তরে জ্ঞান অর্জন ও কর্মশিক্ষার ব্যবস্থা। মানসিক ও শারীরিক শিক্ষা চর্চার মাধ্যমে—নানারকম খেলাধুলা, শরীর চর্চা, স্কেটিং, সাঁতার, মার্চ করে যাওয়া, কুস্তি লড়া—এ সবের মধ্য দিয়েই শিক্ষার পূর্ণতা লাভ হবে। এই শিক্ষার লক্ষ্য হবে শরীর ও মনের স্বাভাবিক বিকাশের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্পন্ন পরিশ্রমী জাতি গড়ে তোলা। শিশুরা ক্রমশঃ বড় হতে থাকবে ও নানা প্রকার কাজের সংগে পরিচিত হবে—উৎপাদনের কাজ, বাগান করার কাজ, কৃষির কাজ, কারিগরির কাজ প্রভৃতি কাজের সংগে পরিচিত হবে। আর ইতিমধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রেও তাদের মানসিক বিকাশ হতে থাকবে।

তদুপরি উৎপাদন ব্যবস্থায় যেমন সংশোধন ও উন্নতি হতে থাকবে, শিক্ষা ব্যবস্থাতেও তেমনি হবে। তখন অনেক বাতিল ও অনাবশ্যক বিষয় যেগুলি, সব বাদ দেওয়া হবে। তখন স্বাভাবিক বিষয় সম্বন্ধে স্বাভাবিক জ্ঞান অর্জনের

স্পৃহা দেখা যাবে। এখনকার মতো একটা বিষয়ের সঙ্গে আর একটা বিষয়ের দ্বন্দ্ব থাকবে না, যেমন এখন রয়েছে ধর্ম ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের মধ্যে। তখনকার সমাজের উন্নত অবস্থার সঙ্গে সংগতি রেখেই স্কুল, ক্লাসরুম, শিক্ষা দেবার উপায় ও পদ্ধতিগুলি উন্নতমানের হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বই, যন্ত্রপাতি, পোশাক খাবার দাবার—সব কিছুর সরবরাহের ব্যবস্থাই সমাজ করবে, তাই কেউ আর কারো চেয়ে সুবিধাভোগী হতে পারবে না।* শিক্ষকদের সংখ্যা ও যোগ্যতাও অন্য সবকিছুর সঙ্গে সংগতি রেখে চলবে। আদর্শ সমাজব্যবস্থায় ছাত্র-শিক্ষক সংখ্যার অনুপাতও নতুন করে নির্ধারিত হবে। সৈন্যবাহিনীতে এখন যেমন প্রতি দশজনে একজন অফিসার দেওয়া হয়, তেমনি শিক্ষাক্ষেত্রেও ছাত্র সংখ্যার অনুপাতে শিক্ষকের সংখ্যা বাড়াতে হবে।

এইভাবে তখন শিক্ষাব্যবস্থা হবে সকলের জন্য, এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে উভয়ের জন্যই। বিশেষ কোনো কার্যক্ষেত্রে অনিবার্য প্রয়োজন ছাড়া কোথাও ছেলে মেয়েদের মধ্যে পার্থক্য করা হবে না। শিক্ষাব্যবস্থা যোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হবে। সেই ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ছেলেমেয়েরা বড় হবে, নিজেদের ন্যায্য অধিকার ভোগ করতে পারবে, সমাজের প্রতি তাদের কর্তব্য সর্বতোভাবে পালন করতে পারবে। এইভাবে সমাজে যোগ্য মানুষ গড়ে উঠলে সমাজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও নিশ্চিত হওয়া যাবে।

বর্তমানের পচনধরা, ঘুণধরা সমাজের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ দিন দিন যেমন যুবকদের অপরাধ ও উচ্ছৃঙ্খলতা বেড়েই চলেছে, ভবিষ্যৎ সমাজে তেমন হবে না। বর্তমান সমাজের পারিবারিক জীবনের অস্থিরতা, সামাজিক জীবনের বিষময় প্রভাব, অশ্লীল বইপত্র, নির্লজ্জ যৌন প্রেরণা, পত্রপত্রিকার মাধ্যমে নানারূপ বিভ্রান্তিকর প্রচার, কারখানার ঘিঞ্জি বাসস্থান, যুবক যুবতীদের পক্ষে প্রয়োজনীয় পরিচালনা বা স্বাধীনতা এ দুটোরই অভাব, নিয়মশৃঙ্খলার শিক্ষার অভাব—এ সবের কারণেই এখন যুবকদের মধ্যে দেখা যায় অসভ্য ব্যবহার, উচ্ছৃঙ্খলতা, দুর্নীতি ও অশ্লীল রুচিবোধ ইত্যাদি। ভবিষ্যৎ সমাজে এ সবই অনায়াসেই

---

* কনডরসেট (Condorcet) তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনায় দাবী করেছেন: "শিক্ষা বিনামূল্যে হতে হবে, সকলকে একই শিক্ষা দিতে হবে, সবার জন্যই শিক্ষার সুযোগ খোলা থাকবে; শিক্ষাকে শারীরিক, মানসিক, শিল্পগত, রাজনীতিগত হতে হবে এবং তার উদ্দেশ্য হবে প্রকৃত সাম্য।"

রুশো (Roussean) ও তাঁর 'Political Economy'-তে সেই একই দাবী রেখেছেন, "সর্বোপরি শিক্ষা হবে সর্বজনীন, সাধারণ ও মিলিত, তার উদ্দেশ্য হবে মানুষকে ও নাগরিককে শিক্ষিত করে তোলা।

এ্যারিস্টটলও বলেছেন: "যেহেতু রাষ্ট্রের লক্ষ্যও একটিই, সেইহেতু সকলের জন্য একই শিক্ষার প্রয়োজন। আর সেই শিক্ষা দেবার দায়িত্ব রাষ্ট্রের, কারও ব্যক্তিগত দায়িত্ব নয়।"

দূর করা যাবে। তখনকার সামাজিক পরিবেশে এ সব জিনিস আর সম্ভব হবে না।

প্রকৃতি ও সমাজবিজ্ঞান একই নীতিতে চলে। পরিবেশের মধ্য দিয়েই ব্যাধি ও অভ্যন্তরীণ বিকার বেড়ে চলতে পারে।

একথা কেউই অস্বীকার করতে পারবে না যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে গুরুতর ত্রুটি রয়েছে। আর তাতে নিচের দিকের চেয়ে উচ্চ স্তরের স্কুল কলেজের ক্ষতি হয় বেশি। পাবলিক স্কুল বা ব্যয়বহুল বোর্ডিং স্কুল-গুলির চেয়ে গ্রামের ছোট ছোট স্কুলগুলি অনেক ভাল। তার কারণ বুঝতে বেশি দূর যেতে হবে না। সমাজের উচ্চশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিটি মানবিক লক্ষ্যই নষ্ট হয়ে যায়, সামনে কোনো আদর্শ ও লক্ষ্যের অভাবে সবই নষ্ট হয়ে যায়। তাদের মধ্যে থাকে শুধু যথেচ্ছ আমোদ প্রমোদের স্পৃহা, যার ফলে তাদের শরীর মন উভয়েরই ক্ষতি হয়। এই পরিবেশে তাছাড়া আর কিইবা হবে ? এরা শুধু স্থূল আমোদ স্ফূর্তি ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। আর বাপ-মার যখন প্রচুর পয়সা রয়েছে, তখন আর নিজেদের কষ্ট করারই বা কি প্রয়োজন ? আমাদের মধ্যবিত্ত ঘরের যুবকদের পক্ষে এক বছরের মিলিটারী সার্ভিস-এর পরীক্ষায় পাশ করলেই যথেষ্ট। এইটুকু লক্ষ্যে পেঁছিলেই তারা একেবারে কেউকেটা হয়ে গিয়েছে বলে মনে করে। তারপর তাদের জন্য যদি চাকরিও সংরক্ষিত থাকে তবে আর তাদের পায় কে ?

আর আমাদের মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা হয়ে উঠে যেন সাজ পোশাকের ফ্যাসানে ড্রইং রুমের ডল পুতুলের মতো, সারাক্ষণই মত্ত হয়ে থাকে একটা না একটা আমোদ প্রমোদে। অবশেষে তারা শিকার হয়ে পড়ে অবসাদ ও নানা রকম শারীরিক ও কাল্পনিক ব্যাধির। আর বুড়ো বয়সে তারা হয়ে যায় যেন আদর্শ পুণ্যবতী, দুনিয়ার সব দুর্নীতি থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে কেবল নীতি ও ধর্মের প্রচার করতে থাকে।

আর নিচের তলার মানুষদের বেলায় আমরা তাদের শিক্ষাদীক্ষা সংকুচিত করে রাখতে চেষ্টা করি। কারণ জনতা শিখে পড়ে চালাক হয়ে যেতে পারে। তাদের দাসত্বের অবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারে।

এই ভাবেই আমরা দেখতে পাই যে আধুনিক সমাজ অন্য সব বিষয়ের মত শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারেও যেন অসহায় অবস্থায় রয়েছে। ধর্ম প্রচারের কলকাঠি আঁকড়ে ধরার মধ্যেই এদের পাণ্ডিত্য শেষ হয়ে যায়।

নতুন সমাজ ব্যবস্থায় নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী ছেলেমেয়েদের কিছুদিন শিক্ষা দেবার পরে তারা নিজেরাই নিজেদের ভবিষ্যৎ পথ বেছে নিতে পারবে। প্রত্যেকেই তখন নিজের নিজের যোগ্যতা বিকশিত করার উপযুক্ত সুযোগ পাবে।

প্রত্যেকেই নিজের যোগ্যতা ও রুচি অনুযায়ী কাজ বেছে নিতে পারবে। কেউ বা বেছে নেবে প্রকৃতি বিজ্ঞান, যা কিনা তখন প্রভূত উন্নতি লাভ করবে, কেউ নেবে নৃবিদ্যা, কেউ প্রাণীবিদ্যা, কেউ উদ্ভিদবিদ্যা, কেউ ধাতু বিদ্যা, কেউ ভূবিজ্ঞান, কেউ পদার্থবিদ্যা, কেউ বা রসায়ণ বিদ্যা, অথবা প্রাগৈতিহাসিক গবেষণার কাজ। আবার একজন ইতিহাস পড়ায় অথবা শিল্পের সাধনায়। আবার কেউ হবে বাদ্যকার, কেউ হবে চিত্রকার, কেউ হবে ভাস্কর, অথবা অভিনেতা। শিল্পী জ্ঞানীগুণীদের সংকীর্ণ গণ্ডি ভেঙ্গে যাবে। এখন যে হাজার হাজার মানুষের বিকাশের পথ চেপে রাখা হয়েছে, তারা তাদের যোগ্যতা ও গুণাবলী বিকাশ করবার সুযোগ পেয়ে এগিয়ে আসবে। সবার মাঝে স্বীকৃতি লাভ করবে, সমাজের জন্য অনেক কাজ করতে পারবে। তখন আর পেশাগত বাদ্যকার অভিনেতা বা শিল্পী থাকবে না, নিজেদের রুচি অনুযায়ী স্বতঃস্ফূর্তভাবে, নিজেদের যোগ্যতা ও প্রতিভা বিকাশের অধিকার ভোগ করবে। আর তখন এ সমস্ত বিষয়েই বর্তমানের চেয়ে বহুগুণে উন্নতি হবে, যেমন উন্নতি হবে শিল্প, কারিগরি ও কৃষির ক্ষেত্রে।

দুনিয়ায় তখন বিজ্ঞান ও শিল্পের এক অভূতপূর্ব যুগের সূচনা হবে, সৃষ্টির নব নব দিগন্ত উন্মোচিত হবে। মানব সমাজ যখন প্রকৃতই মানবিক হবে তখন শিল্প যে কি ভাবে নবজন্ম লাভ করবে সে বিষয়ে রিচার্ড ওয়াগনার (Richard Wagner)-এর মতো একজন এতবড় ব্যক্তিই বহুদিন পূর্বে, ১৮৫০ সালেই তাঁর "শিল্প ও বিপ্লব" (Art and Revolution) বই এ লিখে গেছেন। এই বইখানি আরো বিশেষ উল্লেখযোগ্য এজন্যই যে বইখানি লেখা হয়েছিল ঠিক সেই বিদ্রোহ দমন করার পরেই, যে বিদ্রোহে ওয়াগনার নিজে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং অবশেষে ড্রেসডেন পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই বইয়েও ওয়াগনার পরিষ্কারভাবে দেখিয়েছেন ভবিষ্যতে শিল্পের কত উন্নতি হবে এবং শ্রমজীবী শ্রেণীর মানুষদের কাছে আবেদন করেছেন প্রকৃত শিল্পের সূচনা করার জন্য শিল্পীদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে। তিনি দেখিয়েছেন যে ভবিষ্যতে যখন কোনমতে জীবন ধারণ করাটাই আমাদের প্রধান কাজ থাকবে না, শুধুমাত্র তার জন্য দাসত্ব করে চলতে হবে না, নতুন প্রত্যয় ও নতুন জ্ঞান আমাদের জীবনে নিয়ে আসবে নতুন আলো। আমরা তখন দেখতে পাব জীবনটা কত আনন্দের, আর সেই আনন্দ পুরোপুরি ভোগ করার উপযোগী করে গড়ে তুলতে পারব আমাদের সন্তান সন্ততিদের। শিক্ষা তখন মানুষের শারীরিক মানসিক বিকাশের পথ খুলে দেবে। তখন "প্রতিটি মানুষই প্রকৃতপক্ষে হয়ে উঠবে এক এক প্রকারের শিল্পী। মানুষের প্রতিভা বিভিন্নদিকে বিকশিত হয়ে অভূতপূর্ব অগ্রগতি হবে।" এই কথাগুলির মধ্যে সমাজতন্ত্রের চিন্তাই প্রকাশিত হয়েছে।

ভবিষ্যতে মানুষের সামাজিক জীবনটা ক্রমশই গণমুখী হতে থাকবে। তার লক্ষণ এখনই দেখা যাচ্ছে, আর বিশেষ করে পূর্বের তুলনায় নারীদের অবস্থায় যে সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে তার থেকেও একথা স্পষ্ট বোঝা যায়। পারিবারিক জীবনের সীমা যথাসম্ভব সংকুচিত হয়ে যায় আর মানুষের সামাজিক জীবন প্রসারিত হতে থাকবে। সমগ্র সমাজের প্রয়োজনেই থাকবে বড় বড় সভা সমাবেশ, বক্তৃতা, আলোচনার স্থান, খেলাধুলার জন্য প্রশস্ত হল, খাবার ও পড়বার জন্য বড় বড় ঘর, লাইব্রেরী, নাচগান, থিয়েটার হল, মিউজিয়াম, জিমনাসিয়া, পার্ক, সাধারণের জন্য স্নানাগার, স্কুল, ইউনিভার্সিটি, রোগী ও পঙ্গুদের জন্য হাসপাতাল, এ সবগুলিই আমাদের প্রয়োজনে উপযোগী করে চমৎকারভাবে তৈরি করা হবে, যাতে আমোদ প্রমোদেরও প্রচুর সুযোগ পাওয়া যাবে, আর শিল্প বিজ্ঞানের বিকাশের পথও খুলে যাবে।

সেই নূতন যুগের কাছে আমাদের আজকের দিনের এই বহুল প্রচারিত যুগকে কত ছোটই না দেখা যাবে। এই যে উপরওয়ালার একটু দাক্ষিণ্যের জন্য লালায়িত হওয়া, তোষামোদ করে চলা, পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ ছড়িয়ে নিজের উন্নতি করার চেষ্টা, নিজের বিশ্বাসকে চেপে রাখা, মানুষের ভাল গুণাবলীকে দমন করে রাখা, মানুষের চরিত্রকে মনুষ্যত্বহীন করে দেওয়া, অসত্য অনুভূতি ও মতবাদ জাহির করার শঠতা—এ সব কিছু আর থাকবে না। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকটি মানুষ যাতে উন্নত হয়, আত্মনির্ভরশীল, স্বাধীন হয়, তাদের চিন্তায় ও বিশ্বাসে থাকবে না কোনো মলিনতা, স্বাধীনভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করতে পারবে যা কিনা বর্তমানে সম্ভব নয়। এখন এইসব গুণাবলীকে চেপে না রাখলে মালিকদের সর্বনাশ হয়ে যায়। আর এই হীনতা মেনে নেওয়াও মানুষের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। যেমন প্রভু রেগে গিয়ে কুকুরকে চাবুক মারলে কুকুর তার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পায় না।

তখন আমাদের সামাজিক জীবনে এই সব বিরাট বিরাট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রেও অনেক পরিবর্তন আসবে। এখন যে সব গাদা গাদা ধর্মপুস্তক বাজার দখল করে বসে থাকে তার আর প্রয়োজন হবে না। তেমনই অবস্থা হবে আইন-কানুন ও বহুরকমের সামাজিক বিধিনিয়মের বইপত্রগুলির। ঐতিহাসিক গবেষণার কাজ ছাড়া ওগুলির আর কোনো প্রয়োজন থাকবে না। গাদা গাদা আজেবাজে বই, অশ্লীল বই, লেখকদের নিজেদের আত্মপ্রচার ও আত্মপ্রসাদের জন্য নিজেদেরই খরচে ছাপা অসংখ্য বই তখন আর দেখা যাবে না। এখানকার অবস্থার বিচারেই একথা জোর করে বলা যায় যে এমন অত্যন্ত ক্ষতিকর, একেবারেই বাজে বই ছাপা হয়ে থাকে যে সব বইয়ের অন্তত পাঁচভাগের চারভাগ চলে গেলেও সভ্যতা সৃষ্টির বিন্দুমাত্র ক্ষতি হবে না।

ছাপাখানাগুলির অবস্থাও ঠিক ঐ রকম লঘু প্রকৃতির বইগুলির মতই হবে। আর বর্তমানে আমাদের যে সব আধুনিক সংবাদপত্র, সাহিত্য চলছে তার চেয়ে বাজে জিনিস আর কিছু নেই। এই গুলির মানদণ্ডে সমাজের সভ্যতার ও জ্ঞান বিজ্ঞানের অবস্থা যদি বুঝতে হয় তবে নেহাতই হতাশ হতে হবে। অতীত দিনের মাপকাঠি দিয়ে যদি মানুষকে বা পরিস্থিতিকে বিচার করতে হয় তবে তা হবে হাস্যাস্পদ। এ কথাটা বোঝা দরকার। আমাদের সংবাদ পত্রগুলির অনেক সাংবাদিকই অন্য কোনো ভালো পেশা না পেয়ে বুর্জোয়াদের স্বার্থেই কাজ করে যায়। দৈনিক সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলি বুর্জোয়াদের ব্যবসার স্বার্থে প্রচার করে, বিজ্ঞাপনের মারফত তাদেরই অপ-সংস্কৃতিরও প্রচার করে থাকে।

আর উপন্যাস নাটক ইত্যাদির রস-সাহিত্যগুলিও সংবাদপত্রগুলির চেয়ে কোনো অংশেই উন্নত নয়। সে গুলির মধ্যে প্রধানত যৌন বিষয়গুলিকেই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বলা হয়। তার মধ্যে কখনো থাকে হালকা উপভোগের উপাদান, কখনো বা থাকে পুরনো ধর্মমূল ধ্যানধারণা, কুসংস্কারের প্রচার। সব জিনিসটার মূল লক্ষ্যই হল বুর্জোয়া জগৎটাকে তুলে ধরা, যেন ছোটখাট ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলেও এই জগৎটাই সবচেয়ে ভাল এবং একেই টিকিয়ে রাখতে হবে।

ভবিষ্যৎ সমাজ এতবড় একটা বৃহৎ ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আনবে। তখন প্রাধান্য পাবে বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প। যোগ্যতা অনুযায়ী সকলেই তাদের প্রতিভা বিকাশ করার সুযোগ পাবে। তখন আর লেখককে বইয়ের দোকানদারের কৃপাপ্রার্থী হতে হবে না, মুনাফার মুখ চেয়ে থাকতে হবে না। লেখকের তখন তার রচনার বিষয়ে সুযোগ ও নিরপেক্ষ মতামত পাওয়া সম্ভব হবে।

* * *

সমাজের উদ্দেশ্য যদি হয় প্রতিটি ব্যক্তিকে পরিপূর্ণ করে গড়ে তোলা, তাহলে তাকে একটা জায়গাতেই আবদ্ধ করে রাখলে চলবে না। যদিও মানুষের বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচয় হয় বইপত্রের মাধ্যমে, তবুও সে পরিচয় কখনো পরিপূর্ণ হতে পারে না। নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই সে পরিচয় পরিপূর্ণ হতে পারে। তার জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন স্থানের সঙ্গে আদান প্রদান, যাওয়া আসা। মানুষের পক্ষে পরিবেশের পরিবর্তনেরও প্রয়োজন আছে। তাতে মানুষের উন্নতি হয়। যেমন গাছের পক্ষে বেড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন বাইরের আলো-হাওয়া, তেমনি মানুষের পক্ষেও প্রয়োজন অন্য পরিবেশের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা।

মানুষের এই প্রয়োজনকে ভবিষ্যৎ সমাজ অস্বীকার তো করতে পারেই না,

বরং সেই সুযোগ সুবিধা যাতে সকলের কাছেই পৌঁছয় তার ব্যবস্থা করবে। তার জন্য যানবাহন ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি করা হবে, আন্তর্জাতিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত করা হবে। ছুটি হলে এক দেশ থেকে আর এক দেশে বেড়াতে যাওয়াও সকলের পক্ষে সম্ভব হবে। বিদেশে বেড়াতে যাওয়া, বা বিদেশে কাজ করা বা বসবাস করার সুযোগও তাদের মিলবে।

ভবিষ্যৎ সমাজ ব্যবস্থায় সকলের জন্যই প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর সঞ্চয় ও সরবরাহের ব্যবস্থা থাকবে। আর সে কাজ করা মোটেই শক্ত হবে না। অবস্থা বুঝে মানুষের কাজের ঘণ্টা নিয়মিত করা হবে কাজের সময় কমানো বা বাড়ানো হবে। বছরের মধ্যে কোনো সময় চাষের কাজের উপর জোর দিতে হবে, কোনো সময় কলকারখানার কাজের উপর। সেই অনুযায়ী শ্রমিকদের মধ্যেও কাজ ভাগ করে দেওয়া হবে। এখন যে বিরাট সংখ্যক শ্রমিক কারিগরি বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠেছে, ভবিষ্যৎ সমাজের ব্যাপক উন্নতির ক্ষেত্রে তারা হবে মস্ত অবলম্বন।

যে সমাজ শিশুদের রক্ষা করার দায়িত্ব নেবে, সে সমাজ নিশ্চয়ই বৃদ্ধ, রুগ্ন ও পঙ্গুদের অবহেলা করবে না। যে কোনো কারণেই যদি কেউ কাজ করতে অক্ষম হয়, তবে তার দায়িত্ব সমাজ নিতে বাধ্য। এসব বিষয়ে অত্যন্ত সুবিবেচনার সঙ্গে কাজ করা হবে।

খুবই উন্নত, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংগঠিত হাসপাতাল, বিশ্রাম শিবির প্রভৃতিকে অসুস্থ ব্যক্তিকে সেবা শুশ্রূষা করে কাজে ফিরিয়ে আনার জন্য, বা বৃদ্ধ ও রুগ্ন ব্যক্তির কষ্ট লাঘব করার জন্য নিযুক্ত করা হবে। কারো মন এই ভেবে বিষিয়ে উঠবে না যে অন্য লোক তার মৃত্যুর অপেক্ষা করছে, যাতে তার মৃত্যুর পর কেউ তার সম্পত্তি পেতে পারে কোনো বৃদ্ধ অসহায় মানুষের আর মনে হবে না যে দুনিয়া তাকে নিঃশেষে নিঙড়ে দিয়ে তারপর ছুঁড়ে ফেলে দেবে। তার নিজের ছেলেমেয়ের উপরও নির্ভর করতে হবে না, আর গির্জার দুয়োরে ভিক্ষেও চাইতে হবে না।*

নতুন সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের নৈতিক জীবনের ও শারীরিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে, তাদের কর্ম সংস্থান, বাসস্থান, স্বাস্থ্যের পুষ্টি, পরিধান, সামাজিক জীবনের আদান প্রদান-এ সব দিকেই উন্নতি হবার দরুন দুর্ঘটনা, জরা মৃত্যু

---

* যে ব্যক্তি বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রমে সৎভাবে জীবন কাটিয়েছে তার পক্ষে শেষ জীবনে নিজের ছেলেমেয়ে, অথবা সমাজ কারও উপরই নির্ভর করা ঠিক নয়। বুড়ো বয়সটা স্বাধীন, উদ্বেগ উৎকণ্ঠা মুক্ত জীবনই তার আমার জীবনের সুস্থ সবল অবস্থার একটানা পরিশ্রমের সবচেয়ে বড় প্রতিদান।"—V. Thunmen : Der Isolirte (The Isolated State) কিন্তু আজ বুর্জোয়া সমাজে কি দেখতে পাই ?

ব্যাধি সবই কমে আসবে। ক্রমশঃ জীবনী শক্তি ফুরিয়ে এলে মানুষের স্বাভাবিক-ভাবেই মৃত্যু হবে, আর মানুষ আত্মবিশ্বাস নিয়ে স্বভাবিক জীবন যাপন করতে পারবে।

মানুষের স্বাভাবিক জীবনের প্রথম কথাই হল তার জন্য উপযুক্ত খাদ্য ও পানীয় চাই। অনেকে জিজ্ঞাসা করে থাকেন যে সোশাল ডিমোক্রেসি নিরামিষ ভোজন মানে না নাকি? এ বিষয়ে কিছু বলা দরকার। আগে নিরামিষ ভোজনই সবচেয়ে পুষ্টিকর বলে অনেক প্রচার করা হয়েছে। তখন মানুষ ইচ্ছা করলে নিরামিষ বা আমিষ যেটা ইচ্ছা খেতে পারত, কিন্তু এখন বহু সংখ্যক মানুষ এমনই দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে যে তাদের পক্ষে আমিষখাদ্য জোটানো সম্ভব হয় না। আর নিরামিষও যা খায় তাও মোটেই পুষ্টিকর নয়। সাইলেসিয়া, স্যাকসনি, থারিঞ্জিয়া প্রভৃতি যে সব বড় বড় জেলাতে বহু সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষ বাস করে, সেখানে এবং আশে পাশের শিল্প নগরী গুলিতেই আলুই প্রধান খাদ্য। রুটি তারা কখনো সখনো খায়। আর মাংসের মধ্যে যেগুলি সবচেয়ে খারাপ জিনিস তাও তারা পায়ই না বলা যায়। কৃষিজীবী মানুষদের অধিকাংশই মাংস খেতে পায় না। কৃষকরা বাধ্য হয়েই তাদের গৃহপালিত গোরু-ছাগল সব বেচে দিয়ে জীবন ধারণের জন্য অন্যান্য জিনিস কিনে থাকে।

এমনিভাবে যারা বাধ্য হয়েই নিরামিষ ভোজী হয়েছে, তাদের জন্য মাছ-মাংস পাওয়া গেলে তো ভালই হবে। নিরামিষাশীরা যখন বলে থাকে যে মাছ-মাংস খাওয়ার উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়া ঠিক নয়, তখন তারা ঠিকই বলে। কিন্তু যখন তারা আবার বলে যে মাছ-মাংস খাওয়াটা ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক তখন তারা ভুল কথা বলে। তারা অনেকটা মনের আবেগে কথা বলে, যেমন তারা আমাদের জীব হত্যা করতে বা মৃতদেহ খেতে বারণ করে থাকে। কিন্তু আমাদের নিরাপত্তার জন্য বন্য জন্তুদের হত্যা করতে হয়, যাতে তারা আমাদের হত্যা করে ফেলতে না পারে; আর যদি আমরা আমাদের "সুহৃদ" গৃহপালিত জন্তুদের হত্যা করা বন্ধ করে দেই, এবং তারা অবাধে বাড়তে থাকে, তবে তারাই আমাদের খেয়ে ফেলবে আর আমাদের পুষ্টি থেকেও বঞ্চিত করবে। এটা একটা অতিরঞ্জিত কথা যে নিরামিষ ভোজন করলে মানুষ শান্ত চরিত্রের হয়। শান্তশিষ্ট ভেতো হিন্দুরাও ইংরাজের নৃশংসতায় হিংস্র হয়ে উঠে বিদ্রোহ করেছে।

সনদারিগার (Sonderegger)-এ বিষয়ে একেবারে আসল কথা বলেছেন যে "ভাল মন্দ খাদ্যের বিভিন্ন স্তর বলে কিছু নেই, কিন্তু একটা বাঁধা নিয়ম আছে যার দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যের সমন্বয় করতে হয়"। একথা খুবই ঠিক যে কেউ শুধু মাছ-মাংস খেয়ে থাকতে পারে না, কিন্তু ঠিক মতো বেছে নিতে পারলে

শুধু শাক সব্জি খেয়ে থাকতে পারে। আবার অন্যদিকে, কেউই কেবল মাত্র একই বয়সের নিরামিষ আহার খেয়ে খুশি হয়ে থাকতে পারে না, তা সে খাদ্য যতই পুষ্টিকর হোক না কেন। যেমন, সীম মটরশুটি, মসুর এগুলো অন্য যে কোন খাদ্যের চেয়ে পুষ্টিকর। কিন্তু শুধু এইগুলি খেয়েই বেঁচে থাকা সম্ভব হলেও মানুষের পক্ষে তা অসহ্য লাগবে। কার্ল মার্কস্ তাঁর "ক্যাপিটাল" পুস্তকে এক জায়গায় লিখেছেন "চিলির খনি মালিকরা সেখানকার শ্রমিকদের সারা বছর ধরে সীম, কড়াইশুঁটি খেতে বাধ্য করত, কারণ তাতে শ্রমিকদের গায়ে জোর বাড়ত ও তারা ভারি জিনিস বইতে পারত। শ্রমিকরা মাঝে মাঝে তা খেতে চাইত না. কিন্তু তাদের কোনো উপায় ছিল না, তাদের আর কোনো খাবারই দেওয়া হত না, ফলে তারা একই জিনিস খেতে বাধ্য হত।*

পূর্বে যেমন শিকারী বা পশুপালকরা শুধু জীবজন্তুর মাংস খেয়েই থাকত, এখন সভ্যতার অগ্রগতির সংগে সংগে দেখা যাচ্ছে যে তারাও ক্রমশঃ শাকসব্জি তরকারীও খেতে শুরু করেছে। শাকসব্জি গাছ গাছড়ার চাষ আবাদ এখন বহুরকম প্রয়োজনেই ব্যবহার করা হয়। আর তার দ্বারা সমাজের অগ্রগতিই বোঝা যায়। তাছাড়া দেখা যায় যে একখণ্ড নির্দিষ্ট জমিতে শাকসব্জি তরি-তরকারী উৎপন্ন করে যতটা পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করা যায়, ঐ জমিতে পশুপালন করলে ততটা করা যায় না। এজন্যও নিরামিষ ভোজের প্রশ্নটা আরো গুরুত্ব লাভ করেছে। আর কয়েক দশকের মধ্যে বাইরে থেকে মাংস আমদানিও বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ এখন বিদেশের অনেক জায়গায়, বিশেষ করে দক্ষিণ আমেরিকায় অনেক বাড়তি মাংস অনিষ্ট হচ্ছে বলে আমরা খবর পেয়ে থাকি। তাছাড়া, আমরা তো শুধু মাংসের জন্যই পশুপালন করি না, তাদের থেকে আমরা পাই উল, পশুর চুল, লোম, চামড়া, দুধ, ডিম প্রভৃতি এবং তাছাড়া পাই নানা প্রকার শিল্পের ও খাদ্যের উপাদান। তারপর কলকারখানা বা গৃহস্থালীর অনেক পরিত্যক্ত আবর্জনা থেকে পশুর খাদ্যই হয়ে থাকে।

* Capital Vol. I, Moscow ইংরাজি সংস্করণের ৬৫৪ পৃষ্ঠার থেকেই উপরোক্ত উদ্ধৃতি নেওয়া হয়েছে মনে হয়। সেটি Chapter XXIII এর পাদটিকায় (পৃঃ ৫৭৯-এ নিম্নরূপ দেওয়া হয়েছে :

"দক্ষিণ আমেরিকার খনি শ্রমিক, যাদের দৈনিক কাজ হল (পৃথিবীর মধ্যে বোধহয় সবচেয়ে ভারী কাজ) নিচের ৪৫০ ফুট গভীর খাদ থেকে কাঁধে করে ৮০ থেকে ২০০ পাউণ্ড পর্যন্ত ধাতুদ্রব্য তুলে আনা, তারা কেবলমাত্র রুটি ও সীম মটরশুঁটি জাতীয় সব্জি খেয়ে থাকে। তারা নিজেরা কিন্তু শুধু রুটি খেয়েই থাকতে চায়, কিন্তু তাদের মালিকরা ঐ সীম বা মটরশুঁটি খেতে বাধ্য করে, কারণ তারা বুঝতে পারে যে রুটি খেয়ে মানুষ অত কঠিন কাজ করতে পারে না। রুটির চেয়ে সীম বা মটরশুঁটি জাতীয় সব্জিতে শরীরের শক্তি যোগাবার পদার্থ (লাইম ফসফেট) বেশি থাকে। ঐ মালিকরা ঘোড়াদের মতই শ্রমিকদেরও খাটবার শক্তি বজায় রাখতে চায়।" (Liebig, I.C. Vol. I P. 194 note)"—সম্পাদক।

সর্বোপরি, আগামী দিনে সমুদ্রের ভিতর থেকেও মানুষ বিশাল পরিমাণ পশুখাদ্য পেয়ে যাবে। সুতরাং নতুন সমাজের জন্য কেবলমাত্র নিরামিষ ভোজনের ব্যবস্থা হতে পারে না, তার প্রয়োজনও নেই, আব তা সম্ভবও নয়।

খাদ্যের পরিমাণগত দিকের চেয়ে গুণগত দিকের গুরুত্ব অনেক বেশি। খাদ্যের যদি গুণ না থাকে তবে তা অনেক পরিমাণে খেয়েও বিশেষ কোনো লাভ হয় না। খাদ্য প্রস্তুত করার পদ্ধতির মধ্য দিয়ে তার গুণগত দিকটার অনেক উন্নতি করা যায়। সুতরাং খাদ্যের থেকে যথা সম্ভব উপকার পেতে হলে, অন্যান্য বিষয়ের মতো খাদ্য প্রস্তুতের ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানের ব্যবহার করতে হবে। তারজন্য চাই উপযুক্ত জ্ঞান ও যন্ত্রপাতি। এখন এই খাদ্য প্রস্তুত করার কাজটা প্রধানতঃ নারীদের উপরই পড়ে। কিন্তু তাদের যে এর জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান নেই বা থাকা সম্ভব না তা ইতিপূর্বেই স্পষ্ট দেখা গেছে। আর এই উন্নত খাদ্য প্রস্তুত প্রণালীর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিও তাদের নেই। তবে বড় বড় হোটেলে, ব্যাংকে, হাসপাতালে, এমনকি রন্ধন প্রণালীর প্রদর্শনীতেও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তৈরি করার, সিদ্ধ করার, সেঁকার মেসিন প্রভৃতি দেখা যায়। প্রশ্ন হল কিভাবে সবচেয়ে কম খরচে, কম সময়ে, সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে। মানুষের পুষ্টির কথাটা ভাবতে গেলে এই প্রশ্নের গুরুত্ব রয়েছে। সুতরাং এখন ছোট ছোট ব্যক্তিগত পরিবারের যে রান্নার ব্যবস্থা রয়েছে সেগুলি সেকেলে হয়ে গেছে, সেখানে মানুষের সময়, শক্তি ও জিনিসপত্র যথেচ্ছ, অনিষ্ট হয়ে থাকে। ভবিষ্যতে সমগ্র খাদ্য প্রস্তুতের কাজটাই সামাজিক দায়িত্বের মধ্যে আসবে, রন্ধন প্রণালীর উৎকর্ষের জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করা হবে, যাতে তার থেকে সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া যায়। ব্যক্তিগত রন্ধনশালাগুলি আর থাকবে না। খাদ্যের পুষ্টি বাড়ানোর দিকে তখন সবচেয়ে বেশি নজর দেওয়া হবে, যাতে মানুষ তার থেকে লাভবান হতে পারে।* সুতরাং নতুন সমাজব্যবস্থায় স্বাভাবিক নিয়মেই খাদ্যের থেকে মানুষ পুষ্টিলাভ করতে পারবে।

কেটো রোম সম্বন্ধে গর্ব করে বলেছেন যে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত সেখানে চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী অনেক ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও তাঁদের সে বিদ্যা পেশা হিসেবে কাজে লাগানোর সুযোগ তাঁরা পেতেন না। কারণ এখন মানুষ এমন সুন্দর সরলভাবে জীবন যাপন করত যে তাদের অসুখ বিসুখ বিশেষ হত না এবং বৃদ্ধ বয়েসে স্বাভাবিকভাবেই মৃত্যু হতো। তারপর যখন একদিক থেকে দেখা দিল অতিভোজন, অলসতা, অপচয়, আর অন্য দিক থেকে দারিদ্র্য শোষণ

* প্রত্যেকটি ব্যক্তি কত সহজে খাদ্য হজম করতে পারে তার উপরই নির্ভর করে সেই দ্য কতটা উপযোগী" Niemeyer : Gesundh tslehre. (Theory of Hygiene)

নিপীড়ন, তখনই অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে গেল। "কম খেলে, বেশি বাঁচে"—একথা ষোড়শ শতাব্দীতে বলেছিলেন ইটালিয়ান করনারো।

আবার রসায়ন বিদ্যা থেকেও আমরা ভবিষ্যতে নতুন নতুন খাদ্য প্রস্তুতির বস্তু তৈরি করতে পারবো, যা কিনা বর্তমানে মোটেই সম্ভব নয়। বর্তমানে বিজ্ঞানকে অপব্যবহার করা হয় ভেজাল ও দুর্নীতি বাড়াবার জন্য। ভবিষ্যতে তা হবে না। এতদিন খাদ্য কোথা থেকে আসছে, কিভাবে তৈরি হচ্ছে তা নিয়ে মানুষ মাথা ঘামায়নি, প্রয়োজন মেটা নিয়ে কথা।

যখন এই সব সাধারণ রন্ধনশালার সংগে সংগে থাকবে কাপড়-চোপড় ধোয়া-কাচার জন্য সাধারণ ব্যবস্থা, যেখানে যান্ত্রিক উপায়ে কাপড় জামা কাচা ধোওয়া, শুকনো, ইস্ত্রি করা হবে, উত্তাপ ও আলোর জন্য যান্ত্রিক ব্যবস্থা, সাধারণ স্নানাগার, আর আমাদের জামা কাপড় সবই সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রস্তুত হবে, তখন আমরা দেখবো যে আমাদের পারিবারিক জীবনের আমূল পরিবর্তন এসে গেছে। তখন পারিবারিক ক্ষেত্রে দাস-দাসীও থাকবে না, আর তাদের মাথার উপর গৃহকর্ত্রী হিসাবে অভিজাত মহিলাও বসে থাকবে না।*

* "ভৃত্য না থাকলে আবার সভ্যতা কিসের।" "সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন অধ্যাপক ভি থ্রিশেঙ্ক (Prof. V. Treitzschke)। এতো নতুন কথা যে 'ভৃত্যরাই আমাদের সভ্যতার অগ্রদূত'। হের ভি থ্রিশেঙ্কে (Herr V. Treitzschke)-র পাণ্ডিত্যপূর্ণ অধ্যাপকের মগজ বুর্জোয়া সমাজের বাইরে আর কিছুই ভাবতে পারে না, ঠিক যেমন বাইশ শতাব্দী পূর্বে এ্যারিস্টটলও গ্রীক জগতের বাইরে আর কিছু ভাবতে পারতেন না। এ্যারিষ্টটল মনে করতেন দাসদের ছাড়া সমাজ থাকতেই পারে না। হের ভন থ্রে... মনে হয় ভেবেই পান না, ভৃত্য না থাকলে কে তার জুতো পালিশ করবে, আর কেইবা তার জামা ইস্ত্রি করবে, এবং এ সমস্যা এখনকার দিনে যেন সমাধান করাই অসম্ভব। ভাল কথা। বর্তমানে কিন্তু শতকরা ৯০ ভাগের বেশি লোক এসব কাজ নিজেরাই করে থাকে, এবং ভবিষ্যতে বাকী শতকরা দশজনও তেমনি নিজেদের কাজ নিজেরাই করতে পারবে, অবশ্য যদি না ইতিমধ্যে ঐ সব কাজের জন্য যন্ত্রের অবিষ্কার হয়ে সমস্যাটা মিটে না যায়, অথবা হেড অধ্যাপকের প্রতি সহানুভূতি বোধ করে কোনো যুবক যদি না তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। কারণ আমি মনে করি তিনি নতুন যুগ পর্যন্ত বাঁচবেন। তারপর, কাজ করার মধ্যে কোনো অপমান নেই, এমনকি জুতোপালিশ করার মধ্যেও, অনেক সামরিক অফিসারও, যাদের বংশ পরম্পারায় বড় পরিচয় রয়েছে, দেনা শোধ না দিয়ে আমেরিকায় পালিয়ে কুলির কাজ বা জুতোপালিশের কাজ করেছে, তারাও একথা বুঝতে পেরেছে।

নারী—ভবিষ্যত কালে

এ অধ্যায়টি খুবই সংক্ষিপ্ত হতে পারে। ইতিপূর্বে যে আলোচনা করা হয়েছে, তার থেকে ভবিষ্যতে নারীদের অবস্থা কী হতে পারে সেই সিদ্ধান্তের কথাই এখানে বলা হবে, যা কিনা সকলে নিজেরাই বুঝতে পারেন।

নতুন সমাজে নারী হবে সম্পূর্ণ স্বাধীন, কোনো শোষণ নিপীড়নের শিকার হবে না। নারী হবে সম্পূর্ণ মুক্ত, পুরুষের সমান।

নারী পুরুষের শিক্ষাও একই প্রকারের হবে। শুধুমাত্র যে সব ক্ষেত্রে নারী হিসাবে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা দরকার তা রাখবে। স্বাভাবিক-ভাবেই নারী তার শারীরিক মানসিক বিকাশের সম্পূর্ণ সুযোগ পাবে। তার নিজের যোগ্যতা, রুচি এবং ইচ্ছা অনুযায়ী নিজের কাজ বেছে নিতে পারবে। সর্বক্ষেত্রেই তার পুরুষের সমান সুযোগ মিলবে। নারী তখন সামাজিক শ্রমে অংশগ্রহণ করার পর, হতে পারবে শিক্ষাবিদ, শিক্ষিকা, নার্স, তারপর সাধনা করবে কলা বিজ্ঞানের, তারপর অংশগ্রহণ করবে প্রশাসনিক কাজেও। অন্যান্য নারী বা পুরুষদের সংগে সে তার ইচ্ছামতো আমোদ-প্রমোদও করতে পারবে।

প্রেমের ব্যাপারেও নারীর পুরুষেরই সমান স্বাধীনতা থাকবে। সে কাকে ভালবাসবে, আর কে তাকে ভালবাসবে তার মধ্যে তার স্বাধীন ইচ্ছাই হবে একমাত্র কথা। দুটি নরনারীর মধ্যে চুক্তি তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার, তার মধ্যে বাইরের কেউ হস্তক্ষেপ করবে না কিন্তু নরনারীর মধ্যে এই ধরনের সম্বন্ধ আদিম যুগে যেমন মুক্ত সম্বন্ধ ছিল, তার থেকে সম্পূর্ণ তফাৎ হবে। নারীরা তখনকার মতো পুরুষদের বশ্য হয়ে থাকবে না, পুরুষরাও তাদের ইচ্ছামতো নারীদের গ্রহণ বা বর্জন যেমন ইচ্ছা তেমন করতে পারবে না।

মানুষের বলিষ্ঠ আবেগের ক্ষেত্রে তার স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন। অন্যান্য স্বাভাবিক প্রবৃত্তির মতো যৌন আবেগের পরিতৃপ্তির ব্যাপারটা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত বিষয়। তার জন্য তৃতীয় ব্যক্তির হস্তক্ষেপ করার কথাই আসে না। মানুষের বুদ্ধি, সংস্কৃতির বিকাশ হলে, তার স্বাধীনতা থাকলে, সে নিজেই তার যোগ্য সঙ্গী বেছে নিতে পারবে। যদি আবার পরস্পরের মধ্যে বনিবনা না হয় পরস্পরকে ভালই না লাগে তবে নৈতিকতার দিক থেকেই তাদের বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করাই দরকার। নারী-পুরুষের সংখ্যাও তখন মোটামুটি একই দাঁড়াবে। তাছাড়া আরও যে সব কারণে অনেক মেয়েকে এতদিন অবিবাহিত থাকতে হচ্ছে

বা পতিতা বৃত্তি গ্রহণ করতে হচ্ছে সেগুলিও দূর হবে। পুরুষ তখন নারীর উপর আর নিজের প্রাধান্য জাহির করতে পারবে না। অন্য দিক থেকে এখন নরনারীর দাম্পত্য জীবনে পরিপূর্ণতা লাভের যে সব অন্তরায় রয়েছে, নতুন সামাজিক পরিস্থিতিতে সে সব আর থাকবে না।

নানা রকম বাধা বিপত্তি, দ্বন্দ্বের মধ্যে নারীদের অবস্থা এখন এমনই দাঁড়িয়েছে যে এমন অনেক লোক আছে যারা সমাজের পরিবর্তনের সবটা মেনে না নিলেও এটুকু মেনে নেন যে বিবাহের ব্যাপারে নারীদের স্বাধীন নির্বাচনের অধিকার থাকা দরকার এবং প্রয়োজন হলে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকারও থাকা দরকার। তারজন্য বাইরে থেকে বাধা না আসাই ভাল—যেমন নারীর অধিকারের বিরুদ্ধে ফ্যানি লিউয়াল্ড (Fanny Lewald)-এর বিতর্কের জবাবে ম্যাথিলাইড রিচার্ড-স্ট্রংবার্গ (Mathilde Reichard-Strongberg) বলেছেন ঃ—

"যদি আপনি (F. L.) সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর সম্পূর্ণ সমান অধিকার স্বীকার করেন, জর্জ স্যান্ড (George Sand)-ও তবে নারীর মুক্তির সংগ্রামের কথাটা ঠিকই বলেছেন" যার দ্বারা তিনি নারীদের জন্য শুধু তাই চেয়েছেন যা কিনা পুরুষরা বহুদিন থেকেই নির্বিবাদে ভোগ করে আসছে। নারীর এই সমান অধিকারের দাবিকে সম্পূর্ণভাবেই মেনে নিতে হবে। অপরপক্ষে নারীদের যদি স্বাভাবিকভাবেই সমান অধিকার ও সমাজের প্রতি সমান কর্তব্য থাকে, তবে তো তাদের রথী মহারথী পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়েও চলতে হবে, আর তার জন্য চাই সমান অধিকার ও সুযোগ সুবিধা। একজন মহান ব্যক্তির উদাহরণই দেখা যাক। আমরা যখন পড়ি যে গ্যেটে (Goethe)-র মত একজন মহান ব্যক্তি একাধিক নারীর প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন, তখন কিন্তু আমাদের মনে একটুও অশ্রদ্ধা জাগে না। প্রত্যেকেই মেনে নেন যে মহান ব্যক্তিদের অন্তরাত্মা সহজে পরিতৃপ্ত হয় না এবং সে সব ক্ষেত্রে শুধু সংকীর্ণমনা নীতিবাগীশরাই দোষারোপ করে থাকে। কিন্তু তাহলে নারীদের বেলায় এরকম "মহান ব্যক্তিত্বের" ক্ষেত্রে তাদের হাস্যাস্পদ করা হয় কেন ?...

যেমন, যদি মনে করা যায় যে সমস্ত নারীজাতিই জর্জ স্যাণ্ডের মতো মহান ব্যক্তিত্বে ভরে যায়, প্রত্যেকেই লুইক্রেশিয়া ফ্লোরিয়ানি (Lucretia Floriani)-র মতো হয়, তাদের প্রতিটি সন্তানই জন্মগ্রহণ করে নরনারীর ভালবাসার সম্বন্ধের মধ্যে, তাদের প্রতিপালন করা হয় মাতৃস্নেহের মধ্যে, তাদের বুদ্ধিশুদ্ধিও তেমনি বেড়ে উঠতে পারে। তবে দুনিয়ার অবস্থা কোথায় গিয়ে পৌঁছাবে ? দুনিয়া এগিয়ে চলবে যেমন চলেছে, প্রগতি এগিয়ে চলবে, আর বোধহয় অভিযোগ করারও বিশেষ কিছু থাকবে না"।

এখানে লেখিকা খুবই ঠিক কথা বলেছেন। কোনো অংশেই গ্যেটের মতো

না হয়ে বহু লোকেই গ্যেটে যা করেছিলেন, সে রকম করে থাকে, কিন্তু তাতে তাদের সমাজের মধ্যে কিছু জাত যায় না বা মাথা হেঁট হয় না। সমাজে পদ মর্যাদা থাকলে আর সবই মানিয়ে যায়। একথাও সত্যি যে, ঐ সব উচ্চ মহলের নারীরাও অনেক শিথিলতা দেখিয়ে থাকে, কিন্তু মোটের উপর পুরুষদের তুলনায় নারীদের সেদিকে স্বাধীনতা অনেক কম। আর আজকালকার দিনে জর্জ স্যাণ্ডের মতো চরিত্রের নারীও খুবই বিরল। যাই হোক সমাজে প্রচলিত নৈতিক মানদণ্ড দিয়েই সবকিছু মাপা হয়ে থাকে। বুর্জোয়া সমাজে যে বাধ্যতামূলক বিবাহ ব্যবস্থা আছে, একসময় তাকেই নরনারীর মধ্যে "নৈতিক" বন্ধন বলে স্বীকার করা হয়, তাছাড়া আর কোনো ভাবেই নারী-পুরুষের যৌন সম্বন্ধকে এখানে সহ্য করা হবে না। এইটাই স্বাভাবিক। কারণ বুর্জোয়া বিবাহ প্রথা হল বুর্জোয়া সম্পত্তি প্রথারই ফল। এই বিবাহ সম্পত্তি ও তার উত্তরাধিকারের সঙ্গে জড়িত। সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবার জন্য প্রয়োজন আইন-সম্মত বিবাহ-বন্ধনের মধ্যে জন্মানো সন্তান। সেই উদ্দেশ্যেই বিবাহ প্রথা তৈরি করা হয়েছে। বিবাহের ব্যাপারে এমনই সামাজিক চাপ সৃষ্টি করা হয়, যাতে যাদের কোনো সম্পত্তিই নেই বা উত্তরাধিকারীদের দিয়ে যাবারও কিছু নেই তাদের উপরও শাসকশ্রেণী একই বিধি আরোপ করতে পারে।*

কিন্তু নতুন সমাজ ব্যবস্থায় এরকম সম্পত্তি প্রথা বা উত্তরাধিকার প্রথা বলে আর কিছুই থাকে না, যদি না মানুষ তার গৃহস্থালীর আসবাবপত্রকেই একটা দিয়ে যাবার মতো বড় সম্পত্তি মনে করে। তাই তখন বিবাহ প্রথার মধ্যেও এমনি বাধ্যবাধকতা থাকবে না। আব উত্তরাধিকারের সমস্যাটাও আপনা থেকেই সমাধান হয়ে যাবে।

তখন নারী হবে সম্পূর্ণ স্বাধীন। ঘরকন্না ও ছেলেপিলে তার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করতে পারবে না, বরং তার জীবনে আনন্দ বৃদ্ধি করবে, বন্ধু বান্ধব, শিক্ষক, সবার কাছ থেকেই সে তার প্রয়োজনীয় সাহায্য পাবে।

হয়তো তখন এমন মানুষ থাকবে যে হামবোল্টের (Humboldt)-এর মতো

---

* ডাঃ শ্যাফ্‌ল্ (Dr. Schaffle) তাঁর 'Bau und Lebendes Socialen Korpers' (Structure and Life of the Social Body) পুস্তকে লিখেছেন: "বিবাহ বিচ্ছেদের সুযোগ সুবিধা করে দিয়ে বিবাহ বন্ধনটাকে শিথিল করে দেওয়া কখনই বাঞ্ছনীয় নয়; এ মানুষের দাম্পত্যজীবনের নৈতিক লক্ষ্যের পরিপন্থী, এবং জনসংখ্যাকে রক্ষার ও সন্তানদের শিক্ষার দিক থেকেও ক্ষতিকর।" এ বিষয়ে আমি পূর্বেই যা বলেছি তারপর আর এ কথা বলার প্রয়োজন নেই যে আমি এ মতামতকে শুধু ভ্রান্তই মনে করি না, আমার মনে হয় এটা একটা "দুর্নীতি" যাই হ'ক, ডাঃ শ্যাফ্‌ল্ এখন স্বীকার করবেন যে আমরা বর্তমান অবস্থার চেয়ে বেশি উন্নত কোনো সমাজব্যবস্থার কথা চিন্তা করতে পারছি না। এমন কোনো কিছুর সূচনা করা বা রক্ষা করার কথা ভাবতে পারছি না যা এই সমাজে প্রচলিত নৈতিক ধ্যান ধারণার বিরুদ্ধে যায়।

বলবে ঃ "আমি তো পরিবারের কর্তা হবার জন্য জন্মাইনি, আমি বিবাহ করাকে পাপ মনে করি আর সন্তানের জন্ম দেওয়াকেও অপরাধ মনে করি" তাতে কি এসে যায় ? মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি স্বাভাবিক অবস্থা রক্ষা করে চলবে। মেনল্যাণ্ডার (Mainlander) বা ভন হার্টম্যান (Von Hartmann)-এর মতো হতাশ হয়ে বলার দরকার নেই যে আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় হয়তো মানুষ আত্মবিলোপ এর দিকেই যাবে।

অপর পক্ষে ফ্রাঃ রাজেল (Fr.Ratzel) ঠিকই বলেছেন যে ঃ

"মানুষ যেন নিজেকে স্বাভাবিক নিয়মের বহির্ভূত না মনে করে। নিজের কর্ম ও চিন্তায় যেন নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করে চলে। তার ফলে সে আর শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে আসা অতীতের নিয়মের মধ্য দিয়ে তার অপরের সংগে কী সম্বন্ধ হবে, তার পরিবার ও রাষ্ট্রের সংগে কী সম্বন্ধ হবে তা ঠিক করবে না, ঠিক করবে মানুষের স্বাভাবিক বোধের যুক্তিযুক্ত নীতিদ্বারা। রাজনীতি, নৈতিকতা, ভালমন্দের বিচার—যা এখন নানা রকম ভাবে নির্ধারিত হয়ে থাকে তা হবে তখন প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের যে সুন্দর জীবনের কথা রূপকথার কাহিনী হয়ে এসেছে, অবশেষে তা বাস্তবে রূপ নেবে।"*

* Quotation in Heckel's, Naturliche Schopfungsges-clichte (Natural History of creation).

আন্তর্জাতিকতা

শুধু একটি দেশের অবস্থা ফিরলেই মানুষের জীবন সার্থক হতে পারে না। সে দেশের অবস্থা যতই ভাল হোক না কেন, তার শক্তি ও উন্নতি বিচ্ছিন্ন-ভাবে বাড়তে পারে না, কারণ তা নির্ভর করে আন্তর্জাতিক শক্তি ও সম্বন্ধের উপর। যদিও এখন সকলের মাথায় জাতীয় চিন্তাই রয়েছে যার জন্য নিজ নিজ দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রাধান্য জাহির করতে চায়, আর তা নিজের দেশের চৌহদ্দির মধ্যেই সম্ভব। কিন্তু তবুও আমরা ইতিমধ্যেই গভীরভাবে আন্তর্জাতিকতার কথা ভাবছি।

বাণিজ্য ও নৌচলাচল চুক্তি, ডাক তার যোগাযোগ, আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী, আন্তর্জাতিক আইন কংগ্রেস ভৌগোলিক বিষয়ের কংগ্রেস, আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান কংগ্রেস এবং নানা রকম সংস্থার কংগ্রেস (অবশ্য শ্রমিক সংস্থাগুলি নয়), নতুন আবিষ্কার, ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা—এই সবগুলি থেকেই, এবং এ রকম আরো অনেক বিষয় থেকেই দেখা যায় যে কিভাবে বিভিন্ন উন্নত দেশগুলির মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে, কিভাবে একটি দেশ থেকে অপর একটি দেশের বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার পরিস্থিতি চলে যাচ্ছে। ইতি-মধ্যেই আমরা আন্তর্জাতিক অর্থনীতির থেকে জাতীয় অর্থনীতির তফাতের কথা বলে থাকি এবং আন্তর্জাতিক অর্থনীতির প্রাধান্য দিয়ে থাকি, কারণ তার উপর প্রতিটি দেশের উন্নতি অনেকখানি নির্ভর করে, আমাদের বেঁচে থাকার জন্যই দেশের মধ্যে উৎপাদিত অনেকগুলি দ্রব্য বিদেশী দ্রব্যের সাথে বিনিময় করা হয়ে থাকে। ঠিক যেমন একটি কারখানার একটি শাখা ক্ষতিগ্রস্ত হলে অন্য একটি শাখাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তেমনি এক দেশের উৎপাদনের ক্ষতি হলে অন্য দেশের উৎপাদনেরও ক্ষতি হয়ে থাকে।

বিভিন্ন দেশের মধ্যে সাময়িকভাবে যতই বিভেদ ও বিদ্বেষ দেখা যাক না কেন, সে সব দেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হচ্ছে। কারণ বাস্তব ক্ষেত্রে সব দেশেরই তার প্রয়োজন আছে। সব দেশেরই যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, যানবাহনের উন্নতি ও উৎপাদনের উন্নতির মাধ্যমে জিনিসপত্রের দাম সস্তা হয়, পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হয়। এখন বিদেশের সঙ্গে যেমন ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ রাখা যায় তারও গুরুত্ব খুবই বেশি। বিদেশে বসবাস করা ও উপনিবেশ স্থাপন করার বিষয়গুলিও গুরুত্বপূর্ণ। একটি দেশ আর একটি

দেশের কাছ থেকে শিখছে, আর পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে আবার পণ্যদ্রব্যের লেনদেন ছাড়াও বিভিন্ন দেশের মধ্যে চলছে মানসিক জগতের আদান প্রদান। লক্ষ লক্ষ মানুষ বিদেশী ভাষা শিখছে, পরস্পরের ধ্যানধারণার সংগে পরিচিত হচ্ছে·

বিভিন্ন দেশের মধ্যে এই লেনদেনের ফলে সে দেশগুলির সামাজিক অবস্থাও একই ধরনের হয়ে যাচ্ছে। সব চেয়ে উন্নত সভ্য দেশগুলির মধ্যে এই সাদৃশ্য আরো বেশি দেখা যায়। একটা দেশের সামাজিক কাঠামোটা ঠিক মতো বুঝতে পারলে অন্য দেশের অবস্থাটাও মোটামুটি বোঝা যায়, ঠিক যেমন জীবজন্তুর বেলায় বিভিন্ন রকমারী থাকলেও অনেক সাদৃশ্য পাওয়া যায়, দেশের বেলাতেও তেমনি।

আরো দেখা যায় যে বিভিন্ন দেশের সামাজিক অবস্থা যদি একই রকমের হয়, তবে তার ভবিষ্যৎ ফলাফলও একই রকমের হবে। সেই ফলাফল হল এক দিকে মুষ্টিমেয় ধনিকের হাতে বিশাল সম্পদ পুঞ্জিভূত হওয়া, অন্যদিকে ব্যাপক জনগণের সর্বহারায় পরিণত হওয়া, যন্ত্রদানবের কাছে মজুরির দাসে পরিণত হওয়া—অধিকাংশ মানুষের উপর মুষ্টিমেয় মানুষের প্রভুত্ব স্থাপন করা।

প্রকৃত পক্ষে আমরা দেখছি যে, যে শ্রেণীদ্বন্দ্বের জন্য জার্মানির অবস্থার অবনতি হচ্ছে, ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রেও সেই শ্রেণীদ্বন্দ্বের জন্যই আন্দোলন চলছে। রাশিয়া থেকে পর্তুগাল পর্যন্ত, বল্কান, হাঙ্গেরী এবং ইটালী থেকে ইংল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ড পর্যন্ত মানুষের মধ্যে একই অসন্তোষ, একই সামাজিক পরিস্থিতি, বিক্ষোভ আন্দোলন চলছে। বিভিন্ন দেশের মানুষের ভিন্ন ভিন্ন আচার ব্যবহারের জন্য এবং সরকারী কাঠামোর তারতম্যের জন্যই বাইরে থেকে যতই ভিন্ন চেহারা দেখা যাক না কেন, মূলত তাদের অবস্থা একই। প্রতি বছরই তাদের অভ্যন্তরীণ সংকট বাড়তে বাড়তে অবশেষে বিস্ফোরণ ফেটে পড়বে ও সমগ্র সভ্য জগৎ কোনো না কোনো পক্ষে অস্ত্র ধারণ করে দাঁড়াবে।

পুরাতন দুনিয়ার বিরুদ্ধে নতুন দুনিয়ার বিদ্রোহ ফেটে পড়েছে। মঞ্চ প্রস্তুত হয়ে গেছে, অভিনেতারা জড় হয়েছে। এমন সংগ্রাম শুরু হবে যা এ দুনিয়া পূর্বেও দেখেনি, পরেও দেখবে না। কারণ এই হবে সমাজের শেষ সংগ্রাম। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যেই সব দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি হয়ে যাবে।

এইভাবে আন্তর্জাতিক ভিত্তির উপরই নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠবে।* দেশে দেশে গড়ে উঠবে ভ্রাতৃত্ব, পুরাতন ঝগড়া ভুলে গিয়ে পরস্পর করমর্দন

* "এখন জাতীয় স্বার্থ ও মানবিক স্বার্থের সঙ্গে বিরোধ রয়েছে। সভ্যতার উন্নত স্তরে এই দুইটি স্বার্থই মিলে যাবে"—ভি থুনেন (V. Thunen): Der Isolirte Staat (The Isolated State).

করবে, ক্রমশঃ ক্রমশঃ সারা বিশ্বের নতুন সমাজ গড়ে তুলবার কাজে মিলিত হবে। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে শত্রুতার সম্বন্ধ থাকবে না, পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্বের মাধ্যমে সবারই উন্নতির জন্য সাহায্য করবে।

যখন সভ্য দেশগুলি পরস্পর মিলিতভাবে চলবে, তখন আর যুদ্ধের ভয় থাকবে না। দুনিয়ায় স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। তখন এমন সময় আসবে যখন সব দেশই বুঝতে পারবে যে যুদ্ধ বিবাদের মধ্য দিয়ে কোনো দেশের স্বার্থ রক্ষা হবে না, সৌহার্দের মধ্য দিয়েই হবে। ভবিষ্যতের সেই আদর্শ সমাজের মানুষ পুরাতন ইতিহাস থেকে তাদের সন্তান-সন্ততিদের কাছে বলবে, কেমন করে মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে বন্য পশুর মতো পরস্পরকে আক্রমণ করত আর কেমন করে অবশেষে মনুষ্যত্বের কাছে পশুত্বের পরাজয় ঘটেছে।

এতকাল ধরে মানুষের যে কথাটা বুঝতে বা করতে অনেক বড় বড় মাথা ঘায়েল হয়ে যেত এবং যা কার্যকর করার প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতো, তখন ভবিষ্যৎ বংশধরেরা তা সহজেই অনুভব করতে পারবে।** তখন সভ্যতার প্রতিটি অগ্রগতি পরবর্তী অগ্রগতির ধাপের দিকে এগিয়ে যাবে. মানুষের সামনে নতুন নতুন কাজের দায়িত্ব এসে যাবে, আর নিরবচ্ছিন্নভাবে অগ্রসর হতে থাকবে আরও, আরও উন্নততর মানবসমাজ।

** উদাহরণ স্বরূপ দেখা যায়, কনডরসেট (condorcet), বিগত শতাব্দীর একজন অন্যতম জ্ঞানকোষ বিশেষজ্ঞ, বলেছিলেন যে সকলের জন্যই একটি সর্বজনীন ভাষার প্রয়োজন। তিনি নারীদের সম্পূর্ণ সমান অধিকারেও দাবী করেছিলেন।

ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্স গ্রীম-এর ভাষায় "ব্যবসা বাণিজ্য, শিক্ষা মানসিক চিন্তাধারার আদান প্রদানের বিনিময়ের জন্য যেভাবে টেলিগ্রাফ ষ্টীমার মারফৎ যোগাযোগ ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে তাতে মনে হয় ঈশ্বর সারা দুনিয়াটাকে একটি জাতিতে পরিণত করতে যাচ্ছেন, তাদের ভাষাও হবে একই, আর সেই আদর্শ রাষ্ট্রে পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের জন্য সেনা বা নৌবাহিনীর কোনো প্রয়োজনই থাকবে না"। আমেরিকার লোকই যে ঈশ্বর সম্বন্ধে এরকম কল্পনা করবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেই শঠতার চরমরূপ দেখা যায়। সরকার থেকে যেটা না পারে, ধর্মের নামে তা জনগণকে বুঝিয়ে দেয়। তার-ফলেই, যে সব জায়গায় রাষ্ট্রের অবস্থাটা কিছু শিথিল হয়ে পড়ে সে সব জায়গায় বুর্জোয়ারা খুবই ধার্মিক হয়ে ওঠে। সে ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের পরই আসে ইংলণ্ড, বেলজিয়াম, সুইজারল্যাণ্ড।

অতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা

আন্তর্জাতিক দিক থেকে বর্তমানে আমরা আর একটি জরুরী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি, সেটি হল জনসংখ্যার বৃদ্ধি। বাস্তবিক পক্ষে কখনো কখনো এই সমস্যাটির উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়, যার উপর নির্ভর করে অন্য সব সমস্যার সমাধান। ম্যালথাসের (MALTHUS) সময় থেকেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির রীতিপ্রণালী নিয়ে একটানা তর্কাতর্কি চলে আসছে। ম্যালথাসের বহুল প্রচারিত কুখ্যাত পুস্তক "এসে অন দি প্রিন্সিপলস্ অব পপুলেশন" (Essay on the principles of population) খানির কার্ল মার্কস তীব্র সমালোচনা করেছেন। ম্যালথাস এই পুস্তকে এক তত্ত্ব উত্থাপন করে বলেছেন : জনসংখ্যা জ্যামিতিক হারে (অথাৎ ১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২…) বৃদ্ধি পায়, আর খাদ্য-সামগ্রী বৃদ্ধি পায় গণিতের হারে (অর্থাৎ ১, ২, ৩, ৪, ৫…)। তার ফলে মানুষের তুলনায় খাদ্যসামগ্রী অনেক কম পড়ে যায়, অভাব অনটন অনাহার শুরু হয়। সুতরাং মানুষকে সন্তান জন্ম দেওয়া থেকে বিরত থাকা দরকার এবং যথেষ্ট সংস্থানের ব্যবস্থা না করে কারুরই বিয়ে করা উচিত নয়। কারণ তা না হলে সেই সব সন্তানদের দুনিয়ায় বাঁচার অবস্থা থাকবে না।

মানুষের মধ্যে অতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ভয় বহুকাল থেকেই চলে আসছে। ইতিপূর্বেই মধ্যযুগের শেষ দিকে গ্রীকদের অবস্থার আলোচনা প্রসঙ্গে সে কথা বলা হয়েছে। এটা লক্ষ্য করবার বিষয় যে, **সমাজের অবস্থা যখনই অবনতির দিকে যায়, তখনই এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির ভয় দেখা দিয়ে থাকে।** তার কারণ সহজেই বোঝা যায়, এ পর্যন্ত সর্বপ্রকারের সমাজ ব্যবস্থাতেই শ্রেণীভেদ দেখা গেছে। আর এক শ্রেণীর উপর অপর শ্রেণীর প্রাধান্যের মূলেই রয়েছে জমির উপর তাদের মালিকানা। ক্রমশঃ অধিকাংশ মানুষের হাত থেকে জমির মালিকানা স্বল্প সংখ্যক লোকের হাতে চলে গেছে। ব্যাপক জনগণের হাতে কোনো সম্পত্তি বা তাদের জীবনধারণের কোনো উপায় নেই। সুতরাং তাদের খাওয়া পরার জন্য নির্ভর করতে হয় শাসকশ্রেণীর উপর। এই শ্রেণী-গুলির পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব বেধে যায়। এই দ্বন্দ্ব বিভিন্ন সামাজিক অবস্থায় বিভিন্ন রূপে দেখা দেয়, কিন্তু অবশেষে ক্রমশই আরো স্বল্প সংখ্যক মানুষের হাতেই জমিজমা সম্পত্তি কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। সেই অবস্থায় আর সকলের

বেলায়ই পরিবারের মধ্যে নতুন শিশু জন্মালেই তা আতঙ্কের কারণ হয়ে ওঠে। মালিকদের ইচ্ছামত তারা উৎপাদনের কাজ বা চাষের কাজ পরিচালনা করতে থাকে। জনগণের স্বার্থের দিকে তাকায় না। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি মানুষের কাছে দারুণ আতঙ্কের বিষয় হয়ে পড়ে; ইটালী বা রোমের জমিগুলি যখন ৩০০০ মানুষের মালিকানায় ছিল, তখনকার চেয়ে অন্য কোন সময়ই সে সব জমির উৎপাদন কম হয়নি। তবে কেন বৃহৎ ভূসম্পত্তি হবার দরুন রোমের সর্বনাশ হয়ে গেল বলে হাহাকার শোনা যায়। তার কারণ জমির মালিকানা এখন নিজেদের খুশিমত জমিগুলোকে শিকারের আখড়ায় বা আমোদ প্রমোদের আখড়ায় পরিণত করেছে, অথবা অনেক সময় চাষ আবাদ না করেই জমি ফেলে রাখে, কারণ দাস-শ্রম দিয়ে জমি চাষ করানোর চেয়ে সিসিলিও আফ্রিকার থেকে তুলা আমদানি করা সস্তা পড়ে, এতে তুলোর ব্যাপারীরা আস্কারা পেয়ে যায়। ফলে রোমের জনগণ এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা দেয় দারিদ্র। তাদের মধ্যে বিয়ে না করার ও সন্তানের জন্ম না দেবার ঝোঁক দেখা যায়। তারপর আবার শাসকশ্রেণীর মধ্যেও জনসংখ্যা হ্রাস পেয়ে যাচ্ছে দেখে তাদের উৎসাহ দেবার জন্য আইন তৈরি করতে হয়।

মধ্যযুগের শেষের দিকে ঠিক এই অবস্থাই দেখা গিয়েছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভূস্বামীরা কৃষকদের সর্বস্ব লুঠ করেছে, তাদের সব জমি আত্মসাৎ করেছে, কৃষকরা বিদ্রোহ করলে তাদের নৃশংসভাবে দমনপীড়ন করেছে দেবোত্তর সম্পত্তি পর্যন্তও আত্মসাৎ করেছে, এমনি করেই তারা তাদের 'রিফর্মেশন' বা সংস্কারের কাজ করেছে। তার ফলে তৈরি হয়েছে দেশের মধ্যে অসংখ্য চোর-ডাকাত, ভিখারি, ভবঘুরে ইত্যাদি। হৃতসর্বস্ব গ্রামের মানুষ শহরে এসে ভিড় করেছে, কিন্তু সেখানেও তাদের জীবিকার কোনো উপায় খুঁজে পায়নি। তাদের অবস্থা হয়েছে আরো সঙ্গীন। তখন দেখা গিয়েছে "জনসংখ্যা বৃদ্ধির" আশঙ্কা ও আতঙ্ক।

ইংল্যাণ্ডের যে সময়টায় নানা প্রকার যন্ত্রপাতির আবিষ্কারের ফলে শিল্প উৎপাদনের উন্নতি হয়, বিশেষ করে সুতাকল, কাপড়ের কল প্রভৃতির যান্ত্রিক উৎকর্ষের বৈপ্লবিক পরিবর্তন হওয়ার ফলে হাজার হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে, ঠিক সেই সময়েই ম্যালথাসের কথা শোনা যায়। তখন ইংল্যান্ডে পুঁজি ও ভূসম্পত্তি অত্যধিক কেন্দ্রীভূত হয়ে মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে চলে যায়। তার সাথে সাথেই দেখা যায় জনসাধারণের মধ্যে অত্যধিক দারিদ্র। সে অবস্থাটাকে শাসকশ্রেণী খুবই ভাল মনে করে। আর তাদের হাতে এত ধন ঐশ্বর্য জড়ো হওয়া সত্ত্বেও, শিল্পের এত উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও জন-সাধারণের মধ্যে দারিদ্র কেন বেড়েই চলেছে, তার একটা কৈফিয়ত বের করার

চেষ্টা করে। তার জন্য শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিপদের কথা বলতে থাকে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার কুফলের কথাটা চেপে যায়। এই পরিস্থিতিতে ম্যালথাসের জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কে অপরিণত, বাক্যবাগীশ, চাতুর্যপূর্ণ তত্ত্বকথা শাসক শ্রেণীর খুবই মনঃপূত হয়, আর তারা পরম আনন্দে নিজেদের বাহাদুরির কথা দুনিয়ার কাছে ঢাক ঢোল পিটিয়ে প্রচার করে। তাই ম্যালথাসের বিশ্লেষণ একদিক থেকে যেমন প্রচুর সমর্থন পেয়েছে, অপর দিক থেকে তেমনই প্রবল বিরোধিতা এসেছে। ম্যালথাস ইংল্যাণ্ডের বুর্জোয়াদের জন্য ঠিক সুযোগমত তাদের উপযোগী কথাই বলতে পেরেছে, তাই তার বইয়ে যদিও তার নিজের কোন মৌলিক বক্তব্যই নেই, সে একটা নামকরা লোক হয়ে পড়লো, তার নামে একটা গোষ্ঠীও তৈরি হয়ে গেল।

যে অবস্থার মধ্যে ম্যালথাস তার নৃশংস মতবাদ প্রচার করেছিল (কারণ, তার সে মতবাদ শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধেই কষাঘাত করার জন্য তৈ র হয়েছিল) সে অবস্থার উন্নতি তো হয়ই নাই, বরং যুগের পর যুগ ধরে আরো অবনতি হয়েছে, আর শুধু ম্যালথাসের জন্মস্থান ইংলণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রেই নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই, যেখানেই ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা জনগণকে শোষণ করে চলেছে, সেখানেই ম্যালথাসের মতবাদ শিকড় গেড়ে বসেছে, ছড়িয়েছে। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে উৎপাদনকারীকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। জমি বা কলকারখানা উৎপাদনের উপায়গুলি সব পুঁজিপতিদের হাতে থাকে। ক্রমশঃই উৎপাদনের নতুন নতুন শাখা খুলতে থাকে, যন্ত্রপাতির উন্নতি হতে থাকে আর সাধারণ মানুষের মধ্যে বেকারী বাড়তে থাকে। কৃষির ক্ষেত্রে, যেমন প্রাচীন রোমে দেখা গেছে, ভূসম্পত্তি বিস্তৃতভাবে বেড়ে চলেছে, আর তার ফল যা দাঁড়াবার তাই দাঁড়িয়েছে। যেমন দেখা গেছে যে আয়ার্ল্যাণ্ডে ১৮৭৬ সালে মাঠ ও চারণ ভূমির পরিমাণ ছিল ৮৮·৪৪ বর্গমাইল, আর চাষের ভূমি ছিল মাত্র ২৬৩·৩ বর্গমাইল, আর প্রতি বছরই দেখা গেছে যে চাষের জমি কমে যাচ্ছে, আর মাঠ, ছাগল, গোরু, ভেড়ার চারণভূমি, জমিদারদের জন্য শিকার করবার ভূমি বেড়ে চলেছে। আয়ার্ল্যাণ্ডে চাষযোগ্য অনেকটা জমিই ক্ষুদ্র ও মাঝারি চাষীদের হাতে আছে। কিন্তু তারা সে সব জমি চাষ করবার খরচ যুগিয়ে উঠতে পারে না। তাই আয়ার্ল্যাণ্ড আবার যেন পিছনের দিকে ঘুরছে, চাষের কাজ থেকে আবার পশুপালনের দিকে ফিরে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে সেখানকার জনসংখ্যা এই শতাব্দীর প্রথমে যেখানে ছিল ৮,০০০,০০০ সেখানে সেই সংখ্যা কমে এখন দাঁড়িয়েছে ৫,০০০,০০০ তবুও কয়েক লক্ষ মানুষ সেখানে বাড়তি হয়ে পড়েছে। স্কটল্যাণ্ডের অবস্থাও ঐ রকমই। আর যে হাঙ্গেরী গত কয়েক

দশকের মধ্যে আধুনিক উন্নত দেশের পর্যায়ে এগিয়ে এসেছে, সেখানকার অবস্থাও তেমনিই। যে দেশের জমির উর্বরতার সমগ্র ইউরোপের মধ্যে তুলনা নেই, সে দেশেরই অবস্থা এখন দেউলিয়া, মানুষ দেনার দায়ে ডুবে মহাজনের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে দৈন্যদশার মধ্যে অনেকেই দেশ ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। আর সেখানে কিনা জমি সব কেন্দ্রীভূত হয়ে গেছে বিরাট বিরাট আধুনিক পুঁজি-পতিদের হাতে, যারা ঐ সব জমিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছে। তার ফলে অদূর ভবিষ্যতেই হাঙ্গেরীর পক্ষে আর খাদ্যশস্য রপ্তানি করা সম্ভব হবে না। ইটালির অবস্থাও একই প্রকার। সেখানেও পুঁজিবাদ অগ্রসর হচ্ছে, আর কৃষকদের দারিদ্র ও ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে। কয়েক বছর পূর্বেই ছোট ছোট জমির মালিকরা জলাভূমি ও পতিত জমির সংস্কার করে বাগান ও চাষের জমি তৈরি করেছিল।, সেগুলি আবার সেই পুরাতন অবস্থায় ফিরে যাচ্ছে। চারপাশে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব এত বেড়ে গেছে যে ১৮৮২ সালে সরকার ভীত হয়ে একটি তদন্ত কেন্দ্র স্থাপিত করল। তার ফলে দেখা গেল যে ইটালির মোট ৬৩টি প্রদেশের মধ্যে ৩২টিতে এই রোগ ছেয়ে গেছে, আরো ২৬টিতে এই রোগ সংক্রামিত হচ্ছে এবং ৫টি প্রদেশ এখন পর্যন্ত এই রোগ থেকে মুক্ত আছে। যে ব্যাধি আগে শুধু গ্রামাঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল, তা শহরে ছড়িয়ে পড়ছে। গ্রাম থেকে সর্বহারা মানুষ শহরের সর্বহারাদের সংগে মিলছে। সর্বহারা মানুষের মধ্যে যেমন সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে, তেমনি রোগ-ব্যাধিরও বৃদ্ধি হচ্ছে।

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার পরিণতি সম্পর্কে এতক্ষণ যে সব আলোচনা করা গেল, তার থেকে দেখা যাচ্ছে যে জনসাধারণের দুঃখ কষ্টের কারণ খাদ্যের অভাবেই যে হচ্ছে, তা নয়। তার কারণ প্রথমত ধনবন্টনের বৈষম্য যার ফলে একদিকে কয়েকজনের হাতের অতিরিক্ত ধনসম্পদ কেন্দ্রীভূত হচ্ছে, অন্যদিকে জনগণের মধ্যে চলছে অনাহার। দ্বিতীয়ত পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রথায় ক্রমাগতই বহু-জিনিসের অপচয় হয়, আর শিল্প ও কৃষির উৎপাদনের কাজে অবহেলা করা হয়।

ম্যালথাসের বক্তব্য শুধু পুঁজিবাদী উৎপাদনের বেলাতেই খাটে, আর পুঁজিবাদীরাই আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য সে বক্তব্য সমর্থন করে থাকে।

অপরপক্ষে, পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা শিশুদের জন্মের প্রয়োজনে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে, কারণ কারখানার কাজের জন্য অল্প মজুরিতেই শিশু-শ্রম পাওয়া যায়। শ্রমিকের পক্ষে বড় পরিবার তো লাভজনক। শিশুদের জন্য তাদের কোনো খরচ নেই, কারণ তারা ছোটবেলা থেকেই খেটে খায়। বড় পরিবার হলে শ্রমিকের পক্ষে অপরের সংগে প্রতিযোগিতা করতে সুবিধা হয়,

বিশেষ করে যে সব কাজ ঘরে বসে করা যায় সে সব ক্ষেত্রে তো নিশ্চয়ই সুবিধা হয়। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিকদের দারিদ্র বাড়তে থাকে, তাদের ছেলেমেয়েরা ছোটবেলা থেকেই কারখানায় কাজ করে নিজেরা খেটে খায়, আবার পরবর্তী সময়ে সেই শ্রমিকদেরই ছাঁটাই-এর পথ পরিষ্কার হয়। সত্যিই, কি জঘন্য ঘৃণিত এই উৎপাদন ব্যবস্থা !

পুঁজিবাদের অগ্রগতির সংগে সংগে তার দুর্নীতি ও কুফলগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, বুর্জোয়া ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী ম্যালথাসের মতবাদ যে সহজেই গ্রহণ করা হবে তাও বোঝা যায়। আর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সম্বন্ধে ম্যালথাসের মতবাদ জার্মানির মধ্যবিত্তশ্রেণীর মনেই বেশি ধরেছে। এই মতবাদ 'পুঁজি'কে অপরাধ থেকে মুক্তি দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীকেই অপরাধী সাব্যস্ত করেছে।

দুর্ভাগ্যক্রমে জার্মানিতে শুধু জনসংখ্যাই অতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়েছে তাই নয়, এখানে বুদ্ধিজীবীর সংখ্যাও অতিরিক্ত হয়ে গেছে। পুঁজি যে শুধু জমির উৎপাদন, দ্রব্যসামগ্রী, শ্রমিক, নারী ও শিশুদের সংখ্যাই অতিরিক্ত বৃদ্ধি করে তাই নয়, বড় বড় বিদ্বান, বুদ্ধিমান, অফিসারদের সংখ্যাও অতিরিক্ত বৃদ্ধি করে থাকে।

তাই বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা ম্যালথাসের মতবাদকে মেনে নিতে পারে, কিন্তু সেই মতবাদকে তারা কমিউনিস্ট সমাজের উপর চাপাতে পারে না, যেমন, জন স্টুয়ার্ট মিল বলেছেন "কমিউনিস্ট সমাজে কখনই এ রকম স্বেচ্ছাচার বরদাস্ত করা যাবে না। জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুন যদি মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য কমে যায়, আর জনগণের পরিশ্রম বাড়ে, তবে সে সমাজের প্রতিটি মানুষেরই অসুবিধা হবে (এখন কিন্তু সে রকম হয় না), তখন আর সে অসুবিধার জন্য মালিকদের অর্থলিপ্সা বা মুষ্টিমেয় ধনীদের বিশেষ সুযোগ সুবিধাকে দায়ী করা যাবে না। তখন সেই পরিবর্তিত অবস্থায় সমাজের স্বার্থেই মানুষের মধ্যে সংযম, শৃংখলা আরোপ করতে হবে। কমিউনিস্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী জনসংখ্যার অতিরিক্ত বৃদ্ধির থেকে যাতে ক্ষতি না হয় তার জন্য আগে থেকেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। রল-এর 'হ্যাণ্ডবুক অব পলিটিক্যাল ইকনমি'র (Raul's Handbook of Political Economy) ৩৭৮ পৃষ্ঠায় অধ্যাপক এ্যাডলফ ওয়াগনার (Professor Adolph Wagner) বলেছেন "সমাজতান্ত্রিক সমাজ নীতিগতভাবেই বিবাহ ও সন্তান জন্ম দেবার ব্যাপারে যথেচ্ছ স্বাধীনতা দিতে পারবে না।"

এই দুই লেখকই ধরে নিয়েছেন যে সমস্ত প্রকার সমাজেই অতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ঝোঁক থাকবে কিন্তু উভয়েই মনে করেছেন যে অন্য

যে কোনো সমাজব্যবস্থার চেয়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাই জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও মানুষের জীবনধারণের উপায়ের সঙ্গে বেশি সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারবে।

একদিক থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও খাদ্য সমস্যার সঙ্গে সম্বন্ধ বিষয়ে ভুল ধারণা, অন্যদিক থেকে সমাজতন্ত্র সম্বন্ধেও ভুল ধারণা দেখা যায়। আবার সম্প্রতি সমাজতন্ত্রের সমর্থকদের মধ্য থেকেও এক প্রকার মত প্রকাশ করায় ঐ সব ভ্রান্ত ধারণা বাড়তে সুযোগ পেয়ে গেছে। এ বিষয়ে কার্ল কাউটস্কি (Karl Kautsky)-র একখানা বইয়ের উল্লেখ করছি। সমাজ-প্রগতির উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব (The Influence of Increasing Population on the Progress of Society)-এর মধ্যে কাউটস্কি ম্যালথাসকে আক্রমণ করেছেন বটে, তবে, আবার নীতিগতভাবে তাকে সমর্থনও করেছেন। তিনি ম্যালথাসের মতোই 'ল অব ডিমিনিশিং রিটার্ন' (Law of Diminishing Return) বা ক্রমশঃ জমির উৎপাদন শক্তি কমে আসার কথা বলেছেন, আবার তিনি অনেক উদাহরণ দিয়ে যখন দেখিয়েছেন যে কৃষি এবং অন্যান্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে কতদূর উন্নতি সাধন করা যেতে পারে, তখন তিনি স্বার্থবিরোধী কথা-বার্তাও বলেছেন। বর্তমানের সমাজব্যবস্থা ও সম্পত্তি ও বন্টন ব্যবস্থার মধ্যে যে কতদূর অসামঞ্জস্য রয়েছে তা তিনি ঠিকই দেখিয়েছেন, আর এই ক্ষয়িষ্ণু সমাজই যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির আতঙ্কে ভুগছে তাও তিনি দেখিয়েছেন। তবে তিনি এই সিদ্ধান্তেই এসেছেন যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি সীমার মধ্যে রাখতে অন্যান্য সমাজ যেখানে ব্যর্থ হয়েছে, সমাজতান্ত্রিক সমাজ সেখানে সফল হবে। অবস্থাটা ঠিক পরস্পর বিরোধী।

কাউটস্কির মত অনুযায়ী যে কোনো সামাজিক প্রশ্নেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির নিয়মের কথাটা এসে যায়। এ বিষয়ে তিনি এফ. এ. ল্যাঙ (F.A. Lang)-এর মত মেনে চলেছেন, যিনি কিনা জন স্টুয়ার্ট মিলের অন্ধ ভক্ত। কাউটস্কির মত অনুযায়ী জনসংখ্যা বৃদ্ধির অবস্থাটা এতই ভয়াবহ হয়ে পড়ে যে তিনি আতঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন : "আমরা কি তবে হতাশ হয়ে হাত-জোড় করে থাকব? সুখী হতে চাওয়াটা কি মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ? তবে কি গণিকাবৃত্তি, চিরকৌমার্য, ব্যাধি, দুর্দশা, যুদ্ধ, হত্যাকাণ্ড এবং অন্যান্য সব দুঃখ-দুর্দশা যা কিছু আমাদের সমগ্র জাতিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে সে সবই আমাদের জন্য অনিবার্যভাবেই দেখা দেবে?" আবার তিনি নিজেই তার জবাবে জোরের সঙ্গে বলেছেন : "হ্যাঁ সে সবই অনিবার্য হয়ে উঠবে, যদি না জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধের নিয়মগুলো সর্বত্র সভয়ে পালন করা না যায়।"

আজ পর্যন্ত মানুষ যখনই কোনো আইনকে মেনে নিয়েছে, তখনই সে

সম্বন্ধে তার ভয় দূর হয়ে গেছে—আর এ বিষয়ে মনে হচ্ছে যে আইন মেনে নিলেই মানুষের ভয় বাড়বে। আর জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই বিপদের সামনে কাউটস্কির উপদেশ হল—ম্যালথাস, পল বা গীর্জার পাদরীদের মতো নারীসঙ্গ বর্জন করা নয়, বরং জন্মনিরোধের ব্যবস্থা অবলম্বন করে নারীসংগ উপভোগ করা যাতে মানুষের যৌনপ্রবৃত্তি তৃপ্ত করার প্রয়োজন মিটতে পারে। ম্যালথাসের মতবাদে বিশ্বাসী লোকেরা মনে করে যে মানুষের অবস্থার উন্নতি হলেই আমাদের সমাজটা পরিণত হবে যেন একটা শশকজাতীয় প্রাণীদের আখড়ায়, আর তাদের সামনে থাকবে না কোনো উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, তারা শুধু যৌন সম্ভোগেই মেতে থাকবে. আর অসংখ্য সন্তানের জন্ম দিতে থাকবে। এ হল সমাজের উচ্চস্তরে পেঁছে মানুষ সম্বন্ধে এক হীন ধারণা। কাউটস্কি ভিরচাউ (VIRCHOW)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন ঃ "ইংলিশ শ্রমজীবী মানুষদের মধ্যেই এমনই অধঃপতন ও হতাশা দেখা দিয়েছে যে তারা জীবনকে উপভোগ করবার জন্য শুধু দুটো জিনিসই জানে—মদ খাও আর নারীসংগ ভোগ কর, আর গত কয়েক বছরের মধ্যে উত্তর সাইলেসিয়ার মানুষদের দিকে তাকালেই এর ফল বেশ বোঝা যায়। মদ আর মেয়েলোকই সবচেয়ে প্রাধান্য পেয়েছে। তার থেকেই এ কথা সহজেই বোঝা যায় যে সেখানে এর মধ্যে জনসংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি মানুষের স্বাস্থ্য ও নৈতিক চরিত্রের অবনতি ঘটেছে"। আমার মনে হয় এর থেকে দেখানো হয়েছে যে সভ্যতা সৃষ্টির উন্নতির সংগে সঙ্গে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই কোন্ দিকে যাবে।

কাউটস্কি আর একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন কার্ল মার্কস-এর থেকে, যার মধ্যে পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন পাওয়া যায় ঃ "বস্তুতঃ দেখা যায় যে মানুষের উপার্জন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বা বিভিন্ন পর্যায়ের শ্রমজীবী মানুষের জীবন ধারণের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শুধু যে তাদের মধ্যে জন্ম ও মৃত্যু সংখ্যাই হ্রাস পেতে থাকে তা নয়, পরিবারগুলির আকারও ছোট হতে থাকে। ধনতান্ত্রিক সমাজের এই রীতি অ-সভ্য বা সভ্য ঔপনিবেশিক দেশের কাছে অসম্ভব বলে মনে হবে। এর থেকে আমাদের মনে পড়ে যায় যে প্রাণী জগতে দুর্বল শ্রেণীর জীবজন্তুদেরও কত অসংখ্য বাচ্চা হয়ে থাকে।" মার্কসের রচনার বিষয়ে ল্যাঙ (Lang) লিখেছেন ঃ "সারা পৃথিবীর মানুষই যদি সুখে স্বাচ্ছন্দে থাকত তা হলে পৃথিবী ক্রমশঃ জনশূন্য হয়ে যেত।" ল্যাঙ যে কথা বলেছেন তা ম্যালথাসের ঠিক বিপরীত।

কাউটস্কি নিজেও মনে করেন না যে মানুষের জীবন মানের ও সভ্যতা-কৃষ্টির উন্নতির সঙ্গে সংগে সন্তানের জন্মদানের সংখ্যাও কমে আসবে। তিনি মনে করেন বরং তখন ঠিক উল্টো ফলই হবে। তাই তিনি জমির উৎপাদন

ক্রমশঃ হ্রাসের নিয়মের (Law of Diminishing Return) সংগে তাল রাখবার জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করবার কথাই বলেছেন।

এবার দেখা যাক তথাকথিত উৎপাদন হ্রাসের (Law of Diminishing Return) বিষয়টাই বা কি আর তার সংগে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টারই বা কি সম্বন্ধ। জনৈক প্রথম শ্রেণীর কৃষি বিশেষজ্ঞ, এবং অর্থনীতিবিদ, যিনি উভয় ক্ষেত্রেই ম্যালথাসের চেয়ে অনেক বেশি বিজ্ঞ, তিনি বলেছেন: ভবিষ্যতে কাঁচামালের উৎপাদন, বিশেষ করে খাদ্য সামগ্রীর উৎপাদন কলকারখানার উৎপাদন ও রপ্তানি মালের চেয়ে কম হবে না·········বর্তমানেই সর্বপ্রথম কৃষিক্ষেত্রে রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার শুরু হয়েছে। তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেক ভুল-ভ্রান্তিও হবে। তবুও একথা বলা যায় যে এখন যেমন প্রয়োজনীয় পরিমাণ উল সরবরাহ করতে পারলেই সমাজ যত ইচ্ছা পোশাক তৈরি করতে পারে ভবিষ্যতের সমাজ ঠিক তেমনি ভাবেই অধিক খাদ্য উৎপাদনের ক্ষমতা অর্জন করতে পারবে।*

অপর একজন বিশেষজ্ঞ লিবিগ (Liebig) বলেছেন যতক্ষণ মানুষের শ্রমশক্তি ও জমির সার পাওয়া যাবে ততক্ষণ জমির উৎপাদন ক্ষমতাও স্থায়ী-ভাবেই অফুরন্ত হয়ে থাকবে। সুতরাং দেখা যায় ম্যালথাসের ল অব ডিমিনিশিং রিটার্নের কোনো সত্যতা নেই। কৃষির পশ্চাৎপদ অবস্থার সময়ই সে কথা কিছুটা খাটে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অগ্রগতির সংগে সংগে সে কথা আর খাটে না। ঐ নীতিটা আসলে এইভাবে বলা যায়: "যে অনুপাতে মানুষের শ্রম (বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতি সহ) প্রয়োগ করা যাবে, আর উপযুক্ত সারের ব্যবস্থা করা যাবে সেই অনুপাতেই জমির থেকে ফসল উৎপাদন হবে। ইতিমধ্যেই দেখানো হয়েছে যে ব্যাপক ভিত্তিতে যদি চাষ আবাদ করা যায়, তবে বর্তমানের বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগে কি বিপুল পরিমাণে উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়। ফ্রান্সের কৃষকদের মধ্যে ছোট ছোট ব্যক্তিগত মালিকানা রয়েছে। তবুও সেখানে বিগত নব্বুই বছরের মধ্যে জমির ফসল চতুর্গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এই সময়ের মধ্যে সেখানকার জনসংখ্যা দ্বিগুণও হয়নি। আর সমাজতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী সংযুক্ত চাষের ব্যবস্থা করলে এর চেয়ে বহুগুণ ফসল বৃদ্ধির আশা করা যেতে পারে। তাছাড়া আমাদের ম্যালথাসপন্থীরা ভুলে যান যে আমরা শুধু আমাদের দেশের জমির হিসাবই দেখব না, সারা পৃথিবীর জমির হিসাব দেখব। অন্যান্য দেশের জমির উর্বরতা ভালভাবে কাজে লাগানো হলেও আমাদের দেশের জমির চেয়ে তার উৎপাদন বিশগুণ, ত্রিশগুণ অথবা তারও বেশি

* Rodbertus: "Zur Beleuchtnug der Socialen Froge" (Enquiry into the Social Question) 1850.

হয়ে যাবে। পৃথিবীর ভূখণ্ডের একটা বড় অংশেই জনবসতি হয়ে গেছে কিন্তু মাত্র কয়েকটা জায়গা ছাড়া কোথাও জমিগুলি উৎপাদনেরকাজে ভালভাবে লাগানো হয়নি। তাহলে শুধু যে গ্রেটব্রিটেনেই খাদ্য উৎপাদন অনেক বেশি হতে পারতো তা নয়, (যে বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা হয়েছে) ; ফ্রান্স, জার্মানি, অষ্ট্রিয়া এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশেও অনেক বেশি খাদ্য উৎপাদন হতে পারতো।

ইউরোপিয়ান রাশিয়া বর্তমানের জার্মানির জন-সংখ্যার হিসাব অনুযায়ী, এখনকার ৭'৮ কোটি মানুষের পরিবর্তে ৪৭'৫ কোটি মানুষকে খাওয়াতে পারতো। রাশিয়াতে প্রতি বর্গ মাইলে ৭৫০ জন অধিবাসী আছে, স্যাকসনিতে আছে ১০,১৪০। স্যাকসনির মতো ঘন-বসতি হলে রাশিয়াতে ১০০ কোটি মানুষের বসতি হতো। কিন্তু বর্তমানে সারা বিশ্বেই জনসংখ্যা ১৪৩ কোটির বেশি নয়।

বলা হয়ে থাকে যে রাশিয়ার বিশাল ভূখণ্ডে উর্বরতা নেই, সে কথা ঠিক নয়। সেখানে দক্ষিণাঞ্চলে জমির উর্বরতা জার্মানির চেয়ে বহুগুণে ভাল। তদুপরি ঘন জনবসতি, বনের অংশ কমে আসা, জলাভূমির সংস্কার প্রভৃতির মধ্য দিয়ে আবহাওয়ার যে কতদূর পরিবর্তন হয়ে যাবে তা আগে থেকে ধারণাই করা যায় না। যেখানেই বহুসংখ্যক মানুষ এসে জড় হয়, সেখানেই আবহাওয়া বদলে যায়। এ সব দিকে আমরা এখন কোনো দৃষ্টি দেই না, তার তাৎপর্য ধরতে পারি না। কারণ তার সুযোগও হয় না, আর এখন সে সব নিয়ে ব্যাপক-ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করারও কোনো সুযোগ নেই। তাছাড়া সমস্ত পর্যটকরাই একথা বলে থাকেন যে এমন কি সাইবেরিয়ার সুদূর উত্তরেও যেখানে বসন্ত গ্রীষ্ম হেমন্ত ঋতু পর পর তাড়াতাড়ি আসে এবং অল্প কয়েকমাস মাত্র থাকে, সেখানেও এত প্রচুর উৎপাদন হয়ে থাকে যে দেখলে বিস্ময় বোধ হয়। তারপর নরওয়ে ও সুইডেনের কথা। সেখানে জনসংখ্যা খুব কম, বিস্তীর্ণ বনভূমি। সেখানে রয়েছে অফুরন্ত ধাতব ঐশ্বর্য, বহু নদনদী, বিশাল সমুদ্র উপকূল। সেখানে ঘনবসতির মানুষের জন্য প্রচুর উৎপাদন হতে পারতো। কিন্তু বর্তমানে সেখানে কাজের মানুষের অভাব। বর্তমান অবস্থায় সে সব দেশের ধনসম্পদের উৎস খুলে দেবার মতো পরিস্থিতি ও ব্যবস্থা নেই।

আর এ কথা যদি ইউরোপের উত্তরাঞ্চলের পক্ষে প্রযোজ্য হয় তবে ইউরোপের দক্ষিণাঞ্চলের দেশগুলি—পর্তুগাল, স্পেন, ইটালী, গ্রীস, ড্যানিউবের কাছের দেশগুলি, হাঙ্গেরী, তুর্কি ইত্যাদি দেশগুলির পক্ষে আরো অনেক বেশি প্রযোজ্য। এসব দেশগুলির আবহাওয়া অতুলনীয়। জমির উর্বরতা ও সমৃদ্ধিতে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে ভাল জমিকেও ছাড়িয়ে যায়। এসব দেশে প্রচুর জনসংখ্যার ভরণপোষণের ব্যবস্থা হতে পারতো। কিন্তু সেখানকার রাজনৈতিক

ও সামাজিক দুর্নীতির জন্য আমাদের দেশের শত সহস্র মানুষ নিজের দেশে বসবাস করার বদলে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে অন্য দেশে চলে যাওয়াটাই পছন্দ করে। সামাজিক ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি উপযুক্ত যুক্তিসংগত হলে এসব দেশের বিশাল ভূখণ্ডের উৎপাদনশীল কাজে কোটি কোটি মানুষ নিযুক্ত হতে পারবে।

আমাদের সামনে যে উচ্চ সাংস্কৃতিক আদর্শ রয়েছে তা পূরণ করার জন্য বহু লোকের প্রয়োজন। সে তুলনায় ইউরোপের বর্তমান জনসংখ্যা মোটেই বেশি নয়, বরং কমই এবং অদূর ভবিষ্যতেও এখানে জনসংখ্যায় অতিরিক্ত বৃদ্ধির ভয়ের কোনো কারণ নেই।

যদি আমরা ইউরোপ ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশের দিকে তাকাই তবে দেখতে পাব যে সে দেশে বিশাল ভূখণ্ডের তুলনায় জনসংখ্যা অনেক কম। পৃথিবীর সবচেয়ে উর্বর ও ঐশ্বর্যে ভরা দেশগুলিতে অনেক জমিই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, কারণ সেখানে ঐ জমিগুলি কাজে লাগাবার মতো যথেষ্ট লোকসংখ্যা নেই। প্রকৃতির অঢেল ঐশ্বর্যকে কাজে লাগাতে হলে সেখানে কোটি কোটি মানুষের বসতি চাই। যেমন দেখা যায় দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকায় শত শত বর্গমাইল* জমি রয়েছে। ক্যারে (CAREY) হিসাব করে বলেছেন যে শুধু-মাত্র অরিনকো (ORINOCO) উপত্যকাতেই, যার দৈর্ঘ্য হল ৩৬০ মাইল, এত ফসল উৎপাদন করা যেতে পারে যাতে বর্তমানের সারা বিশ্বের মানুষেরই চলে যায়। আর ফেলে ছেড়ে অন্যত্র পৃথিবীর অর্ধেক লোকের যে চলে যায়ই সে বিষয়ে তো কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। একমাত্র দক্ষিণ আমেরিকাই নিশ্চিতভাবেই বর্তমানে সারা বিশ্বে যত লোকসংখ্যা ছড়ানো রয়েছে তার অনেক গুণ বেশি লোককে খাওয়াতে পারে। সমপরিমাণ জমিতেই যদি কলা আর গম রোপন করা যায়, তবে তার তুলনামূলক পুষ্টি সাধক গুণ হবে ১৩৩ : ১। আর আমাদের ভাল জমিতে গমের উৎপাদন হয় বিশ গুণ,** চাল ৮০ থেকে

* এক বর্গমাইল = ৭·৪২ কিলোমিটার।

** আমাদের নিজেদের দেশে ফসলের উৎপাদন কি পরিমাণে বাড়ানো যায় তা 'লিবিগ' (Liebig) এর নিম্নলিখিত চিঠি থেকে বোঝা যায়। ১৮৫৮ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বরের 'দি ড্রেসডেন জারনাল' (The Dresden Journal) লিখেছে : "আমরা জানতে পারলাম যে আইবেনষ্টকের (Eibontock) বনবিভাগের পর্যবেক্ষক থিয়ার্স (Thiersch) বহু বৎসর ধরে শীতকালীন শস্য হেমন্তক সে লাগাবার পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টায় সফল হয়ে এসেছেন। তিনি অক্টোবরের মাঝামাঝি একশত বর্গগজ ব্যাপী ক্ষেত্রের ৫৪ লিটার শস্যবীজের চারা-গুলিকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। তার ফলে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়েছিল। কোনো কোনো চারাগাছে ৫২টি পর্যন্ত শিস বেরিয়েছিল যার মধ্যে একশতটি শস্যকণাও পর্যন্ত জন্মেছিল।" লিবিগ (Liebig) এই সংবাদ সত্য বলে দাবী করেছে এবং বলেছে যে যে-সব দেশে কাজ করবার লোক অনেক আছে ও জমি উর্বর সে সব দেশে এই পদ্ধতিতে অনেক সুফল পাওয়া

১০০ গুণ, ভুট্টা ২৫০ থেকে ৩০০ গুণ এবং কোনো কোনো জেলায়, যেমন ফিলিপাইনে, চাল উৎপাদন করার ক্ষমতা রয়েছে ৪০০ গুণ বেশি। এই সব খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করার পর সেগুলিকে সংরক্ষণ করা ও তার পুষ্টিকর উপাদানকে রক্ষা করা প্রয়োজন। পুষ্টিকর উপাদানের বিষয়ে রাসায়নিক বিদ্যা প্রভৃত সাহায্য করতে পারে। যেমন, লিবিগ (Liebig) প্রমাণ করেছেন যে খড়ির জল দিয়ে সেঁকলে রুটি পুষ্টিকর হয়।

মধ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকা, বিশেষতঃ ব্রাজিলের—যে ব্রাজিলই হল প্রায় সমগ্র ইউরোপের সমান, (ব্রাজিলের সীমানা হল ১৫২,০০০ বর্গ মাইল, জনসংখ্যা ১১,০০০,০০০ আর ইউরোপের সীমানা হল ১৭৮,০০০ বর্গ মাইল ও জনসংখ্যা ৩১০,০০০,০০০) জমি এত উর্বর ঐশ্বর্যে ভরা যে ভ্রমণকারীরা দেখে বিস্মিত হয়ে যায়। আর এই সব দেশে যে কত খনিজ পদার্থ ও ধাতবদ্রব্যের সন্ধান রয়েছে তা এখনো জানা যায়নি। কিন্তু প্রকৃতির এই সব বিরাট সম্পদ এখনো দুনিয়ার মানুষের নাগালের বাইরেই রয়ে গেছে। এর কারণ একে তো সেখানকার জনসংখ্যা কম, তারপর রয়েছে এ সব কাজে আলস্য, উদাসীনতা পশ্চাৎপদতা। আফ্রিকার অভ্যন্তরীণ অবস্থাও বিগত কয়েক বৎসরের আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে দেখা গিয়েছে। আর এশিয়াতে বিরাট বিরাট উর্বর দেশ রয়েছে যেখানে আরো কোটি কোটি মানুষ বাস করতে পারে। শুধু তাই নয়, আমরা অতীতের অবস্থা থেকে জানতে পারি যে সেখানে বহু বিস্তৃত অঞ্চল প্রায় মরুভূমির মতো অজন্মা হয়ে পড়ে আছে। মানুষ যদি সে সব জায়গায় ভাল জলসেচের ব্যবস্থা করতে পারে, তবে সেখানকার আবহাওয়ায় প্রচুর পরিমাণে চমৎকার ফসল উৎপাদন হতে পারে। সে সব জায়গায় সর্বনাশা যুদ্ধের আক্রমণে জনসংখ্যা ধ্বংস হয়ে গেছে, বিজিত গোষ্ঠী অমানুষিক অত্যাচার চালিয়েছে, ফলে জলাশয় নালা, সেচব্যবস্থা সব নষ্ট হয়ে গেছে। কোটি কোটি সুসভ্য মানুষ আবার সে সব জায়গায় অফুরন্ত সম্পদের উৎস খুঁজে বের করতে পারবে। খেজুর ও তালগাছে প্রচুর ফল হয়। আর এই গাছগুলি খুবই কম জায়গা নেয়। মাত্র ৩৯১৭ হেক্টর জমিতে ২০০ গাছ হতে পারে। মিশর দেশে ফসল হয়ে থাকে প্রচুর, কিন্তু তবু সে দেশের মানুষ গরিব, অনাহারে থাকে। এর কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি নয়, কারণ হল ধ্বংসাত্মক শোষণকারী ব্যবস্থা। তার ফলেই দিনে দিনে শস্যক্ষেত্রও মরুভূমিতে পরিণত হচ্ছে। মধ্য ইউরোপের মতো কৃষি ও উদ্যান ব্যবস্থার উন্নতি করতে পারলে এ সব দেশে

যেতে পারে। সুতরাং আমাদের হাতে কাজের জন্য মানুষ দাও, জমির সার দাও এবং আমাদের পুঁজিবাদী শোষণ থেকে মুক্ত করে দাও, আর আমরা তাহলে এমনভাবে সোনা ফলিয়ে দেব যা কিনা এখন গালগল্প বলে মনে হতে পারে।

যে কি বিপুল ঐশ্বর্য উৎপাদন করা যাবে তা এখন থেকে ধারণা করাই অসম্ভব।

বর্তমানের কৃষি উৎপাদনের অবস্থার হিসাব অনুযায়ী উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র অনায়াসেই তার বিশগুণ জনসংখ্যা রাখতে পারত, অর্থাৎ ৫০,০০০,০০০ মানুষের বদলে ১,০০০,০০০,০০০ মানুষ রাখতে পারত। ক্যানাডাও সাড়ে চার মিলিয়ন মানুষের বদলে ৫০০;০০০,০০০ মানুষ রাখতে পারত। তাছাড়া রয়েছে অস্ট্রেলিয়া এবং প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরে বহু সংখ্যক বড় বড় উর্বর দ্বীপ। জনসংখ্যা হ্রাসের প্রয়োজন নেই, বৃদ্ধি করা প্রয়োজন আছে—মানুষের সভ্যতা এই ইংগিতই দেয়।

যে দিকেই তাকাই আমরা দেখতে পাই যে মানুষের দুঃখ দুর্দশার মূলে রয়েছে উৎপাদন ও বন্টনের অব্যবস্থা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির নয়। এ কথা কে না জানে যে পর পর কয়েকবার ভাল ফলন হলেই খাদ্যদ্রব্যের দাম বেশ পড়ে যায়, আর তারই ফলে আবার আমাদের ক্ষুদ্র ও মাঝারি চাষীদের সর্বনাশ হয়ে থাকে। প্রচুর ফলনে চাষীদের অবস্থা ভাল হবার বদলে আরো খারাপ হয়। আর এই অবস্থাটাকেই যুক্তিযুক্ত বলে ধরে নেওয়া হয়। শস্যের ফাটকা ব্যাপারীরা অনেক সময় অধিক ফলন হলে তা গুদামজাত করে পচাতে থাকে। কারণ তারা জানে যে বাজারে আমদানি কম হলেই তার দাম বেড়ে যাবে। আর এই পরিস্থিতিতে আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ভয় দেখানো হয়। রাশিয়া ও দক্ষিণ ইউরোপে উপযুক্ত গুদামঘর ও যানবাহনের অভাবের ফলে প্রতি বছর বহু সহস্র মণ খাদ্যশস্য বিশ্রীভাবে নষ্ট হয়ে যায়। শস্য কাটার সুব্যবস্থার অভাবে বা ঠিক সময়ে প্রয়োজনমত মজুর না পাবার জন্য ইউরোপে বহু লক্ষ লক্ষ মণ খাদ্যশস্য প্রতি বছর ফেলা যায়। বহু খাদ্যশস্যের গুদামঘর, গোলাঘর বা সমগ্র শস্যক্ষেতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় কারণ তাতে মালিকরা ইনসিওরের টাকায় মুনাফা লাভ করতে পারে, ঠিক যেমন জাহাজের মালিকরাও সমুদ্রের জলে ইচ্ছা করে নাবিকদের সহ জাহাজ ডুবিয়ে ফেলে ইনসিওরের টাকায় মুনাফা লুটে থাকে। সেনাবাহিনীর অভিযানের জন্যও প্রতি বছর আমাদের বহু শস্য ধ্বংস হয়ে থাকে। ১৮৬৬ সালে লিপজিগ ও কেমনিজ (Leipzig and Chemnitz) এর বিবাদের সময় কয়েকদিনের মধ্যেই অন্তত ৩০০,০০০ মার্ক মূল্যের (১৫,০০০ পাউন্ড) শস্যকণা সৈন্যদের পায়ের নিচে পিষে নষ্ট হয়ে গেছে। প্রতি বছরই এ রকম শস্যহানি হয়ে থাকে, আবার তার জন্য অনেক অঞ্চলের বিস্তীর্ণ ক্ষেতে চাষ করাও বন্ধ থাকে।*

* বহু পূর্বে সেন্ট বেসিলের (St. Basil) এর সময় থেকেই নিশ্চয়ই এরকম অবস্থা ছিল। কারণ তিনি ধনীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন : "হতভাগার দল ! তোমরা সর্বশক্তিমান বিচারকের

অবশেষে আমাদের মনে রাখতে হবে যে খাদ্যশস্যের উৎপাদনের ব্যাপারে সমুদ্রের অবদানের সম্ভাবনাকে যোগ করতে হবে। সমুদ্র পৃষ্ঠের আয়তন পৃথিবীর আয়তনের অনুপাতে ১৮ ঃ ৭, অথবা পৃথিবীর আড়াইগুণ বেশি। এই সমুদ্রের থেকে মানুষের পুষ্টির জন্য যে কত বিপুল পরিমাণ খাদ্যসামগ্রী পাওয়া যেতে পারে তা এখনো অজানা রয়ে গেছে। ভবিষ্যতের এই উজ্জ্বল সম্ভাবনার কাছে ম্যালথাসের দেওয়া অন্ধকার চিত্র কোথায় তলিয়ে যায়।

রসায়নে আমাদের যে কতদূর উন্নতি হতে পারে তা আগে থেকে কে অনুমান করবে? কেবা আগে থেকে ধারণা করতে পারে ভবিষ্যতে মানুষ কি বিশাল কর্মযজ্ঞ হাতে নিতে পারে আর দেশের আবহাওয়ার কত প্রভাব ফেলতে পারে আর প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগানোর ব্যাপারেই বা কতদূর অগ্রসর হতে পারে?

ইতিমধ্যেই আমরা দেখতে পাই যে ধনতান্ত্রিক সমাজই যে সব কাজ করে ফেলেছে তা পঞ্চাশ বছর আগেও ছিল অভাবনীয়। সমুদ্রের সংগে সমুদ্রের যোগ সাধন করেছে, সুড়ংগ পথ তৈরি করেছে। ভূগর্ভের ভিতরে মাইলের পর মাইল পথ তৈরি করে উচ্চতম পর্বতের নিচে দিয়ে বিভিন্ন দেশের মধ্যে যোগ স্থাপন করতে পেরেছে। সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে পথ তৈরি করেছে। এইভাবে বিভিন্ন দেশের মধ্যে যোগ স্থাপন করেছে এবং তাদের মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে দিয়েছে। আর সাহারা মরুভূমির একাংশের মধ্য দিয়ে সমুদ্র বইয়ে দেবার কথাও হয়েছে, যার ফলে বিশাল মরুভূমির হাজার হাজার বর্গমাইল সুজলা সুফলা ক্ষেত্রে পরিণত হতে পারবে। এর সব পরিকল্পনাই বুর্জোয়া জগতের এবং মুনাফার জন্যই। তাহলে কে বলতে পারে যে, ভবিষ্যতে উন্নতির গতি কোথায় এসে থামবে?

সুতরাং এই অবস্থায় আমরা 'ল অব ডিমিনিশিং রিটার্ন'কে শুধু অস্বীকারই করব না, বরং দেখব যে আমাদের রয়েছে অপরিমিত চাষের যোগ্য জমি, লক্ষ লক্ষ মানুষের পরিশ্রমে যেখানে সোনা ফলবে।

যদি মানব সভ্যতার সব লক্ষ্যকে পূরণ করতে হয়, তবে আমরা দেখব যে তার জন্য প্রয়োজনীয় জনসংখ্যা বরং কমই আছে। সেই সব লক্ষ্য পূরণ করতে

কাছে কি কৈফিয়ৎ দেবে? তোমরা তোমাদের উলঙ্গ দেওয়ালকে কার্পেট দিয়ে ঢেকে থাক, কিন্তু উলঙ্গ মানুষগুলোর জন্য আচ্ছাদন দিতে পার না। তোমরা তোমাদের বাড়িঘর সাজাবার জন্য বহু টাকা খরচ করে থাক, কিন্তু তোমাদের ছিন্নবস্ত্র পরিহিত ভাইদের ঘৃণা কর। তোমরা গুদাম ঘরে খাদ্যদ্রব্য পচে নষ্ট হয়ে যেতে দেবে, তবুও ক্ষুধার্ত মানুষগুলোর দিকে তাকাবে না"। শাসকদের প্রতি নৈতিক পরামর্শ দিয়ে কোনোদিনই কোনো ফল হয়নি, হবেও না। মানুষের মঙ্গল করতে হলে, সমস্ত ব্যবস্থাটাকেই এমনভাবে বদলাতে হবে যে কারোরই তার প্রতিবেশীর প্রতি অবিচার করার অধিকার না থাকে।

হলে মানুষ্য সংখ্যা আরো কয়েকগুণ বৃদ্ধি পাওয়া দরকার। বর্তমানে শুধু যে চাষের জমিগুলি ঠিকমত কাজে লাগানো হচ্ছে না তাই নয়, কাজ করার লোকের অভাবে পৃথিবীর তিন চতুর্থাংশ ভূমি অনাবাদী পড়ে আছে। বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজে তুলনামূলক ভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির যে সমস্যা দেখা দিয়েছে, তার ফল শ্রমজীবী মানুষদেরই ভুগতে হচ্ছে। উন্নত সভ্য সমাজ ব্যবস্থায় তার বিপরীতটাই দেখা যাবে, এটাও একটা ভবিষ্যৎ উন্নতির সোপান। ঠিক যেমন দ্রব্যসামগ্রীর অতি-উৎপাদন, জমির অবনতি, বুর্জোয়া বিবাহবিচ্ছেদ, কারখানায় নারী ও শিশু-শ্রমের শোষণ, ক্ষুদ্র শিল্পের ও ক্ষুদ্র চাষীদের ধ্বংস ইত্যাদির মধ্য দিয়েও মানব সমাজের অগ্রগতির লক্ষণ দেখা যায়।

কাউটস্কি বলেছেন যে, মানুষ যদি স্বচ্ছন্দ পরিবেশে সুখী জীবন যাপন করতে পারে তাহলে আর তারা নতুন নতুন ভূখন্ড খুঁজে বেড়াবার ঝুঁকি নিতে যাবে না। এর থেকেই বোঝা যায় যে মনুষ্য চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর ধারণা সঠিক ছিল না। কারণ, এ পর্যন্ত কোনো দুঃসাহসিক কাজের জন্যই সমর্থকের অভাব হয়নি। মানুষের স্বভাবের মধ্যেই আছে নতুন নতুন শৌর্য-বীর্যের কাজের মধ্য দিয়ে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যাওয়া। তার দ্বারা প্রথমতঃ সে নিজের আত্মতৃপ্তি লাভ করে, দ্বিতীয়তঃ সে অন্যদের ছাড়িয়ে যেতে চায়, অর্থাৎ তার উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করতে চায়। কোনো যুদ্ধের সময়ই কখনো স্বেচ্ছাসেবকের অভাব হয়নি, আর উত্তর ও দক্ষিণ মেরু অথবা আফ্রিকার অভ্যন্তর প্রভৃতি স্থলে বিপজ্জনক অভিযানের জন্য সমস্ত স্তরের ও সমস্ত শ্রেণীর মানুষই এগিয়ে এসেছে। মধ্য আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, ভারত, মধ্য এশিয়া প্রভৃতি দেশের উন্নতিকল্পে যে বিশাল কর্মযজ্ঞের প্রয়োজন তা কোনো ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা করা সম্ভব নয়। তার জন্য প্রয়োজন অত্যন্ত সুযোগ্য ও সুপরিচিত জনগণের ব্যাপকভাবে সেই কর্মযজ্ঞে অংশ গ্রহণ করা। প্রয়োজন হলে তার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষের সহযোগিতা পাওয়া যাবে, আর বিপদের সম্ভাবনাও কম আসবে।

এখন এ সমস্যার পরবর্তী প্রশ্নে আসা যাক। মানুষ কি অবিরত জনসংখ্যা বাড়িয়েই চলতে পারে? আর তাহলে তার বিপদটাই বা কোথায়?

মানুষের অত্যধিক প্রজনন ক্ষমতা প্রমাণ করবার জন্য ম্যালথাসপন্থীরা বিশেষ বিশেষ পরিবার ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির উদাহরণ তুলে ধরে। তার থেকে কিছুই প্রমাণিত হয় না। তার উল্টো উদাহরণ দিয়েও দেখানো যায় যে জীবন ধারণের পরিস্থিতি অনুকূল হলে আবার অনেক ক্ষেত্রে মানুষের একেবারেই সন্তান হচ্ছে না, বা খুব কম সংখ্যক সন্তানই হচ্ছে। অনেক সময় দেখে বিস্মিত হয়ে যেতে হয় যে অনেক ধনী পরিবার দ্রুত শেষ হয়ে যায়। যুক্ত-

রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যদিও সেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পক্ষে অবস্থা অন্যান্য অনেক জায়গা থেকে ভাল, আর সেখানে প্রতি বৎসর হাজার হাজার মানুষ অন্য দেশ থেকে এসে বসতি করে থাকে, তবুও সেখানে গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে জনসংখ্যা মাত্র দ্বিগুণ হয়েছে, বার বৎসর বা বিশ বৎসরের মধ্যে যে নির্দিষ্ট পরিবর্তনের কথা বলা হয়ে থাকে, তা কোথাও তেমন দেখা যায় না।

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে এবং মার্কস ও ভিরচভ (VIRCHOW)-ও বলেছেন যে, দরিদ্র অঞ্চলেই জনসংখ্যা অধিক বৃদ্ধি হতে দেখা যায়। তার কারণস্বরূপ ভিরচভ জোর দিয়েই বলেছেন যে সেখানকার দরিদ্র জনগণের মধ্যে মদ্যপান ও যৌন সম্ভোগই আনন্দ স্ফূর্তির প্রধান উপায় হিসেবে দেখা যায়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে সপ্তম গ্রীগরি (GREGORY VII) যখন ধর্মযাজকদের উপর কৌমার্য বিধি আরোপ করেছিল, তখন সাধারণ ধর্মযাজকরা বলেছিল যে, স্ত্রী সংসর্গই তো তাদের প্রধান উপভোগ্য বিষয়, তা ছাড়া তারা কেমন করে থাকবে? জীবনে নানা বৈচিত্র্য না থাকার জন্যই বোধহয় গ্রামাঞ্চলের ধর্মযাজকদের অধিক সংখ্যক সন্তান হয়ে থাকে।

সে যাই হোক না কেন, এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে জার্মানির দরিদ্র অঞ্চলগুলিতেই, যেমন মানুষের ঘনবসতি বেশি, আর তাদের প্রধান খাদ্য হল আলু। আবার দেখা গেছে যে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত রোগীদের যৌন সম্ভোগের ইচ্ছা প্রবল হয়ে থাকে এবং অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় মধ্যেও তাদের সন্তান হয়ে থাকে।

মনে হয় যেন এটা প্রকৃতিরই নিয়ম যে গড়পড়তায় গুণগত দিক থেকে যা ক্ষতি হয়, আবার পরিমাণগত দিক থেকে তা পুষিয়ে যায়। যেমন দেখা যায় যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী জন্তু, সিংহ, হাতী, উট, ইত্যাদি, আমাদের গৃহপালিত জন্তু, ঘোড়া, গরু—এদের সাধারণত খুব কম সংখ্যক বাচ্চা হয়ে থাকে। আর ছোট ছোট জীব জন্তুদের অনেক বাচ্চা হয়, যেমন সব রকমের পোকামাকড়, মাছ, স্তন্যপায়ী প্রাণী, খরগোস, ইঁদুর, প্রভৃতির বহুসংখ্যক বাচ্চা হয়ে থাকে।

আবার ডারউইন প্রমাণ করেছেন যে কোনো কোনো বন্য জন্তুকে, যেমন হাতীকে, তাদের বন্য জীবনের অবস্থা থেকে গৃহপালিত সুশৃংখল জীবনের অবস্থায় নিয়ে এলে তাদের প্রজনন শক্তি কমে যায়। এর থেকে মনে হয় যে জীবনধারণের পদ্ধতির সংগে প্রজনন শক্তির বৃদ্ধি বা হ্রাস হয়ে থাকে।

কিন্তু আবার এ-কথাও ঠিক যে ডারউইনপন্থীরাই জনসংখ্যার অতিবৃদ্ধির ভয় করে থাকে এবং ম্যালথাসপন্থীরাও তাদের কথা মানে। কিন্তু আগেই বলেছি যে ডারউইনপন্থীরা তাদের পরীক্ষামূলক তত্ত্বকে মানুষের বেলায়

প্রয়োগের সময় ভুল করে। যে সব নিয়ম নিম্নস্তরের জীবজন্তুর বেলায় প্রযোজ্য তারা মানুষের বেলায়ও তার হুবহু প্রয়োগ করতে যায়। তারা একথা মনেই রাখে না যে মানুষ হল সবচেয়ে উচ্চস্তরের জীব। প্রকৃতির নিয়মগুলি একবার জানতে পারলে সেগুলিকে তারা নিয়ন্ত্রিত করতে পারে, কাজে লাগাতে পারে।

বলদ বা বানরদের সংগে মানুষের হুবহু তুলনা করা যায় না। মানুষের বুদ্ধি আছে, সে মাথা খাটিয়ে প্রকৃতি, জলবায়ু ভূমি নিজেদের কাজে লাগাতে পারে। সুতরাং জীবন ধারণের জন্য সংগ্রামের যে তত্ত্ব, প্রজনন শক্তি যত বেশি থাকবে, উন্নতিও তত কম হবে—এসব তত্ত্ব মানুষের বেলায় ততো খাটে না। কথার কথা হিসাবে যদিও বলা যায় যে কেবলমাত্র মানুষ আর বানরের বেলাতেই দেখা যায় যে অন্যান্য সমস্ত জীবদের মতো কোন প্রবৃত্তি কোনো নির্দিষ্ট সময়েই দেখা যায় না, তার থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে মানুষের সংগে বানরের খুব ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। কিন্তু তারা এক নয়, আর মানুষ আর বানরের বিচারও একই মাপকাঠি দ্বারা করা যায় না। এই কথাটাই ডারউইনপন্থীরা বঝতে পারে না। কারণ তারা প্রাণীতত্ত্ব, নৃ-তত্ত্ব জানে, কিন্তু সমাজতত্ত্ব জানে না, উপরন্তু তারা সমাজতত্ত্ব বিষয়ে বুর্জোয়াদের মতবাদই মেনে নেয়। তার থেকেই তারা ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছয়।

আমরা মেনে নিয়েছি যে মানুষের মধ্যে যৌন প্রবৃত্তি স্থায়ীভাবেই আছে, সে প্রবৃত্তি সবচেয়ে প্রবল এবং শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর না হলে সে প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তিরও প্রয়োজন। আর মানুষ সুস্থ সবল স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠলে তার যৌন প্রবৃত্তিও প্রবল হবে, যেমন ভাল ক্ষিদে ও হজম শক্তিও মানুষের সুস্বাস্থ্যেরই লক্ষণ।

কিন্তু যৌন প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি মানেই সন্তানের জন্ম দেওয়া নয়। জনসংখ্যার অত্যধিক বৃদ্ধির ব্যাপারে এ বিষয়টা বোঝা দরকার। পুরুষের প্রজনন বৃদ্ধির বিষয়ে ও নারীর সন্তান সম্ভাবনা হবার বিষয়ে অনেক রকম তত্ত্বই শোনা যায়। সব চেয়ে বড় কথা হল এই যে মানুষের জন্মের ও বিকাশের মূলে যে কোন সূত্রের প্রাধান্য কাজ করে আসছে, কিভাবেই বা মনুষ্য জাতি বেড়ে চলেছে সে বিষয়ে বিগত দুই সহস্র বৎসর ধরে আমাদের কোনো বৈজ্ঞানিক চিন্তা করা হয়নি। এখন এ ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন আসছে এবং এর থেকেই একটা আমূল পরিবর্তনের দিকে যেতে হবে।

একদিক থেকে বলা হয়ে থাকে যে মানুষের চিন্তা করার ক্ষমতা, বুদ্ধিবৃত্তি বাড়লে, অতিরিক্ত মাথার কাজ ও স্নায়বিক চাপ পড়ে এমন কাজ করতে থাকলে তার যৌন প্রবৃত্তি চাপা পড়ে যায়, আর প্রজনন ক্ষমতাও কমে আসে।

আবার অপর দিক থেকে একথা অস্বীকার করা হয়। প্রথমোক্ত প্রবক্তারা উদাহরণ দিয়ে বলে থাকেন যে শ্রমজীবী মানুষের চেয়ে ধনী শ্রেণীর মানুষদের সন্তান সংখ্যা গড়পড়তায় কম হয়ে থাকে, আর এজন্য যে তারা সব সময়ই জন্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নিয়ে থাকে তা নয়। এটা ঠিকই যে অতিরিক্ত মাথার কাজ করলে যৌন প্রবৃত্তির উপর তার প্রভাব পড়ে এবং যৌন প্রবৃত্তির প্রাবল্য কমে আসে। কিন্তু ধনীদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষই কি সেই রকম মাথার কাজ করে থাকে? আবার অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম করলেও তো যৌন প্রবৃত্তি হ্রাস পেয়ে যেতে থাকে। শারীরিক বা মানসিক কোনো ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত কাজ করলে ক্ষতি হয় এবং তা না করাই উচিত।

অন্যেরা বলে থাকে যে নারীরা কি ভাবে জীবন যাপন করে, কী ধরনের খাদ্য গ্রহণ করে, কী পরিস্থিতির মধ্যে থাকে তার উপরই নির্ভর করে প্রজনন শক্তি ও তার সন্তান সম্ভাবনা হওয়া। তাদের মতে অনেক জন্তুর ক্ষেত্রেও যেমন দেখা যায়, তেমনি নারীদের ক্ষেত্রেও খাদ্যের গুণাগুণের প্রভাব তাদের যৌন প্রবৃত্তির উপর পড়ে। হয়তো এটাই ঠিক কথা।

অনেক জীবজন্তুর বেলায় দেখা যায় যে বিভিন্ন পুষ্টিকর খাদ্যের প্রভাব তাদের উপর অদ্ভুতভাবে পড়ে থাকে। মৌমাছিদের বেলায় দেখা গেছে যে খাদ্যের পরিবর্তন করে তারা ইচ্ছামত স্ত্রী-মৌমাছিদের জন্ম দিতে পারে। মনে হয় যেন এসব ব্যাপারে মৌমাছিরা মানুষের চেয়েও বেশি জানে। অন্ততঃ বিগত দুহাজার বৎসর ধরে তাদের মধ্যে প্রচার করা হয়নি যে যৌন বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানোটা একটা অভদ্র ও দুর্নীতির কাজ।

পুরাতন ব্যাভেরিয়ার জনৈক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি খাদ্যের প্রভাব যে মানুষের উপর কিভাবে পড়ে তার একটা উদাহরণ দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন যে সেখানে প্রায়ই দেখা যায় যে জার্মানীর সবচেয়ে বেশি হৃষ্ট-পুষ্ট ধনী চাষীদের সন্তান হয় না এবং তাদের মধ্যে অনেকে শেষ পর্যন্ত গরিব চাষীদের শিশুদের দত্তক গ্রহণ করে থাকে। তাদের সন্তান না হবার কারণ অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে তারা অতিরিক্ত চর্বি বহুল পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। তাদের খাদ্য প্রধানত প্রচুর শুকরের চর্বি দিয়ে তৈরি মাংস, ছানা ইত্যাদির পুডিং। ব্যাভেরিয়ার লোকেরা এই সব খাদ্য প্রস্তুত করার জন্য প্রসিদ্ধ। গাছপালার ক্ষেত্রেও এই ধরনের উদাহরণ দেখা যায়। যেমন অনেক গাছ ভাল জমিতে, ভাল সার পেয়ে, খুব চমৎকার ভাবে বেড়ে ওঠে, কিন্তু তার ফলও হয় না। ফুলও হয় না।

ব্যাভেরিয়ার মানুষদের ঘনিষ্ঠভাবে জানে এমন আর একজন আমাকে সেখানকার লোকের মধ্যে এই বন্ধ্যা অবস্থার আরো একটি কারণের কথা

বলেছেন। সে কারণটি হল এই যে সেখানে বিয়ের আগেই অল্প বয়সের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে যৌন সহবাস হতে থাকে। এটা ওখানে খুব সাধারণভাবেই চলে আসছে, আর কেউ তাকে নিন্দনীয়ও মনে করে না। অল্প বয়সের যৌন সংসর্গ নিঃসন্দেহে উত্তেজনাকর। আর ব্যাভেরিয়ায় যে প্রথা আছে তাতে তাদের যৌন সম্বন্ধ কোনো একটি ছেলে বা একটি মেয়ের সংগে সীমাবদ্ধ থাকে না। অনেকের সংগেই অনেকে বাছবিচারহীনভাবে যৌন সহবাস করে থাকে। এর দ্বারা তাদের সন্তান হবার সম্ভাবনা কমে যায়। পতিতা নারীদেরও যে সাধারণতঃ সন্তান হয় না,* তারও কারণ স্বরূপ বলা হয়ে থাকে যে তারা বহু ব্যক্তির সংগে যৌন সহবাস করে। এ ক্ষেত্রটা অবশ্য এখনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনেকটা অনুমানের স্তরেই রয়েছে।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে সাধারণতঃ যারা যেমন খাদ্য গ্রহণ করে থাকে তার প্রভাব পুরুষ ও নারীর প্রজনন ক্ষমতার উপর পড়ে। সুতরাং এটাও অসম্ভব নয় যে **মানুষ কোন ধরনের পুষ্টিকর খাদ্য খায় তার উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধিও নির্ভর করে।** এটা যদি সঠিক প্রমাণ করতে হয় তবে মানুষ সেই অনুযায়ী খাদ্য ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে জনসংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্রাসের বিষয়টিও নিয়ন্ত্রিত করতে পারত। তারপর আবার, সময় বিশেষে নারীদের সন্তান সম্ভাবনাও থাকে না। বোধহয় নারীদের মাসিক হবার কয়েকদিন আগে ও পরেই অন্তঃস্বত্তা হবার সম্ভাবনা থাকে।** অবশেষে আমাদের এ কথাও মনে রাখতে হবে যে ভবিষ্যতে সমাজে নারীদের অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে যাবে। তখন আর তারা "ঈশ্বরের দান" বলে বহু সংখ্যক সন্তানের জন্ম দিতে চাইবে না। তারাও চাইবে তাদের মুক্ত স্বাধীন জীবন উপভোগ করতে। তখন আর নারীরা চাইবে না তাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ বছরগুলির অর্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ অন্তঃস্বত্তা অবস্থায় বা বাচ্চা কোলে নিয়ে কাটাতে। অবশ্য এমন নারীর সংখ্যা খুব কমই যারা সন্তান চায় না, কিন্তু বহু সংখ্যক সন্তান চায় এমন নারীর সংখ্যা তার চেয়েও কম। এই সব রকম কারণই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ করবে, তার জন্য আমাদের ম্যালথাসপন্থীদের এখন মাথা ঘামিয়ে কাজ নেই।

সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে ভবিষ্যতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হবে ঠিকই, তবে তা অনাহারের ভয়ে নয়, মানুষের ভালর জন্যই হবে। কার্লমার্কস তাঁর 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থে ঠিকই বলেছেন যে মানুষের অগ্রগতির পথে অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতিটি স্তরেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি বিশেষ নিয়ম থাকে।

---

* এই বাধাগুলির প্রধান কারণ হল অবাধ যৌন সংসর্গ।

** সাম্প্রতিক অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে নারীদের মাসিক হবার অন্তবর্তী যে কোনো সময়ও গর্ভ সঞ্চার হতে পারে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় যখন সর্বপ্রথম মানুষ মুক্ত স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে বাস করতে পারবে, তখন তারা প্রকৃতির নিয়ম অনুসারেই সচেতনভাবে তাদের সমস্ত পথই নির্দিষ্ট করতে পারবে।

ইতিপূর্বে কখনই মানুষ সচেতনভাবে অগ্রসর হতে পারেনি। উৎপাদন এবং বন্টনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সমস্ত নিয়মকানুন সম্বন্ধে তাদের জ্ঞানের অভাব ছিল এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির নিয়মকানুন সম্বন্ধে তারা কিছু জানত না। নতুন সমাজে মানুষ সব নিয়মকানুন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে সচেতনভাবে এবং সুশৃংখলভাবে অগ্রসর হবে।

সমাজতন্ত্র একটি বিজ্ঞান। সেই বিজ্ঞানকে জেনে বুঝে মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে।

উপসংহার

পূর্বোক্ত আলোচনার মধ্যে দেখা গেল যে সমাজতন্ত্র মানেই যথেচ্ছ ধ্বংস করা ও পুনর্গঠন করা নয়। প্রগতির স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবেই সমাজতন্ত্র আসে। যে সব জিনিস ধ্বংস হয়ে যায় আর যে সব জিনিস নতুন করে গড়ে ওঠে তা তার নিজের স্বাভাবিক পরিণতিরই ফল। কোনো "প্রতিভাধর রাষ্ট্র-নায়ক" বা কোনো "আলোড়ন সৃষ্টিকারী" জন নেতাই তার ইচ্ছামত ঘটনার গতি নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন না। তারা মনে করেন যে তারাই ঘটনার গতি নিয়ন্ত্রিত করছেন, অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেরাই ঘটনার গতির সঙ্গে সঙ্গে চলেছেন। যে সব কথার আলোচনা করা হল তার থেকে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিরই এ বিষয়ে সন্দেহ থাকবে না যে অবশেষে আমরা একটা "সময়ের পরিপূর্ণতার" দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছি।

এখানে এই সমাজ প্রগতির পথে জার্মানির ভূমিকাটাও একটু উল্লেখ করা দরকার। এটা দেখানো দরকার যে অন্যান্য দেশের থেকে জার্মানিকেই পরবর্তী প্রগতির পথে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করতে হবে।

এই পুস্তকে অতিরিক্ত উৎপাদনের হেতু, অতিরিক্ত মজুত জমে যাবার কথা কয়েকবারই উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে যে, বুর্জোয়া পদ্ধতির জন্যই অতিরিক্ত উৎপাদন হয়ে থাকে। বুর্জোয়া পদ্ধতির ফলে মানুষের ক্রয় ক্ষমতার চেয়ে, অর্থাৎ বাজারে যতটা বিক্রয় হওয়া সম্ভব৷ তার চেয়ে বেশি পণ্য সামগ্রী উৎপন্ন করা হয়ে থাকে। এটা বুর্জোয়া জগতেরই বৈশিষ্ট্য, এবং দেখা গেছে যে মনুষ্য সমাজের ইতিহাসে আর কোনো স্তরেই এ জিনিস হয়নি। বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থায় পণ্য দ্রব্যেরও যেমন প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত উৎপাদন হয়, মানুষের বেলায়, বুদ্ধিশুদ্ধির বেলায়ও তেমনি হয়ে থাকে। যার ফলে বুর্জোয়া সমাজই অবশেষে ধ্বংস হয়ে যায়।

জার্মানিতে ঠিক তেমনিই মানুষের বুদ্ধি ও সভ্যতা সৃষ্টি এমনই বেড়ে গেছে যা নিয়ে বুর্জোয়া সমাজ হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। জার্মানির উন্নতির পথে বহুকাল ধরে একটা বিশেষ বাধা চলে আসছে। সেটা হল এই যে সেখানে অনেকগুলি ছোট ছোট প্রদেশ রয়েছে, যার ফলে দেশের ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। অনেকগুলি ছোট ছোট প্রদেশ থাকার দরুন মানুষের চিন্তাধারার মধ্যে কোনো সমন্বয় গড়ে উঠতে পারে না। অনেকগুলি ছোট

ছোট কেন্দ্র গড়ে ওঠে এবং চারদিকে তার প্রভাব পড়ে। অনেকগুলি আদালত এবং অনেকগুলি সরকার চালাবার জন্য আবার বহুসংখ্যক যোগ্যতাসম্পন্ন কর্ম-চারীর প্রয়োজন হয়। সেজন্য এখানে ইউরোপের অন্যান্য দেশের চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক বিদ্যায়তন ও বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন সরকারগুলির মধ্যে পরস্পরের ভেতর আবার ঈর্ষা ও প্রতিযোগিতাও রয়েছে। সেই একই জিনিস বারবার দেখা গেছে। যখন কোনো কোনো সরকার বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রবর্তন করতে চেষ্টা করেছে তখন এক্ষেত্রে কোনো প্রতিবেশী প্রদেশ থেকে কেউ যাতে পেছিয়ে না পড়ে সে ইচ্ছাটার একটা ভাল দিকও আছে। বুর্জোয়া সমাজের বস্তুগত দিকটার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রসার হয়ে থাকে এবং মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশেরও প্রয়োজন দেখা দেয়। তার থেকেই এসে পড়ে রাজনৈতিক অধিকার, জাতীয় প্রতিনিধিত্ব ও আঞ্চলিক প্রশাসনের কথা। ছোট ছোট দেশ ও গন্ডির মধ্যে কয়েক জন শিক্ষিত লোক মিলে গোষ্ঠী তৈরি করে। কিন্তু তারা জনগণকে শিক্ষিত করে তুলতে সাহায্য করে এবং বুর্জোয়া সমাজের তরুণদের উদ্বুদ্ধ করে উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষা লাভ করে তাদের মধ্যে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য।

সাধারণ শিক্ষাদীক্ষার মতো কলাবিদ্যার ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। ইউরোপের অন্য কোনো দেশেই জার্মানির মতো এত চিত্রকলার বিদ্যালয়, সব রকমের কারিগরী বিদ্যালয়, যাদুঘর এবং শিল্পকলার সংগ্রহ নেই। অন্যান্য দেশে হয়তো তাদের রাজধানীতে বৃহত্তর প্রতিষ্ঠান থাকতে পারে, কিন্তু বোধ হয় ইটালী ছাড়া আর কোথাও জার্মানির মতো সমগ্র সাম্রাজ্যব্যাপী এতগুলি প্রতিষ্ঠান ছড়ানো নেই।

জার্মানির বিকাশের এই ধারা সেখানে এক চিন্তার গভীরতা এনে দিয়েছে। আর সেখানে বড় বড় রাজনৈতিক সংগ্রাম না হবার দরুনও গভীর চিন্তাশীল ভাবধারা গড়ে উঠবার অবকাশ হয়েছে। যখন অন্যান্য দেশগুলি লিপ্ত ছিল দুনিয়ার বাজার দখল করতে, কে কাকে টেক্কা দিতে পারে, আর কি ভাবেই বা নিজেদের মধ্যে দুনিয়াটাকে ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিতে পারে তাই নিয়ে, আর নিজেদের দেশের মধ্যে নানা রকম রাজনৈতিক লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল, তখন নিজের দেশের মধ্যেই গভীর ধ্যানগম্ভীর অভিনিবেশে তন্ময় হয়েছিল জার্মানি। এই চিন্তাশীলতা অনুকূল পরিবেশের মধ্যে জীবনের যে গতিবেগ এনেছিল, তার থেকেই গড়ে উঠেছিল জার্মানির দর্শন, তার স্বচ্ছ দৃষ্টিকোণ ও বিশ্লেষণমূলক চিন্তাধারা। সেজন্যই দেখা যায় যে জার্মানি যখন জেগে উঠল তার তন্দ্রাচ্ছন্নতা থেকে, তখনই অন্যান্য দেশের থেকে তার বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠল।

১৮৪৮ সালেই প্রথম জার্মানির বুর্জোয়ারা নিজেদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে শ্রেণী সচেতন হয়ে ওঠে। এখন তারা একটি স্বাধীন রাজনৈতিক পার্টি হিসাবে দাঁড়িয়েছে এবং উদারনৈতিক মতবাদের প্রতিনিধিত্ব করছে। এখানে জার্মানির উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট দেখা যায়। যারা উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং তার আর্থিক বিষয়ের সঙ্গে জড়িত, এক্ষেত্রে কিন্তু তারা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেনি। অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে যারা অধ্যাপক, উদারপন্থী অভিজাত সম্প্রদায়, লেখক, আইনজীবী, নানা ধরনের চিকিৎসক, তাঁরা। তাঁরাই ছিলেন জার্মানির তাত্ত্বিক এবং এ কাজটা তাদেরই যোগ্য ছিল। রাজনৈতিক দিক থেকে বুর্জোয়ারা সাময়িকভাবে খানিকটা ধাক্কা খেয়েছিল, কিন্তু আবার অন্যত্র তাদের স্বার্থ গুছিয়ে নিয়েছিল। অস্ট্রো-ইটালিয়ান যুদ্ধ বাধার পর, প্রাশিয়ায় নতুন শাসন ব্যবস্থা কায়েম হবার পর বুর্জোয়ারা আবার তাদের ক্ষমতা বিস্তারের জন্য জেগে উঠল। ন্যাশনাল সোসাইটি (National Verein) আন্দোলন শুরু হল। তখন আর বুর্জোয়ারা তাদের অগ্রগতির পথের কোনো বাধা সহ্য করল না। অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক বাধা, যোগাযোগ বা যানবাহন ব্যবস্থার বাধা, কোন কিছু চাপই আর সহ্য করবার মতো তাদের অবস্থা ছিল না। তখন বুর্জোয়ারা একটা বৈপ্লবিক মূর্তি ধারণ করল। হের ভি বিসমার্ক (Herr V. Bismark) এই অবস্থাটা বুঝতে পেরে তার সুযোগ গ্রহণ করল। জনগণের বিপ্লবের ভয়ে বুর্জোয়াদের সঙ্গে রাজতন্ত্রের ঐক্য গড়ে তুলল, কারণ তাদের মধ্যে কোনো শত্রুতা ছিল না। বুর্জোয়াদের বৈষয়িক উন্নতির পথের সমস্ত বাধা চূর্ণ করে দেওয়া হল। জার্মানির ছিল কয়লা ও খনিজ পদার্থের বিপুল সম্ভার আর সেখানকার শ্রমিকশ্রেণীর বুদ্ধি ও মিতব্যয়িতা। তাই সেখানকার বুর্জোয়ারা বিশ বৎসরের মধ্যে প্রচন্ডভাবে বেড়ে উঠেছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে বুর্জোয়াদের এতখানি অগ্রগতির তুলনা যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া আর কোথাও মেলে না। তার ফলে শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সারা ইউরোপের মধ্যে জার্মানির স্থান হয়ে গেল দ্বিতীয় এবং জার্মানি প্রথম স্থান অধিকারের জন্য প্রচেষ্টা করছে।

কিন্তু বৈষয়িক দিকের এই প্রচন্ড উন্নতির আবার উল্টো দিকও আছে। সংযুক্ত জার্মানি প্রতিষ্ঠিত হবার সময় পর্যন্ত সেখানকার প্রায় সমস্ত রাজ্যেই যে অবরোধ প্রথা ছিল তার ফলে বহুসংখ্যক কারিগর, কৃষক সম্প্রদায়ের মানুষ জীবন ধারণের সংগ্রাম করে বাঁচতে পারছিল। যখন সমস্ত অবরোধ তুলে নেওয়া হল এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা ধর্মতন্ত্রের বল্গাহীন শোষণের মুখোমুখি এসে পড়ল তখন অতি দ্রুত তাদের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়ল, ১৮৭০-৭১ সালের যুদ্ধের পর হঠাৎ যে জোলুসটা আসে তার সামনে বিপদটা

অতবড় মনে হয়নি, কিন্তু সংকট ফেটে পড়লেই বোঝা গেল বিপদটা কত ভয়ংকর। ঐ উন্নতির সময়ে বুর্জোয়ারা প্রচন্ডভাবে বৈষয়িক উন্নতি করেছে, আর তার পরেই তার চাপটা বোঝা গেছে, বিশাল দ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন হয়ে গেছে আর ধনসম্পদ জমে গেছে। সম্পদ এবং দারিদ্রের মাঝখানের ব্যবধান দ্রুত বেড়ে গেছে।

এই পরিস্থিতির মধ্যে দিনে দিনে সমগ্র জনগণের দুরবস্থা তীব্র হয়ে উঠল। তাদের জীবন-জীবিকার অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্য আর রইল না। আর ক্রমশঃ যে তারা সমস্ত কিছু সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে চলেছে সে কথাও তারা স্পষ্ট বুঝতে পারল।

এই পরিস্থিতির মধ্যে যে যেমন করে পারল নিজেকে রক্ষা করার জন্য একটা পেশা থেকে আর একটা পেশার জন্য ছুটতে লাগল। কিন্তু বৃদ্ধরা তেমনি করে কর্মক্ষেত্র বদলাতে পারে না, আর তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য রেখে যাবার মতো নিজস্ব সম্পত্তি কারোই প্রায় নেই বললেই চলে। সুতরাং তারা প্রাণপণ চেষ্টা করে যাতে তাদের ছেলেমেয়েদের কোনো বাঁধা মাইনের চাকরি জোটে। কারণ তার জন্য কোনো পুঁজি লাগে না। সে সব চাকরি প্রধানত প্রশাসনিক কাজের, সমস্ত পর্যায়ের শিক্ষা ক্ষেত্রের কাজের, পোস্ট অফিস, রেলের চাকরি, অফিসে বুর্জোয়াদের স্বার্থে কাজের জন্য বড় বড় পদের, ডিপো-কারখানায় কাজের, ম্যানেজার ও টেকনিক্যাল ডাইরেকটর ইনজিনীয়ার ইত্যাদি পদের আর তারপর তথাকথিত উদারনৈতিক কাজের যেমন আইন ব্যবসা, ডাক্তারী, ধর্ম, সাহিত্য কলার বিভিন্ন বিভাগের, বাড়ি ঘর তৈরির কাজ ইত্যাদির।

হাজার হাজার মানুষ, যারা পূর্বে ব্যবসায় ঢুকেছিল, তারা দেখল যে ব্যবসা থেকে তাদের কোনই সুবিধা হচ্ছে না। তাদের স্বাধীনভাবে দাঁড়াবারও কোনো সম্ভাবনা নেই, আর নিজেদের প্রয়োজন মেটাবার জন্যও যথেষ্ট উপার্জন নেই। তারা তখন উপরোক্ত চাকরি-বাকরির কোনো একটার মধ্যে ঢুকে যেতে চেষ্টা করল। সকলেই পড়াশুনার দিকে ঝুঁকল। বিজ্ঞান, সাহিত্য, কারিগরী বিদ্যার বিদ্যালয়গুলি দেখতে দেখতে বেড়ে উঠল। আর পূর্বেই যে বিদ্যালয়-গুলি ছিল সেগুলিতে ভীড় বেড়ে গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা বেড়ে চলল।* বৈজ্ঞানিক ল্যাবরেটরিগুলিতে, ব্যবসা বাণিজ্য শিক্ষার স্কুলগুলিতে ছাত্র

* ১৮৭১-৭২ সালে জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৪,৬৭৬ জন ছাত্র পড়েছে, ১৮৭৫-৭৬ সালে ১৬,১৯১ জন পড়েছে, এবং ১৮৮১ সালেও ছাত্র সংখ্যা ২২,০৩৮ জনের কম ছিল না। এর থেকে দেখা যায় যে ১০ বছরে ছাত্র সংখ্যা শতকরা ৫০ ভাগ বেড়েছে, আর সেখানে একই সময়ের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ১০ ভাগ। প্রাশিয়ায় ১৮৫৯ সালে প্রতি ১০,০০০ জন অধিবাসীর মধ্যে ক্লাসিকাল স্কুলে ২০ জন পণ্ডিত ছিল, এবং বিজ্ঞান স্কুলে ছিল ৯ জন। ১৮৭৬ সালে ঐ একই জনসংখ্যার হিসাবে প্রথমোক্ত ব্যক্তির সংখ্যা ছিল ৩১ জন,

সংখ্যা বেড়ে চলল। সেই অনুপাতে বিভিন্ন অংশের মেয়েদের স্কুল কলেজ গুলিতেও ছাত্র সংখ্যা বেড়েই চলল। ইতিমধ্যে সব ক্ষেত্রেই ছাত্র সংখ্যার ভিড় জমেছিল, আর তার উপর এ সব দিকেই ক্রমশঃ চাপ বাড়তে লাগল, আর তাদের জন্য আরো বহু সংখ্যক সাধারণ বিদ্যালয়, শরীরচর্চার ক্ষেত্রের দাবিও বাড়তে লাগল। সরকারী বিভাগীয় কর্তাব্যক্তিরা এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিও মহা-মুশকিলে পড়ে গেল, আর বার বার ফতোয়া জারি করতে লাগল বিশেষ বিশেষ পেশার দিকে যাতে মানুষ না ঝোঁকে। এমন কি যেখানে পূর্বে ধর্মতত্ত্ব শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি ছাত্রের অভাবে প্রায় উঠে যাবার জোগাড় হয়েছিল, সেগুলিও ফুলে ফেঁপে উঠল।* চারিদিকে আওয়াজ উঠল: "ভরণপোষণের উপায় যদি পাওয়া যায় তবে হাজার হাজার দেবতা বা শয়তান সম্বন্ধেও বিশ্বাসের শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে"। প্রাশিয়ার মন্ত্রীরা উচ্চশ্রেণীর জন্য নূতন নূতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলবার অনুমতি দিতে আপত্তি করলেন, কারণ ইতিমধ্যেই প্রয়োজনের তুলনায় সর্বক্ষেত্রেই কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা অতিরিক্ত হয়ে পড়েছিল।

বুর্জোয়াদের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার জন্য এই অবস্থা আরো তীব্র হয়ে উঠল। তাদের মধ্যেও অনেক যুবক অন্যত্র কর্মসংস্থানের জন্য ছুটতে বাধ্য হল। আবার অনেকদিন পর্যন্ত যুদ্ধ বিগ্রহ না হওয়ার দরুন সেনাবাহিনীর মধ্য থেকেও বহুলোক বেশ কম বয়সেই অবসর গ্রহণ করে থাকে। তাদেরও সরকার বিভিন্ন কাজে নিয়োগ করে থাকে। তাতেও অন্য অনেকের কাজের সুযোগ নষ্ট হয়। তদুপরি বহু সরকারী কর্মচারীদের ছেলেমেয়েরা একই ধরনের পেশার জন্য শিক্ষিত হয়ে থাকে। কারণ তাদের মধ্যেই অভাব সবচেয়ে বেশি। অন্যদিকে আবার এই সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে তাদের সামাজিক পদ-মর্যাদা, শিক্ষাদীক্ষা, রুচিবোধ ইত্যাদির জন্য তারা সুযোগ পেলেও তথাকথিত 'নিচুস্তরের' কাজের জন্য যেতে পারে না—যদিও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সে সব ক্ষেত্রেও বেকারত্বের চাপ অত্যন্ত বেশিই থাকে।

"ওয়ান ইয়ার ভলান্টিয়ার্স" বলে যে কমিটি রয়েছে তাতে কোনো একটা বিশেষ স্তর পর্যন্ত শিক্ষা নেওয়া থাকলেই সেনাবাহিনী থেকে এক থেকে তিন বৎসর পর্যন্ত কাজের মেয়াদ ইচ্ছা করলে কমতে পারে, আর তার বদলে তাদের দেওয়া হয় নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা। এর দরুন নতুন করে চাকরি প্রার্থীর ভিড় আরও বেড়ে যায়। বিশেষ করে ধনী চাষীদের ছেলেদের ক্ষেত্রে এ জিনিস দেখা

এবং শেষোক্ত ব্যক্তির সংখ্যা ছিল ২২ জন, অর্থাৎ তাদের সংখ্যাও শতকরা ৫০ জন বেড়েছিল।

* ১৮৬৩-৬৪ সালে ১৮টি জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি ১০০০ জন ছাত্রের মধ্যে ২৩৬ জন ছিল প্রটেস্টান্ট ধর্মবিশ্বাসী; ১৮৭০-৭১ সালে ছিল ১৭৯ জন; ১৮৭৬-৭৭ সালে ১০৯ জন। তারপর এই সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ১৮৮১ সালে দাঁড়ায় ১৪২ জন।

যায়। তারা সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেবার পর আর গ্রামে ফিরে গিয়ে বাপের পেশায় বসতে চায় না।

এর ফলে অন্যান্য দেশের চেয়ে জার্মানির শিক্ষিত সর্বহারার ও শিল্পীদের সংখ্যা অনেক বেশি এবং তথাকথিত উদারনৈতিক কাজের মধ্যেও বহু সংখ্যক সর্বহারা রয়েছে। এই সর্বহারার সংখ্যা ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে, আর সমাজে সর্বস্তরের মধ্যেই অসন্তোষ ও বিক্ষোভ পুঞ্জিভূত হচ্ছে।

এর থেকে প্রকৃত অবস্থাটার নীতিগত সমালোচনার স্পৃহা জেগে ওঠে এবং সব কিছু ভাঙনের দিকে এগিয়ে যায়। এইভাবে বর্তমান অবস্থাটার উপর একাধারে সর্বদিক থেকে আঘাত আসতে থাকে।

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে ভবিষ্যতে বিরাট সংগ্রামে জার্মানিকেই নেতৃত্ব দিতে হবে। জার্মানির অতীতের উন্নতি এবং "ইউরোপের হৃদয়" হিসেবে তার ভৌগোলিক অবস্থানের দরুনই সে কাজের দায়িত্ব জার্মানির উপর এসে পড়েছে। এ কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয় যে, জার্মান ব্যক্তিদের স্বারাই আধুনিক সমাজের গতিবিধায়ক নীতি এবং ভবিষ্যতের সমাজের রূপ হিসাবে সমাজতন্ত্রের আবিষ্কার হয়েছিল। সর্বপ্রথম আসেন কালমার্কস, আর তাঁর সমর্থনে ফ্রেডরিখ এংগেলস্। তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন ফার্ডিনান্দ লাসালে এবং জনগণের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। আর এটাও কোনো আকস্মিক ঘটনা নয় যে, জার্মানির সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনই বিশ্বের আর সমস্ত আন্দোলনের চেয়ে বড় এবং তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে। এ বিষয়ে জার্মানি অন্য সমস্ত দেশকেই ছাড়িয়ে গেছে, বিশেষ করে ফরাসী দেশ, যেখানে বুর্জোয়া বিকাশ আধা-খেচড়া হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে, তার থেকে তো বটেই। এটাও কোনো আকস্মিক ঘটনা নয় যে জার্মানির সমাজতান্ত্রিকরাই অগ্রণী হয়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণার প্রচার করেন।

বহু বৎসর পূর্বেই জার্মানদের মানসিক দিক ও কৃষিগত দিকের উপর অনুসরণ করে বাক্‌ল্ (BUCKLE) লিখেছিলেন যে যদিও জার্মানিতে সবচেয়ে বড় বড় চিন্তানায়করা রয়েছেন, তবুও এমন আর কোনো দেশ নেই যেখানে জার্মানির মতো বিদ্বান শ্রেণীর মানুষের সংগে আর জনগণের সংগে ব্যবধান এত বেশি; বর্তমানে আর সেকথা খাটে না। যতদিন পর্যন্ত জার্মানির বিজ্ঞান ছিল শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত নির্ণয়াত্মক, এবং তাও সীমাবদ্ধ ছিল মুষ্টিমেয় বিদ্বান ব্যক্তিদের মধ্যে, যাদের বাস্তব জীবনের সংগে যোগাযোগও কম ছিল, ততদিন এইরূপ অবস্থা ছিল বলা যায়। যখনই জার্মানির অর্থনীতির ক্ষেত্রে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন এল, তখনই দেখা গেল যে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও অবরোহী পদ্ধতির পরিবর্তে আরোহী পদ্ধতি দেখা দিল। বিজ্ঞান বাস্তবানুগ

হয়ে উঠল। মানুষ শিখল যে বিজ্ঞানের প্রয়োজন মানুষের জীবনে তার প্রয়োগের জন্যই। তার ফলে জার্মানিতে বিগত বিশ বৎসরের মধ্যে জ্ঞানবিজ্ঞানের সমস্ত শাখাতেই অনেক গণতান্ত্রিক ঝোঁক দেখা গেছে।

যে সব যুবকরা বড় বড় পেশার জন্য শিক্ষিত হয়ে উঠেছিল এক্ষেত্রে তাদের অবদান অনেকখানি। অন্যদিকে জার্মানির সাধারণ লোকের মধ্যেও শিক্ষার বিস্তার ইউরোপের অন্যান্য দেশের চেয়েও বেশি ছিল। তাই মানসিক দিক থেকেও জার্মানির উন্নতি সম্ভব হয়েছিল। আর সবচেয়ে বড় কথা হল সেখানকার সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ফলে মানুষের চেতনার স্তর অনেক উন্নত হয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণার সাহিত্য, বইপত্র, সভাসমিতি, সংসদীয় প্রতিনিধিত্ব এবং জনগণের মধ্যে সেই সব বিষয়ে আলোচনা-সমালোচনার ফলেই এই উন্নতি সম্ভব হয়েছিল।

এক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র-বিরোধী আইন-কানুন কোনোমতেই অবস্থাটা পালটে দিতে পারেনি। এই সব আইন-কানুন শুধু সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার পথে কিছুটা বাধা সৃষ্টি করেছে, সেই আন্দোলন দ্রুত গতিতে বেড়ে ওঠার গতি রোধ করেছে। আর তার ফলে অন্যদিকে সেই অবসরে অন্যান্য দেশও জার্মানির সংগে সংগে এগিয়ে আসতে পেরেছে। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে বিক্ষোভ তীব্র হয়ে উঠেছে, সমাজের মধ্যে ভাঙন আরো দ্রুত এগিয়ে গেছে।

এইভাবে আমরা দেখেছি যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে নানা প্রকার ধ্যানধারণা, আদর্শের সংগ্রাম এগিয়ে চলেছে। শুধুমাত্র সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই নয়, প্রকৃতি বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য ও তত্ত্ব, সভ্যতার ইতিহাস, এমন কি দর্শন শাস্ত্র সর্বদিক থেকেই উন্নতি হয়েছে। সর্বদিক* থেকেই সমাজ কাঠামোকে নাড়া দেওয়া হয়েছে। সব চেয়ে জোর ধাক্কা দেওয়া হয়েছে সাবেকী খুঁটিগুলোকে। সবচেয়ে রক্ষণশীল অংশের মধ্যেও বৈপ্লবিক ধ্যানধারণা প্রবেশ করেছে এবং রক্ষণশীল প্রগতি বিরোধী মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। কারিগর বা বিদ্বান সমাজ, কৃষিজীবী বা শিল্পী, মোট কথা, সর্বস্তরের এবং সব রকমের পেশার মানুষই শ্রমিক শ্রেণীর সংগে যোগ দিয়েছে। আর সেই শ্রমিকশ্রেণী চূড়ান্ত সংগ্রামে যোদ্ধাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় অংশ। এরা সবাই পরস্পরকে সাহায্য করেছে এবং নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা করে চলেছে।

নারীদেরও আবেদন করা হয়েছে যেন তারা এই সংগ্রামে পেছিয়ে না পড়ে থাকে। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই নারী সমাজ অগ্রসর হয়ে যাবে তাদের স্বাধীনতা ও মুক্তির পথে। নারী সমাজকে দেখতে হবে যে এই আন্দোলনের মধ্যে

* মেইনল্যাণ্ডার: ফিলজফি অফ রিডেম্পশন, ১ম ও ২য় খণ্ড।

তাদের নিজের ভূমিকা কি হবে তা তারা অনুধাবন করতে পেরেছে এবং উন্নত ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবার জন্য তারা তাদের সে ভূমিকা পালন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। প্রতিটি মানুষকেই চেষ্টা করতে হবে সমস্ত কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে আসবার জন্য সহযোগিতা করবার জন্য। কেউই যেন নিজের শক্তিকে ছোট করে না দেখে, অথবা মনে না করে যে এই লড়াইয়ের মধ্যে দু'এক জন কম বা বেশিতে কি আর এসে যায়। প্রত্যেকটি ব্যক্তির এমন কি সবচেয়ে দুর্বল ব্যক্তিরও মানব-সমাজের অগ্রগতির পথে কিছু করার আছে। একটানা আঘাতে কঠিনতম পাহাড়েও গর্ত হয়ে যায়। বিন্দু বিন্দু জল থেকেই বেরিয়ে আসে স্রোতস্বিনীর ধারা, আর সৃষ্টি হয় বিরাট নদী, যে নদীর প্রবল গতিবেগ আর প্রকৃতির কোনো বাধাই মানে না। মানব সভ্যতার ক্ষেত্রেও ঠিক একই জিনিস প্রযোজ্য। প্রকৃতি সর্বত্রই আমাদের শিক্ষিকা। প্রকৃতির কাছে থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারলে চূড়ান্ত বিজয় আমাদের হবেই।

প্রতিটি মানুষ যতই উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে এগিয়ে আসবে ততই চূড়ান্ত বিজয়ও সুনিশ্চিত হবে। কারোই একথা ভাবার অধিকার নেই যে এত কষ্ট ও পরিশ্রমের পর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখবার জন্য সে নিজে বেঁচে থাকবে কি না, আর সেই কথা ভেবে লড়াই-এর ময়দান থেকে দূরে সরে দাঁড়াবার অধিকার তো আর মোটেই নেই। যদিও একথা ঠিক যে আমরা যেমন কে কতদিন বাঁচব তাও আগে থেকে বলা যায় না, তেমনি কোন পরিস্থিতি কতদিন থাকবে বা কোনদিকে মোড় নেবে তাও আগে থেকে বলা যায় না, তবুও আমরা যে শতাব্দীতে বাস করছি তাতে আমাদের জীবনেও বিজয় প্রত্যক্ষ করবার সব আশা ছেড়ে দেওয়া যায় না। আমরা সংগ্রাম করি, আর সামনের দিকে এগিয়ে যাই। কবে কখন কোথায় গিয়ে মানব সমাজের নব যুগের সূচনা হবে সে দিকে আমরা ভ্রূক্ষেপ করি না। যদি সংগ্রামের মাঝেই আমাদের জীবনের অবসান হয়, তবে পিছনের সারির সাথীরা এগিয়ে এসে আমাদের স্থান পূরণ করবে। মানুষ হিসাবে আমাদের কর্তব্য পালন করছি—এই চেতনা নিয়েই আমরা মৃত্যুবরণ করব। এই প্রত্যয় আমাদের মধ্যে জাগ্রত থাকবে যে মানবসমাজের ও প্রগতির শত্রুদের সমস্ত বাধা অতিক্রম করে একদিন আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছবই।